মাটির বাসা

শ্রীসীতা দেবী

বেঙ্গল পাবলিশার্স
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—কার্তিক, ১৩৫২

দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৫৭

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—শৈল চক্রবর্তী

মুদ্রাকর—শ্রীললিতমোহন গুপ্ত

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও,

৮৯, লেক রোড,

কলিকাতা—২৯

ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ—

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

৭২।১, কলেজ স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

বেঁধেছেন—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তিন টাকা আট আনা

মাটির বাসা

১

রাত আটটার বেশী হয় নাই, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ইহারই মধ্যে চারিদিক্‌ নিঝুম। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক বা দূরে শিয়ালের ডাক শোনা যায়, বা ঝিঁঝিঁপোকার ঝঙ্কার নীরবতার সাগরে মৃদু তরঙ্গ তুলিয়া যায়। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, নিকষ কালো অন্ধকারের স্রোতে গ্রামখানি যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। গৃহস্থবাড়ীতে কোথাও বা প্রদীপ জ্বলিতেছে, কোথাও বা ঘর আঁধার, সব কয়টি মানুষই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শীতকাল, সন্ধ্যা হইতে না-হইতে যাহা হউক কিছু খাইয়া, কাঁথা লেপ যাহার যা জুটিল তাহাই গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িতে পারিলে সকলে বাঁচে। বড় শহর নয় যে দিনকে রাত করিয়া কোনও লাভ হইবে। দিনের বেলা অনেক কাজ থাকে, রাত্রে ঘুমানো ছাড়া আর যে কি করা যায় তাহা পাড়াগাঁয়ের লোক খুঁজিয়া পায় না। নিত্য আমোদ-প্রমোদের কোনও ব্যবস্থা এখানে নাই, নিতান্ত কাহারও বাড়ী বিবাহ, অন্নপ্রাশন বা পৈতা কিছু থাকিলে কয়েকটা দিন হৈচৈ করিয়া ইহাদের কাটে ভালই। পড়াশুনার অভ্যাস কাহারও বিশেষ নাই, সুতরাং অনর্থক তেল পোড়াইয়া লেখাপড়া করিতে কেহ তেমন বসে না। ওসব সখ যাহাদের আছে, তাহারা গ্রামে থাকিবে কোন্‌ দুঃখে? বড় বড় শহরগুলি তাহাদের জন্য পড়িয়া আছে। গ্রামের স্কুলে যাহারা পড়ে, তাহাদেরও রাত্রিতে পড়িবার প্রয়োজন পরীক্ষার আগের সপ্তাহ ছাড়া আর কোনও সময়েই হয় না।

তবু মল্লিকদের বাড়ীর বড় ঘরখানায় এখনও আলো জ্বলিতেছে। এই ঘরখানি এ-বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ভাল ; আরও ছোট ছোট দু'খানি ঘর আছে বটে, কিন্তু বিশেষ লোকজনের ঠেলাঠেলি না হইলে সেগুলিতে কেহ শুইতে যায় না। জিনিষপত্রে সর্ব্বদাই সেগুলি ঠাসা, কতক বা দরকারী জিনিষ, নিত্য ব্যবহার্য্য, কতক একেবারে অকেজো ভাঙাচোরা সাতকেলে পুরানো, তবু প্রাণ ধরিয়া গৃহস্থ সেগুলিকে বিদায় দিতে পারে নাই। সেগুলির সঙ্গে কত হারানো প্রিয়জনের, কত বিগত সুখের দিনের সহস্র স্মৃতি জড়িত। তাই তাহারা এখনও ঘর জুড়িয়া আছে। বড় ঘরখানিতে মল্লিক-গৃহিণী সব কয়টি ছেলেমেয়ে লইয়া শয়ন করেন। কর্ত্তা নিতান্ত শীত বা বর্ষা পড়িলে তবে ঘরে ঢোকেন, ভিতরের দিকের দাওয়ায় তাঁহার তক্তাপোষখানি সদাসর্ব্বদা পাতা থাকে।

মৃণাল আলো জ্বালিয়া জিনিষ গুছাইতেছে। কাল দশটার গাড়ীতে তাহাকে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে। পূজার ছুটি শেষ হইয়া গেল, তাহার স্কুল খুলিতে আর মাত্র দুই দিন দেরি। এবার পূজা পড়িয়াছিল কার্ত্তিকে, কাজেই ইহারই মধ্যে রীতিমত শীত দেখা দিয়াছে।

অনেক দিনের পুরানো রংচটা একটা ষ্টীল ট্রাঙ্কে মৃণাল নিজের বই খাতা, কাপড়চোপড় সব গুছাইয়া রাখিতেছিল। মামীমা তখন পাশের ঘরে কি যেন করিতেছেন, হাঁড়িকুড়ি নাড়ার শব্দ মাঝে মাঝে পাওয়া যাইতেছে। ছেলেমেয়ে চারিটিই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ইহারা জাগিয়া থাকিলে কাহারও সাধ্য হয় না কোনও কাজ নিরিবিলিতে করিবার। গুছানো জিনিষ অগোছাল করিতে, জিনিষপত্র বাড়ীময় ছড়াইতে, প্রতি কাজে বাধা জন্মাইতে ইহারা অদ্বিতীয়। ছোট খোকা কানুকে তাহার মা কোমরে গামছা বাঁধিয়া তক্তাপোষের খুরার সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া তবে রান্নাবান্নার কাজ করিতে পারেন। না হইলে

তেলে ঘিয়ে মিশাইয়া, দুধের কড়া উল্টাইয়া ফেলিয়া, বাটনা লইয়া গায়ে মাখিয়া এবং তরকারির ডালা হইতে কাঁচা লঙ্কা তুলিয়া খাইয়া, সে বিধিমতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে থাকে। তাহার বড় বোন দুটিও দুষ্টামিতে অদ্বিতীয়, তবে বেশী বাড়াবাড়ি করিলে পিঠে দুই-চার ঘা বসাইয়া দিয়া তাহাদের বাড়ীর বাহির করিয়া দেওয়া যায়। ঘরের ভিতর যে দুরন্তপনা অসহ্য বোধ হয়, খোলা মাঠে, পুকুরঘাটে, জমিদারের পুরানো আম বাগানটায় তাহা দিব্য মানাইয়া যায়, কাহারও গায়ে তাহাতে ফোস্কা পড়ে না। টিনি আর চিনির হাত পা ছড়িয়া যায়, মাঝে মাঝে কাটিয়াও যায়, পরনের ডুরে শাড়ীতে অনেক জায়গায় খোঁচা লাগে, ধূলাকাদায় মাথামাথি হইয়া সেগুলি পরার অযোগ্যও হইয়া যায়, কিন্তু এ সব লইয়া কেহ মাথা ঘামাইতে বসে না। দুপুরবেলা সঙ্গে পুকুরঘাটে গিয়া স্নান করিয়া তাহারা আবার বেশ পরিষ্কার-
[illegible]চ্ছন্ন হইয়া আসে, কাদামাখা শাড়ীগুলিও মায়ের লক্ষ্মী-হস্তের স্পর্শ পাইয়া আবার শাদা ধবধবে হইয়া উঠে। টিনির বয়স হইবে বছর সাত, চিনি এখনও পাঁচের গণ্ডী পার হয় নাই। টিনির বড ভাই গোপাল তাহার চেয়ে অনেক বড়, বছর চৌদ্দ তাহার বয়স হইবে। গ্রামের স্কুলের পড়া তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে, বেলা আটটায় ভাত খাইয়া সে পাশের গ্রামের হাইস্কুলে পড়িতে যায়, বেলা একেবারে গড়াইয়া গেলে তবে ফিরিয়া আসে। গোপালের পর মল্লিক-গৃহিণীর যে-মেয়েটি হইয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিলে সে এতদিনে বারো বৎসরের হইত।

মৃণাল মল্লিক-মহাশয়ের ছোট বোন শৈলজার মেয়ে। তাহার পাঁচ বৎসর বয়সে মা মারা গিয়াছে। বাবা মৃগাঙ্কমোহন বছর দুই পরেই আর একটি বিবাহ করিয়া বসিয়া, ভাঙা সংসার আবার পূর্ণ বিক্রমে জোড়া লাগাইতে সমর্থ হইয়াছেন। দ্বিতীয়া গৃহিণী অনেক ছেলেমেয়ের মা।

মৃণালকে এই নূতন সংসারে মানায় না। নূতন মাও তাহাকে খুব বেশী সুনজরে দেখেন না।

মা মারা যাইবার পর সে মামার বাড়ীতেই মানুষ হইতেছিল। প্রবাদবাক্যের মামীর মত হুড়কা ঠ্যাঙ্গা দিয়া মৃণালকে তাহার মামীমা আপ্যায়িত করিতেন না, বরং শান্তশিষ্ট বলিয়া এই মেয়েটির প্রতি তাঁহার একটা পক্ষপাতই ছিল। মৃণাল দেখিতে সুন্দরী নয়, অন্ততঃ বাঙালীর ঘরে তাহাকে কেহ সুন্দরী বলিত না, কারণ তাহার রংটা ছিল শ্যামবর্ণ। বিবাহের সময় মৃণাল যে আত্মীয়স্বজনকে অথৈ জলে ফেলিয়া দিবে এ-বিষয়ে সকল একমত। তবু মামা মামী এই শ্যামবর্ণ মেয়েটিকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন।

দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবার পর মৃগাঙ্কমোহন চক্ষুলজ্জার খাতিরে একবার মৃণালকে লইয়া যাইতে আসিলেন। মৃণালকে পাঠাইতে মামা মামীর একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যাহার মেয়ে সে যদি জোর করে তাহা হইলে তাঁহারা ধরিয়া রাখেন কি করিয়া? অনেকখানি ভয়মিশ্রিত কৌতূহল লইয়া মৃণাল তাহার বাবার সঙ্গে নূতন মায়ের সংসারে আসিয়া ঢুকিল।

সৎমা অবশ্য উপকথার সৎমার মত এক গ্রাসে সতীনঝিকে খাইয়া ফেলিতে চাহিলেন না, তবে খুব যে তুষ্ট হইলেন তাহাও নয়। যথেষ্ট বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। আসিয়াই যাহাতে ঘরের গৃহিণী হইতে পারে সেই রকম বয়স্থা মেয়ে দেখিয়াই মৃগাঙ্ক বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রিয়বালা আসিয়াই ঘর-সংসার বুঝিয়া লইলেন। বেশ সম্পন্ন সংসার, বাড়ীখানা মৃগাঙ্কের নিজের, অবশ্য পাকাবাড়ী নয়। গোয়ালে গোরু, মরাইয়ে ধান, ঘরের ভিতর জিনিষপত্র সবই আছে। তবে গৃহিণী-অভাবে সংসার বিশৃঙ্খল। সতীন যেন প্রিয়বালার জন্য

সংসার পাতিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রিয়বালা নিপুণ হাতে ঘর-গৃহস্থালী সাজাইতে লাগিলেন। এ তাঁহার এক রকম ভালই হইল। অতি-দরিদ্র ঘরের মেয়ে তিনি। তাঁহার বাপ-মা এতই গরীব যে এই অতি সাধারণ গৃহস্থঘরে আসিয়া পড়িয়াই প্রিয়বালার মনে হইতে লাগিল কত যেন ধন-ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডারে আসিলেন। তাঁহার রূপ ছিল না, বিদ্যাও ছিল না। নিতান্ত দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ বলিয়াই মৃগাঙ্ক-মোহন অমন ঘরে বিবাহ করিলেন, না হইলে ফিরিয়াও তাকাইতেন না। তাঁহার আশা ছিল যে কৃতজ্ঞতার খাতিরে অন্ততঃ নূতন বৌ মৃণালকে একটু স্নেনজরে দেখিবেন।

কিন্তু "যে-বেটী সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।" মৃণালকে দেখিয়াই প্রিয়বালার মনে সুপ্ত সতীন-বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিল। মৃণালের মা-ই এ-সংসার পাতিয়া গিয়াছেন, এখনও তাঁহার হাতের চিহ্ন এ-সংসার হইতে মুছিয়া যায় নাই। কত তৈজসপত্র, কত ছোট-বড় জিনিষ তাঁহারই বিবাহের সময়কার পাওনা, এখনও সেগুলি নূতন রহিয়াছে। এ-সব দেখিয়া কি মৃগাঙ্ক দিনে দশবার সেই হারানো গৃহলক্ষ্মীকে স্মরণ করেন না? ভাবিতেই প্রিয়বালার মনে যেন কাঁটা ফুটিয়া যাইত। খাইতে বসিয়া মনে হইত, এই থালা বাটি গেলাস, সবই ত সতীনের সঙ্গে আসিয়াছিল। শুইতে গিয়া মনে হইত, এই খাটেই শৈলজাও শুইতেন নিশ্চয়। নিজে বিবাহের সময় কিছুই পান নাই, শাঁখাশাড়ী দিয়া তাঁহার পিতা কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, তাহা না-হইলে প্রিয়বালা বোধ হয় এ-সব জিনিষে আগুন লাগাইয়া দিতেন। কিন্তু মনে যতই কাঁটা ফুটুক, এইগুলি দিয়াই তাঁহাকে নিজের সংসার গুছাইয়া পাতিতে হইল। ভালর মধ্যে ইহারা জড় পদার্থ, ইহাদের মুখে ভাষা নাই, চোখে দৃষ্টি নাই। কেহ যদি ইহাদের ভুলিতে চায়,

ইহারা জোর করিয়া অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দেয় না। প্রিয়বালা জোর করিয়াই সব কথা ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, স্বামীকে আদর যত্নে যতটা পারেন একেবারে নিজের করিয়া লইবার চেষ্টারও ত্রুটি ছিল না।

কিন্তু মৃণাল তাঁহার সংসারে একটা মূর্ত্তিমতী উৎপাতের মত আসিয়া উপস্থিত হইল। এ-যে মৃতা শৈলজার চোখ-মুখ গলার স্বর সব চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে। নিজে কিছু নাই বলিল, কিন্তু কালো চোখের দৃষ্টিতে, গলার সুরে, হাত নাড়ার সুকুমার ভঙ্গিতে সে দিনে দশবার করিয়া তাহার পিতাকে মনে পড়াইয়া দিতে লাগিল যে সে শৈলজার মেয়ে। প্রিয়বালা মনে মনে জ্বলিতে লাগিলেন। মৃণালকে মুখে কিছু বলিতে পারেন না, হাজার হউক সবে মাত্র তিনি এ-সংসারে আসিয়াছেন, তাঁহার দাবী আর কতটুকু? ইহার মা ত তবু পাঁচ-ছয় বৎসর স্বামীর ঘর করিয়া গিয়াছেন, সন্তানের জননীও হইয়া গিয়াছেন। মরিয়াও এখনও তিনিই জিতিয়া আছেন।

প্রিয়বালা মৃণালকে মুখে কিছু বলিলেন না বটে, তাহাকে খাইতেও দিতেন, লোক দেখানো যত্নও করিতেন, কিন্তু সংসারটা তাঁহার নিজের কাছে বিস্বাদ হইয়া গেল। তাঁহার খাইয়া সুখ নাই, শুইয়া সুখ নাই। চোখের দৃষ্টিতে মনের ঝাঁঝ যেন ঠিকরাইয়া পড়ে।

মৃগাঙ্ক ব্যাপার দেখিয়া দমিয়া গেলেন। দুই বৎসর একলা লক্ষ্মীছাড়া জীবনযাপন করিয়া তাঁহার অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল। তাই বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং আর কিছু না পান, আরাম পাইয়াছিলেন। শৈলজাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে লইয়া প্রথম সংসার রচনার যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, এই দ্বিতীয়বার পাতা সংসারের মধ্যে, প্রিয়বালার সাহচর্য্যে সে আনন্দ অবশ্য তিনি প্রত্যাশা

করেন নাই, পানও নাই। আরামটুকুর খাতিরেই তিনি নীচু ঘরে অর্থের প্রত্যাশা না রাখিয়াও বিবাহ করিয়াছিলেন।

নিশ্চিন্ত আরামের চেয়ে অধিক কাম্য তখন তাঁহার আর কিছুই ছিল না। সেই আরামই যদি টুটিয়া যায়, প্রিয়বালা যদি রাগ করিয়া গুড়্গুনিতে টক দিয়া দেন এবং উন্মনা হইয়া বিছানা ঝাড়িতে ভুলিয়া যান ও ভাল কথা বলিলেও ঝঙ্কার দিয়া উত্তর দেন, তাহা হইলে বিবাহ করিয়া আর লাভ হইল কি? তাহার চেয়ে মেয়ে যেমন মামার বাড়ীতে ছিল তাই না হয় থাক। এমন ত নয় যে সেখানে কিছু অযত্ন হয়? মামা, মামী দুইজনই তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তাঁহারা ত মৃণালকে এখানে পাঠাইতেই চান নাই। খরচও মৃগাঙ্ক দিতে রাজী, যদি মল্লিক মশায় নিতে রাজী থাকেন। সারারাত ধূলাবালিভর্ত্তি বিছানায় শুইয়া, যত ঘুমের ব্যাঘাত হইতে লাগিল, ততই মেয়েকে অবিলম্বে মামার বাড়ী পাঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প মৃগাঙ্কের মনে দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া তিনি বলিলেন, "আমি বলি কি, খুকী তার মামার বাড়ীই থাকুক এখন কিছুদিন।"

প্রিয়বালাও ত তাই চান, কিন্তু তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেলে লোকে বলিবে কি? তাই বলিলেন, "এই সবে এল, দুদিন না থেকেই চ'লে যাবে? লোকে আমায়ই ত দুষবে, বলবে সৎমা-মাগী ঘরে ঢুকেই পর ক'রে দিলেক গা।"

মৃগাঙ্ক মনে মনে ভাবিলেন, 'নিতান্ত মিথ্যা বলবে না', কিন্তু সুয়োরাণীর মুখের উপর আর সেকথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল না। বলিলেন, "না, তা বলবে কেন? বলে ত বয়েই গেল! আমরা কারও খাইও না, পরিও না। খুকীর একলা এখানে ভাল লাগে না, মামার বাড়ীতে ভাইবোনে মিশে বেশ থাকবে। তোমারও খাটুনি বাড়ে

ও থাকলে।” অতএব মৃণাল আবার ফিরিয়া চলিল। কিন্তু যাইবার সময় নিজের অজ্ঞাতে সৎ-মাকে আরও ভাল করিয়া চটাইয়া দিয়া গেল। শৈলজার পোষাকী কাপড়-চোপড়, আট গাছা সোনার চুড়ি, একটি হেঁসো হার, এক জোড়া অনন্ত আর কানের একজোড়া কানবালা, এই বাড়ীতেই একটি ছোট বাক্সে তোলা ছিল। সাবধানতার খাতিরে মৃগাঙ্ক আবার তাহা শুইবার ঘরে বড় আমকাঠের সিন্দুকটার ভিতর ঢুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। সিন্দুকের চাবি নূতন গৃহিণীর হাতে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু ছোট বাক্সের চাবিটা কর্ত্তা তাঁহার হাতে দেন নাই। প্রিয়বালা বুঝিতেন যে, জিনিষগুলি আইনতঃ তাঁহার কোনও অধিকার নাই, সতীনের মেয়ে যখন বাঁচিয়া আছে। কিন্তু বে-আইনী কাণ্ডও ত জগতে কম হয় না? তাঁহার প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়া স্বামী হয়ত কোনদিন ঐ বাক্সটি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিবেন, এ আশা তাঁহার মনে একেবারেই যে ছিল না তাহা বলা যায় না। কিন্তু মৃণাল যখন বিছানা-কাপড় পুঁটুলি বাঁধিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, তখন মৃগাঙ্ক সেই ছোট বাক্সটি হঠাৎ সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া তাহার পাশে রাখিয়া দিলেন। বলিলেন, “খুব সাবধানে নিয়ে যাস্ মা, তোর মায়ের সব জিনিস আছে ওর মধ্যে। গিয়ে মামীমার হাত দিস্, তিনি তুলে রাখবেন।”

গোরুর গাড়ী গ্রাম্য পথে ধুলা উড়াইয়া চলিতে লাগিল, মৃগাঙ্কও নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে ঢুকিলেন। মৃণাল সাগ্রহে পথ দেখিতে দেখিতে চলিল, কতক্ষণে পথটা যে শেষ হইবে কে জানে? মামার বাড়ী ফিরিয়া যাওয়ায় তাহার লেশমাত্র আপত্তি ছিল না। নূতন মায়ের সংসারে আসিয়া অবধি তাহার প্রাণ আইঢাই করিতেছিল। তাহার সমস্ত মন পড়িয়া ছিল মামার বাড়ীর দিকে। বাবা তাহার কাছে প্রায়

অপরিচিতই ছিলেন, দুই জনের ভিতর ভালবাসার বন্ধনও বিশেষ দৃঢ় হয় নাই।

মামীমা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলসীতলায় প্রণাম করিতেছেন এমন সময় মৃণাল ফিরিয়া আসিল। মামীমার কোলের খুকীর মুখে তখন সবে ভাষা ফুটিয়াছে, সে কলরব তুলিল, "ডি ডি, আঃ আঃ।"

মামীমা আসিয়া মৃণালকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "হয়ে গেল বাপের বাড়ী বেড়ানো ?"

মৃণাল ঝাঁকড়া চুল দোলাইয়া বলিল, "হুঁ"। তাহার পর ভাই-বোনদের সঙ্গে খেলায় ভিড়িয়া গেল।

তাহার পর মৃণালকে আর কোনও দিন বাপের বাড়ী যাইতে হয় নাই, মৃগাঙ্কও আর তাহাকে ডাকেন নাই। প্রিয়বালার সংসারে এখন তাহারই পরিপূর্ণ দখল, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে তাহার। এ-বাড়ীতে যে শৈলজার কন্যার আর কোনও স্থান নাই তাহা মৃগাঙ্ক ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন। জোর করিয়া এখন মৃণালকে এখানে জায়গা দিতে গেলে গৃহবিপ্লব বাধিয়া যাওয়া নিশ্চিত। তাহাতে মৃণালেরও সুখ হইবে না। কাজেই মৃণাল মামাব বাড়ীতেই থাকিয়া গেল। বাবার কাছ হইতে মাসে মাসে কিছু খরচ পাইত, একেবারে পরের গলগ্রহ তাহাকে হইতে হইল না।

বছর দশ বয়স পর্য্যন্ত সে গ্রামেই ছিল। তাহার পর মৃগাঙ্কের নিকট হইতে অনুরোধ আসিল, মেয়েকে যেন কলিকাতার কোনও স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়, আজকালকার দিনে মেয়েছেলেরও লেখাপড়া শেখা বিশেষ দরকার। মৃগাঙ্ক অনেক ভাবিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি ধনী মানুষ নহেন এবং কন্যার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। টাকাকড়ি খরচ করিয়া কয় জনের বিবাহ দিতে পারিবেন

কে জানে? একটাও যদি মানুষ হইয়া নিজের পথ নিজে করিয়া লইতে পারে ত মন্দ কি?

মৃণাল কাঁদিতে কাঁদিতে বোর্ডিঙে চলিল। কেন যে তাহার প্রতি এই দণ্ডবিধান হইল তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। বৎসরের ভিতর যে দুই-তিন মাস মামার বাড়ী কাটাইতে পারিত, সেই মাস-কয়টির প্রত্যাশায় তাহার বৎসরের বাকি দিনগুলি কাটিয়া যাইত। ক্রমে সহিয়া গেল, অন্য মেয়েদের সঙ্গে ভাব হইল, রাজধানীতে বাস করার সুবিধার দিক্‌ও যে আছে তাহাও বুঝিল। তবু প্রাণের টান এখনও তাহার সেই শৈশবের লীলাভূমির প্রতি। এখনও ছুটির শেষে বোর্ডিঙে ফিরিতে তাহার কান্না পায়।

২

পাশের ঘরে মামীমার কাজ এতক্ষণে শেষ হইল। একটা বড় হাঁড়ি, মুখে তাহার পরিষ্কার ন্যাকড়া বাঁধা, ও একটা বোতল হাতে করিয়া শুইবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। মৃণাল পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল, "ওতে কি মামীমা?"

মামীমা তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "এবার আর বেশী কিছু ক'রে দিতে পারলাম না মা, যা জ্বালাতন করে খোকাটা। খানকতক চন্দ্রপুলি আর ক্ষীরের প্যাঁড়া দিলাম, খাস্; আর এই বোতলটায় গাওয়া ঘি দিলাম, পাতে খেতে পারবি। কলকাতার খাওয়া খেয়ে মেয়ের যা ছিরি হচ্ছে, হাড় ক'খানা গোনা যায়। দেখি, বড়দিনের সময় যদি আনতে পারি।"

মৃণাল বিষণ্ণভাবে বলিল, "তখন কি আর বোর্ডিং থেকে ছাড়বে মামীমা? প্রাইজ আর স্পোর্টের জন্যে ধ'রে রাখতে চাইবে।"

মামীমা বলিলেন, "চিঠিপত্র লেখালেখি ক'রে দেখা যাবে তখন। দেড়টা মাস বই ত নয়, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ক'খানা কাপড় নিলি দেখি?"

মৃণাল বাক্স খুলিয়া উপরের বই-খাতাগুলি উঠাইয়া ফেলিয়া কাপড়-জামাগুলি মামীমাকে দেখাইতে লাগিল। মামীমা বলিলেন, "মোটে দশখানা কাপড়, তাও সব আট-পৌরে, কোথাও যেতে-আসতে হ'লে কি পরবি? তোর সেই খয়েরী রঙের জামদানি শাড়ীটা কি হ'ল? বেশ ছিল কাপড়খানা, বেশী পুরনো ত নয়?"

মৃণাল বলিল, "প্রাইজের সময় গেল বছর সেটা নষ্ট হয়ে গেল যে মামীমা! মেয়েরা সবাই ঢের কাপড় দিয়েছিল ষ্টেজ সাজাতে, আমিও ওখানা দিয়েছিলাম। কে একরাশ কালি উল্টে ফে'লে সেটার দফা সেরে দিলে।"

মামীমা বলিলেন, "তা বেশ; তারা সব শহুরে বড়মানুষের মেয়ে; তাদের ত ওসব গায়ে লাগে না? আমাদের যে কত কষ্ট ক'রে এক-একটা জিনিষ করতে হয়, তা ওরা বুঝবে কি ক'রে? তা এরকম হ্যাড়াবেঁচা হয়ে ত যাওয়া যায় না? আমার গরদের শাড়ীখানা দেব, নিয়ে যাবি?"

মৃণাল বলিল, "না মামীমা, তুমি তাহ'লে কোথাও যেতে আসতে কি পরবে? তোমার ত আর নেই?"

মামীমা খানিক চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তাহলে এক কাজ কর্, তোর মায়ের বাক্সটা খুলে গোটা-দুই শাড়ী বার ক'রে

নিয়ে যা। ওগুলো তোরই ত পরবার কথা, বেশীদিন বাক্সে বন্ধ হয়ে প'ড়ে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে।"

মৃণাল বলিল, "ওগুলি নিয়ে পরতে কেমন যেন কষ্ট হয় মামীমা।"

মামীমা বলিলেন, "তা হোক, তুই পর্, তোর জন্যেই রেখে গেছে। তার আত্মাটা খুশী হবে। গহনা ক'খানাও তোর সঙ্গে দিয়ে দেব ভাবি, তারপর আবার মনে হয় বিয়ের জন্যে রেখে দিলেই ভাল। আমরা ত আর তখন বেশী কিছু দিতে পারব না, তোর বাপও বেশী হাত উপুড় করবে ব'লে মনে হয় না।"

মৃণাল নতমুখে বলিল, "ওসব এখন থাক, গয়না-টয়না স্কুলে তত কেউ পরে না।"

মামীমা সিন্দুকের ভিতর হইতে ছোট বাক্সটি বাহির করিয়া আনিলেন। আঁচলে-বাঁধা চাবির তাড়া হইতে বাছিয়া বাছিয়া একটা পুরাতন মরিচা পড়া চাবি বাহির করিয়া বাক্সটি খুলিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "দেখ্ কি নিবি, বেছে নে।"

বাক্সটি খুলিতেই ভিতর হইতে একটি মৃদু সৌরভ বাহির হইয়া আসিল। মৃণালের মনে হইতে লাগিল, তাহার পরলোকবাসিনী মাতার অঙ্গসৌরভই যেন তাঁহার পরিত্যক্ত পরিচ্ছদগুলি হইতে বাহির হইতেছে। মাকে তাহার মনে পড়ে না, শুধু একটা ছায়ামূর্ত্তি মধ্যে মধ্যে তাহার স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠে, হয়ত সেটি মায়েরই ছবি। মামীমার কাছে শুনিয়াছে, মায়ের মুখ আর দেহের গঠন ভারি সুন্দর ছিল, অমন চোখ নাকি গ্রামে কাহারও ছিল না। রং অবশ্য ফরসা ছিল না।

বাক্সটিতে থান আট-নয় শাড়ী, দুটি লেস-বসানো জামা, রঙীন সেমিজ গোটা দুই-তিন, তা ছাড়া টুকিটাকি আরও কয়েকটি সৌখীন জিনিষ। পল্লীযুবতীর বিশ বছরের জীবনের সঞ্চয়, কতই আর বেশী

হইবে ? একটি আধখালি এসেন্সের শিশি, ভিতরের এসেন্স জলের মত ফিকা হইয়া গিয়াছে। একটি তরল আলতার শিশি, একটি কাগজের মোড়ক, তাহাতে গোলাপী পাউডার। উহা শৈলজার বিবাহের সময় কেনা। সিন্দুর-কৌটা দুইটি রহিয়াছে। একটি লাল রং করা কাঠের, অন্যটি স্বামীর উপহার, রূপার। বড় একটি রূপার ডিবার ভিতরে তাহার গহনা কয়খানি রহিয়াছে। ডিবাটিও বিবাহের দান-সামগ্রীর জিনিষ। গোটা-দুই বই শৈলজা বিবাহে বা বৌভাতে উপহার পাইয়াছিল। সেগুলির পাতাও কাটা হয় নাই, যেমন আসিয়াছে তেমনই তোলা আছে। বাক্সের এক কোণে ন্যাকড়ায় বাঁধা কালজিরা, আর এক কোণে গুটি চার কর্পূরের দানা। কাপড়ে পোকা-মাকড় না লাগে তাহারই জন্য মামীমার এই ব্যবস্থা। সবার উপর পাট করা একটি ফিকা সবুজ রঙের অল্পদামী শাল, সেটার স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

মামীমা কাপড়গুলি হাত দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "ঠাকুরঝির বড় যত্ন ছিল জিনিষপত্রের ; এমন গুছিয়ে রাখত যে দেখে সুখ হ'ত। আমার আর ওর কত কাপড় একসঙ্গে কেনা হ'ত, আমারটা দু-দিন না যেতে যেতে বিচ্ছিরি হয়ে যেত, ওর খানা থাকত যেমনকে তেমন, পাট ভেঙ্গে যে পরেছে তাও বোধ হ'ত না। নে, কোনগুলো নিবি নে।"

মৃণাল কাপড়গুলি এক-একখানি করিয়া বাক্স হইতে বাহির করিয়া পাশে রাখিতে লাগিল। একখানি লাল বালুচরী শাড়ী, ইহা তাহার মায়ের বিবাহের কাপড়। লাল জমির উপর বড় বড় রেশমের ফুল তোলা। ফুলগুলি ফিকা সোনালী রঙের, আঁচলাটি বড়ই বাহারের, কত ছবিই যে নিপুণ কারিগর কাপড়ের গায়ে বুনিয়া দিয়াছে তাহার ঠিকানা

নাই। ফুল আছে, বাগান আছে, বাঘ-সিংহ আছে, পাল্কি-বেহারা আছে। মৃণাল শিশুকালে এই শাড়ীখানি দেখিয়া বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। বারবার নরম রেশমের গায়ে হাত বুলাইয়া শাড়ীখানিকে সে আদর করিত। এমন স্নিগ্ধ রং, যেন দুই চক্ষু জুড়াইয়া যায়। আর ছবিগুলিই বা কি সুন্দর! কলিকাতা যাইবার পর কত রকম সুন্দর দামী শাড়ী দেখিয়াছে, কিন্তু এত সুন্দর তাহার চোখে আর কিছুই লাগে নাই। কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া সে একটি কথা বলে নাই, কিন্তু মনে মনে তাহার সঙ্কল্প ছিল, তাহার নিজের বিবাহ যদি কোনও দিন হয় তাহা হইলে এই শাড়ীখানি পরিয়াই যেন হয়।

আর একখানি হাল্কা নীল-রঙের পার্সীশাড়ী মখমলের ফিতার উপর রেশমের কাজ-করা পাড় বসানো। এ-ধরণের শাড়ীর আজকাল বাংলাদেশে আর চলন নাই। মৃণালের এ-শাড়ীখানিও ভারি ভাল লাগিত। এই শাড়ী পরিলে কলিকাতার মেয়েরা নিশ্চয় তাহাকে ঠাট্টা করিবে, না হইলে মৃণাল কাপড়খানি লইয়া যাইত।

আর একখানি লালপেড়ে গরদ, ইহাও তাহার বয়সী মেয়েরা বিশেষ পরে না, গিন্নীবান্নী মানুষকেই উহা মানায়। তবু এই কাপড়খানিই মৃণাল নিজের বাক্সের ভিতর তুলিয়া লইল। ইহা পরিলে ক্লাসের মেয়েরা বড় জোর তাহাকে ঠাকুরমা বলিয়া ক্ষ্যাপাইবে, তাহার বেশী কিছু করিবে না।

আর একখানি সেই রকমই চওড়া পাড়ের তসরের শাড়ী, ইহা মৃণাল এবার রাখিয়া দিল, 'পরে কোনও সময় লইয়া যাইবে। আর দু'খানি শান্তিপুরী শাড়ী, পাড়গুলি সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাহির করিয়া লইয়া সে বলিল, "এবার বাক্সটা বন্ধ ক'রে ফেল মামীমা, আর কাপড়

চাই না। ঐ তিনখানা পোষাকী কাপড়েই আমার ঢের হবে। কোথায়ই বা আমি যাই?"

মামীমা ছোট বাক্সটিতে তালা বন্ধ করিয়া আবার তাহা সিন্দুকে তুলিলেন। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাউডারটা নিবি? তোদের বোর্ডিঙের মেয়েরা মাখে না এ-সব?"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "মাখবে না কেন মামীমা, খুব মাখে। এক-একজন এত মাখে যে মনে হয় যেন ময়দার বস্তা থেকে সবে বেরিয়েছে। আমার কিন্তু ভারি লজ্জা করে। যতই পাউডার মাখি, যে কেলে রং সেই কেলেই থেকে যাবে।"

মামীমা হাসিয়া বলিলেন, "তবে থাক্, নিস্ নে। ও সব শহরের মেয়েদেরই মানায়। তুই এতকাল কলকাতায় থেকেও শহুরে হতে পারলি না। সে-দিন মুখুজ্জে-গিন্নী বলছিল, তার মেয়ে চিঠিতে লিখেছে, আজকাল কলকাতায় ভদ্রলোকের মেয়েরাও নাকি মুখে রং মেখে বেড়ায়।"

মৃণাল বলিল, "বেড়ায়ই ত, আমিই কত দেখেছি। আহা, যা ছিরি সব বেরোয়।"

মামীমা বলিলেন, "কালে কালে কতই হবে মা। যাক্‌গে, তুই এখন শো গিয়ে, অনেক ভোরে কাল উঠতে হবে।"

মৃণাল বাক্স বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল। ঘরের দুই দিকে দুইখানা বড় বড় খাট, তিন-চার জন করিয়া মানুষ এক-একটাতে বেশ শুইতে পারে। সম্প্রতি এখন এক খাটে শোয় মৃণাল, টিনি আর চিনি। অন্যটায় মামীমা গোপাল আর কানুকে লইয়া শয়ন করেন।

দু-খানা খাটেই মশারি টাঙানো, পাড়াগাঁয়ে মশার উৎপাত ত

আছেই, তাহার উপর সাপেরও অভাব নাই, কাজেই মশারি বারো মাসই খাটানো থাকে। মামীমা বলিলেন, "নে, তুই ঢুকে পড়, আমি মশারি গুঁজে দিচ্ছি। চিনির আবার যা পাতলা ঘুম, কানের কাছে একটা মশা ভন্ ভন্ করলেই সে উঠে বসবে, না-হয় এমন পা ছুঁড়বে যে কাউকে আর ঘুমুতে হবে না।"

মৃণাল বিছানায় উঠিয়া পড়িল। জায়গার অভাব নাই, টিনি চিনি এক কোণে বিড়ালছানার মত পরস্পরকে আঁকড়াইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে।

মামীমাও হারিকেন লণ্ঠনটা নিবাইয়া শুইয়া পড়িলেন। মৃণালের ঘুম আসিতেছিল না। আসন্ন বিচ্ছেদকাতর মনটা তাহার কেবলই ছটফট করিতেছিল। কিন্তু মামীমা সারাদিন খাটিয়া খুটিয়া শ্রান্ত হইয়া শুইয়াছেন, এখন বক্‌বক্ করিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া রাখা ঠিক নয়। খানিক বাদে এ-পাশ ও-পাশ করিতে করিতে মৃণালও ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরের দিকে কেমন একটু শীত শীত করিতে লাগিল। চিনি গড়াইতে গড়াইতে মৃণালের কোলের কাছে আসিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, সে গায়ে দিতে চায়। মৃণালের ঘুম ভাঙিয়া গেল, মাথার কাছে একখানা নক্সাকাটা কাঁথা ছিল, তাহাই টানিয়া আনিয়া সে বেশ করিয়া চিনির গায়ে জড়াইয়া দিল। চিনি আবার নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে লাগিল। মৃণালের বালিশের তলায় একটা ইলেক্‌ট্রিক টর্চ্চ থাকিত, সেটা বাহির করিয়া পাশের টেবিলের উপর আলো ফেলিয়া দেখিল, পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। ভোর হইতে আর দেরি নাই। উঠিয়া পড়িবে কিনা ভাবিতে লাগিল, এখন আবার ঘুমাইতে সুরু করিয়া লাভ নাই। কিন্তু শীতের রাত, লেপের মায়া

সহজে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। শুধু শুধু অন্ধকার ঘরে জাগিয়া থাকিতেও ইচ্ছা করে না।

কিন্তু ইহারই মধ্যে মামীমারও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিনু উঠেছিস নাকি?"

মৃণাল বলিল, "উঠি নি, তবে জেগে আছি। যা শীত, আরও আধঘণ্টা-খানেক পরে উঠব। সবে এখন পাঁচটা।"

মামীমা বলিলেন, "আচ্ছা তুই শো, আমি উঠি। দেখতে দেখতে স্যিয্য উঠে যাবে, তোকে সকাল সকাল দুটো রেঁধে দিতে হবে ত! না খেয়ে ত আর যাওয়া হয় না! রাধী ছুঁড়ীকে ভোরে আসতে বলেছিলাম আজ, এলে এখন বাঁচি।"

মামীমা বিছানা ছাড়িয়া নামিয়া পড়িলেন। মৃণালও বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আমিও উঠলাম মামীমা, আমার আর শুতে ভাল লাগছে না।"

বাহিরে তখনও আকাশের গায়ে তারা ফুটিয়া আছে। মামাবাবুরও ঘুম ভাঙিয়াছে, তিনিও উঠিবার জোগাড় করিতেছেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সাড়া পাইয়া বলিলেন, "ধন্যি সহ্যি বাপু তোমার! এই দারুণ শীত, হাত-পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, কেমন ক'রে এই খোল' বারান্দায় শুয়ে থাক তাই ভাবি।"

মল্লিক-মহাশয় বিছানায় বসিয়া অন্ধকারে পা বাড়াইয়া চটি জুতা খুঁজিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "শীতে আমার কিছু এসে যায় না, কিন্তু আকাশ দেখতে না পেলে আমি বাঁচি না। বর্ষার দিন ক'টা আমার যে কি কষ্টে কাটে তা আর ব'লে কাজ নেই।"

মৃণাল বলিয়া উঠিল, "দিদিমাও এমনি ছিলেন, না মামাবাবু? তিনি ত ঘরে শুতেই পারতেন না। বৃষ্টির সময়ও না।"

মল্লিক-মহাশয় চটি পরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "মায়ের জন্যে ত সব সময় একটা জানালার দু'একটা গরাদ কাটা থাকত, ঘরে শুলেও মাথাটা সেই ফাঁক দিয়ে বার ক'রে রাখতেন। তিনি মারা যাবার পর তোর মামীমা আবার সে জায়গাগুলো শিক বসিয়ে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।"

মামীমা বলিলেন, "যা বেরাল আর ভামের উৎপাত, বন্ধ না ক'রে করি কি? টিনি চিনিও ঠাকুরমার ধাত পেয়েছে খানিক খানিক, মশারির ভিতর কিছুতে শুতে চায় না।"

খিড়কির দরজার শিকলটা ঠিন্ ঠিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। মামীমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যাক্, রাধী এসেছে, বাঁচা গেল। আর কোনও কাজকে ডরাই নে বাছা, কিন্তু এই শীতের ভোরে ঘাটের কনকনে জলে নামতে আমার যেন রক্ত হিম হয়ে যায়।"

মল্লিক-মহাশয় উঠানে নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। ভোরের অস্পষ্ট আলো তখন সবে জমাট অন্ধকারকে একটুখানি তরল করিয়া আনিতেছে। দেখা গেল, দুইটি নারীমূর্ত্তি আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। মল্লিক-মহাশয় লণ্ঠনটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, স্ত্রীলোক দুইটি ভিতরে ঢুকিয়া আসিল।

মামীমা বলিলেন, "রাধীর মাও এসেছিস্ দেখি।"

রাধীর মা বুড়ী বলিল, "রেতেভিতে মেয়্যাটারে একলা ছাড়ি ক্যাম্‌নে মা ঠাকরুণ? শিয়াল দেখে উ বড় ডরায়, তাই সাথে এলাম।"

মামীমা বলিলেন, "তা বেশ করেছিস, নে এঁটো সকড়ি বাসনগুলো উঠিয়ে নে। আমি কাপড় ছেড়ে উনুনটা ধরাই।"

শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিতে শীতকালে তাঁহার কি কষ্টটাই যাইত, মনে করিয়া গৃহিণীর হাসি আসিল। স্নান না সারিয়া ভাঁড়ার বা রান্নাঘরের

ত্রিসীমানায় যাইবার জো ছিল না। শাশুড়ী এমনই মন্দ মানুষ ছিলেন না, কিন্তু আচারনিষ্ঠা ও শুচিবাই বড়ই বেশী ছিল তাঁহার। মামীমাকে একরাশ চুল লইয়া ভোরেই ডুব দিতে হইত বড় পুকুরে, আর ঘোমটার অন্তরালে সারাদিন সে চুলের কাঁড়ি শুকাইতও না, সেও এক কম জ্বালাতন ছিল না। এক-এক সময় রাগ করিয়া কাঁচি হাতে লইয়া বলিতেন, "দেব একেবারে এ জঞ্জাল শেষ ক'রে।" কিন্তু স্বামীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাহা কোনদিনও করা হয় নাই। স্বামী বারণ না করিলেও তিনি কতদূর যে চুল কাটিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল, কারণ সধবা-মানুষের এমন কাণ্ড করা যে অতি অলক্ষণ, সে জ্ঞানের তাঁহার অভাব ছিল না।

রাধী ও রাধীর মা বাসন তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। মামীমা বাসি কাপড় ছাড়িয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া গেলেন। মৃণাল বারান্দায় উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরিতে লাগিল।

অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বদিকের আকাশে মুক্তার ন্যায় টলটলে স্বচ্ছতা ক্রমে আগুনের রঙে রাঙিয়া উঠিতেছে। এমন সুন্দর সকাল কলিকাতায় কেন হয় না? পাঁচতলা চারিতলা বাড়ীর আড়ালে সূর্য্যোদয় কোথায় হারাইয়া যায়, কেহ বুঝিতে পারে না। বুঝিতে চায়ও না বোধ হয়। কলিকাতায় দিনকে রাত ও রাতকে দিন করাই ত অভিজাত্যের লক্ষণ। সেখানে যে যত বেলা অবধি ঘুমাইয়া থাকিতে পারে, সে তত ভাগ্যবান্। এতদিন কলিকাতায় বাস করিয়াও কিন্তু মৃণালের ভোরে ওঠা রোগ সারে নাই। বোর্ডিঙে সর্ব্বদা সকলের আগে সে উঠিয়া পড়ে। তখনও কোনও ঘণ্টা পড়ে না, কাজেই আপন মনে সে বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়ায়, নীচে নামিবার তখনও হুকুম নাই।

মামীমার রান্না ইহারই মধ্যে চড়িয়া গিয়াছে। টিনি, চিনি, কানু সবাই উঠিয়া পড়িল, মৃণালকে তখন লাগিতে হইল তাহাদিগকে সামলাইবার কাজে। সে যখন থাকে না, তখন এই দুরন্ত শিশুগুলি মাকে না-জানি কি জ্বালানোই জ্বালায়। তিনি বড় হইলে তাহাকে সে কলিকাতায় লইয়া যাইবে একথা মৃণাল প্রায়ই মামীমাকে বলে। তিনি শুধু হাসেন। মৃণাল জানে, এসবে মামীমার মত নাই। মেয়ে-ছেলের উচ্চশিক্ষার যে কি প্রয়োজন তাহা মামীমা বুঝিতে পারেন না। মৃণাল পরের মেয়ে, তাহার উপর জোর নাই, তাই তাহার বাপের ইচ্ছামত তাহাকে স্কুলে পড়িতে দেওয়া হইয়াছে। মামীমার মেয়ে হইলে এতদিনে মাথায় লাল চেলীর ঘোমটা টানিয়া সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইত, এ-কথা মৃণাল নিশ্চয় করিয়া জানে। ভাবিতে তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠে।

৩

ভোরের আলো ক্রমেই উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। কুয়াসার স্বচ্ছ আবরণ একেবারে অপসারিত হয় নাই, তবে ইহারই ফাঁকে ফাঁকে আলোর অঞ্জলি চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে। ছেলেমেয়েরা ঠেলা-ঠেলি মারামারি বাধাইয়া দিয়াছে রোদ পোহাইবার জন্য। ঘুম ভাঙিলে পাড়া-গাঁয়ের ছেলেমেয়ে আর বিছানায় শুইয়া ঝিমাইতে চায় না, তখনই উঠিয়া পড়ে। তাহাদের দামী শীতবস্ত্রের বালাইও বেশী নাই, কাঁথা মুড়ি দিতে আরাম লাগে বটে, কিন্তু শীতের হাওয়া যখন খোলা মাঠের উপর দিয়া হু হু করিয়া ছুটিয়া যায়, তখন এই জীর্ণ বস্ত্রের বর্ম্মের সাধ্য কি যে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখে? ছেলেমেয়েদের হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়া যায়। তখন রোদটুকুতে পিঠ পাতিয়া বসা ছাড়া

উপায় কি? অতএব চিনি একখানা বড় পিঁড়ি পাতিয়া তাহার উপর উবু হইয়া বসিয়া আছে। সে চালাক মেয়ে, আগে-ভাগে ভাল জায়গাটুকু দখল করিয়া বসিয়া আছে। টিনি তত ভাল জায়গা পায় নাই, তাহাকে পিঁড়ি পাতিতে হইয়াছে একেবারে দাওয়ার সিঁড়ি ঘেঁষিয়া, বেশী নড়াচড়া করিতে গেলে গড়াইয়া উঠানে পড়িয়া যাওয়া অনিবার্য্য। তাই নিজের জায়গায় বসিয়াই দুই-একটা ঠেলা দিয়া সে দেখিতেছে, যে, চিনিকে তাহার সীমানা হইতে একটু হঠাইয়া দেওয়া যায় কি না। তবে এখন পর্য্যন্ত চিনি সদর্পে নিজের রাজ্য রক্ষা করিতেছে, একচুলও নড়ে নাই। তিনজনের মধ্যে কানুই আছে ভাল, এত সকালেই ত তাহাকে খাটের খুরার সঙ্গে বাঁধা যায় না, তাই তাহার মা তাহাকে কোলে লইয়াই রান্না করিতে বসিয়াছেন। আর একটু বেলা না হওয়া পর্য্যন্ত সে সেখানেই থাকিবে। শীতের ভোরে রান্নাঘরের মত আরামদায়ক জায়গা আর আছে কোথায়? কিন্তু মা বড় একচোখো, চিনি টিনিকে তিনি রান্নাঘরের ধারে কাছেও ঘেঁষিতে দেন না। তাহারা নাকি অতি নোংরা, তাহাদের কাপড়চোপড় বাসি।

মৃণাল ইহারই মধ্যে স্নান করিয়া ফেলিয়াছে, শীতের বাধা মানে নাই। এখানে গরম জলে স্নান করার নিয়ম নাই, যতই শীত হউক, খোলা পুকুর-ঘাটে, কনকনে ঠাণ্ডা জলেই স্নান করিতে হইবে। এইসব সময় মনে হয়, কলিকাতায় থাকিয়া আরাম আছে বটে, এক-এক-দিকে। চক্ষু, কর্ণ, মন সেখানে সারাক্ষণই পীড়িত হয়, কিন্তু শরীরটা আরাম পায়। ইচ্ছা না হয়, তুমি চব্বিশ ঘণ্টা খাট হইতে না নামিয়াই কাটাইয়া দিতে পার, সব-কিছুর ব্যবস্থাই হাতের কাছে পাওয়া যায়।

মামীমা কিন্তু শহরে যাহা-কিছু সমস্তেরই বিরোধী, বলেন, "মা গো মা, কি কাণ্ড! গা ঘিন্ ঘিন্ করে না গা? শোবার ঘরের পাশে ও

সব কি? কে জানে বাপু, আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, ও সব ভাল বুঝি না। তোর দিদিমা বেঁচে থাকলে অমন বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াতে দিতেন না তোকে, যা বিচার ছিল তাঁর।"

মৃণাল হাসে, কিন্তু মনে মনে মামীমার কথা স্বীকার করে না। এত বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া ত সে দেখিল, সত্যই আরাম এখানে পাওয়া যায়, যদি টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা থাকে। গরীবের পক্ষে অবশ্য কলিকাতা নরকতুল্য। বিনা পয়সায় এখানে কিছুই পাওয়া যায় না, আলো না, বাতাস না, আকাশের দিকে তাকাইবার অধিকার পর্য্যন্ত না। পল্লীজননীর কোল সত্যই মায়ের কোল, এখানে ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ তত উগ্র নয়। এখানে ভগবানের দেওয়া আলো-বাতাস হইতে কেহই বঞ্চিত নয়, খোলা আকাশের নীচে খোলা মাঠের বুকে বেড়াইবার অধিকার সকলের সমান। সকাল-সন্ধ্যায় কত যে বিচিত্র শোভার ভাণ্ডার চারিদিকে উন্মুক্ত হয়, তাহা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু মহানগরী যেন রূপকথার বিমাতা, ধনীরা তাহার নিজের সন্তান, দরিদ্রের সঙ্গে তাহার সতীন-পুত্রের সম্পর্ক। কোনও মতে সুধাচ্ছলে বিষ পান করাইয়া তাহাদের শেষ করিয়া ফেলিতে পারিলেই রাক্ষসী বাঁচে।

পিঠের উপর দীর্ঘ ভিজা চুলের রাশি মেলিয়া দিয়া, রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মৃণাল তরকারী কুটিতেছে। মামীমা এক হাতে কত আর করিবেন? তাহার উপর দুরন্ত খোকাটা তাঁহার কোলে, তাহাকে সামলাইয়া তবে তাঁহাকে কাজ করিতে হইতেছে। রাধী ঝি নীচু জাতের, বাহিরের কাজ, গোয়ালের কাজ ছাড়া তাহাকে আর কিছু করিতে দেওয়া হয় না। খোকাও আবার পরম রুচিবাগীশ, পারত পক্ষে রাধীর কোলে সে যাইতে চায় না।

মামীমা রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ও মা মিনু, ঝোলের তরকারীটা নিয়ে আয়, চড়িয়ে দিই, বেলা হয়ে গেল।"

রৌদ্রের তেজ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে, কুয়াসার শেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া যাইতেছে। এখন গাছের মাথায় বাঁশঝাড়ের উপরে পাতলা রেশমের ঘোমটার মত কুয়াসার টুকরা দেখা যায়, খানিক বাদে তাহাও আর থাকিবে না।

বাহিরে হুড়মুড় করিয়া একটা শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার, "হ, হ।"

চিনি ডাকিয়া বলিল, "দিদি, তোমার গাড়ী এসে গেছে।"

মামীমা উত্তরে রান্নাঘর হইতে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "যা ত চিনি, সিধুকে বলগে যা এখন গোরু খুলে দিতে। দিদির এখনও খাওয়া হয়নি, কাপড় পরা হয়নি, তোর বাবা এখনও বাড়ী ফেরেন নি। এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি আছে।"

চিনি ঘাড়টা এ-ধার হইতে ও-ধারে দোলাইতে দোলাইতে বলিল, "উঁহু, আমি যাব না ত।"

মামীমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেন যাবি না লা? ধাড়ী মেয়ে, একে দিয়ে যদি একটু সাহায্যি হয়! ও বয়সে আমরা ঘর-করনার কত কাজ করেছি।"

চিনি বলিল, "হুঁ, আমি যাই, আর উ আমার জায়গাটি নিয়ে নিক!"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "থাক গে মামীমা, তুমি ওদের ব'কো না এখন, নিজের নিজের সাম্রাজ্য রক্ষা নিয়ে ওরা ব্যস্ত আছে। আমি সিধুকে ব'লে আসছি। কানুকে দাও ত আমার কাছে, ওটা ত তোমায় জ্বালিয়ে মারল।"

খোকার দিদির কাছে যাইতে কোনও আপত্তি ছিল না, সে হাত বাড়াইয়া চলিয়া গেল।

বাহিরে খোলা মাঠের উপর সিধু গাড়ী আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। অতি সাধারণ ছই-দেওয়া গোরুর গাড়ী। গ্রামে অন্য কোনপ্রকার যানের ব্যবস্থা নাই। পাশের গ্রামটি বর্দ্ধিষ্ণু, সেখানে নাকি একখানা ঘোড়ার গাড়ী আছে। এ গ্রামেও বেশী পর্দ্দানশীন বউ-ঝি কেহ আসিলে বা গেলে সেই গাড়ীখানারই ডাক পড়ে। কিন্তু মৃণালের পর্দ্দার বালাই নাই, এই গোরুর গাড়ীতেই তাহার চলিয়া যায়। হাঁটিয়া যাইতেও তাহার আপত্তি ছিল না, তবে সঙ্গে মোটঘাট থাকে এই যা। মৃণালকে দেখিয়া সিধু নিজেই জিজ্ঞাসা করিল, "আর কত দেরি গো দিদি? গোরু-দুটাকে খুলে দিব?"

মৃণাল বলিল, "তাই দাও, এখনও দেরি আছে ঘণ্টাখানেক!"

সিধু গোরু-দুইটাকে মুক্তি দিল, দুই আঁটি খড়ও ছুঁড়িয়া দিল তাহাদের সামনে। গোরু দেখিয়া কানুর বীরত্বের অনেকখানিই লোপ পাইয়াছিল, সে দিদির ঘাড়ে মুখ গুঁজিয়া ছিল। মৃণাল তাহাকে লইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া আসিল। নিজের জিনিষপত্রের উপর আর একবার চোখ বুলাইয়া লইল। না, আর কিছু করিবার নাই। সবই গোছানো আছে।

মল্লিক-মহাশয় বাহিরে গিয়াছিলেন, এই সময় কচুপাতায় মুড়িয়া কিছু টাটকা চুনো মাছ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বড় মাছ কিছু পাওয়া গেল না গো, এই ক'টিই তেঁতুল দিয়ে টক ক'রে দিও, বেশ হবে।"

মৃণালের মামীমা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মাছগুলি স্বামীর হাত হইতে তুলিয়া লইলেন! বলিলেন, "ঐ বেশ, একটু আঁশমুখ ত করতে পারবে।"

মৃণালের মনটা ক্রমেই ভার হইয়া আসিতেছে। আর কতটুকু সময় বা বাকি? তাহার পরেই আবার সেই বোর্ডিং-বাস। মাগো, প্রাণটা তাহার যেন হাঁপাইয়া উঠে। মাতৃহীনা মেয়ে সে, কিন্তু মামীমার কোলে মানুষ হইয়া কোনও দিন সে দুঃখ তাহাকে অনুভব করিতে হয় নাই। এই ছোট গ্রামের গণ্ডির ভিতরই যদি তাহার জীবন কাটিয়া যাইত, তাহা হইলে দুঃখ ছিল কি? সত্য বটে, তাহা হইলে লেখাপড়া তাহার ঘটিয়া উঠিত না, বিশাল জগতের যেটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহাও পাইত না। সেটা যে কত বড় ক্ষতি তাহা বুঝিবার মত বয়স ও জ্ঞান মৃণালের হইয়াছে। তবু মন তাহার যেন বুঝিতে চায় না। এই গ্রামে কত মেয়ে আছে, যাহাদের অক্ষর-পরিচয়ও হয় নাই, অথচ কি নিশ্চিন্ত সুখে তাহাদের দিন কাটিয়া যাইতেছে। মৃণালেরও কি তেমনই কাটিতে পারিত না? কিন্তু সুখ, শান্তি, নিশ্চিন্ততা, স্বাধীনতা কিছুই নাই, এমন মেয়েও সে কম দেখে নাই। তাহাদের দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া লইলেই চলে না। যদি শিক্ষাদীক্ষা কিছুমাত্র এই মেয়েগুলির থাকিত, তাহা হইলে পরের হাতে এমন খেলার পুতুল হইয়া তাহাদের জীবন কাটিত না!

মোটের উপর সে স্বীকারই করে যে স্বাবলম্বনের পথে দাঁড় করাইয়া দিয়া পিতা তাহার পরম উপকারই করিয়াছেন। পথে অনেক কাঁটা, তা আর কি করা যাইবে? কোন্ পথে বা নাই? এই পথে ত তবু ভবিষ্যতে কিছু সুখের আভাস কল্পনা করা যায়। অন্য অনেকের ত সেটুকু সুখও নাই। চিনি-টিনিকে লেখাপড়া শিখাইতে তাহাদের মায়ের কেন যে এত আপত্তি, তাহা মৃণাল বুঝিতে পারে না। মামীমা নিজের শান্তির নীড়টুকুর বাহিরে কিছুই দেখিতে চান না, কিন্তু তাঁহার মেয়েদের অদৃষ্টও যে তাঁহারই মত সুপ্রসন্ন হইবে তাহার স্থিরতা কি?

মামীমা রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে মিনু, আমার হয়ে গেছে, ঠাঁই করেছি, খাবি আয়।"

খোকাকে কোলে করিয়া মৃণাল রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। চিনি আর টিনিও মাছের টক দিয়া গরম ভাত খাইবার লোভে তাহার পিছন পিছন আসিয়া জুটিল। কিন্তু মা তাহাদের একেবারেই আমল দিলেন না, তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিলেন।

মৃণালের ভাত বাড়িয়া দিয়া খোকাকে গৃহিণী ভাগ্নীর কোল হইতে টানিয়া লইলেন। মৃণাল খাইতে বসিল। বোর্ডিঙের খাওয়ায় পয়সা যথেষ্ট খরচ হয়, কিছু যে খারাপ খাইতে দেয় বা কম দেয় তাহাও নহে, তবু সেখানে পেট ভরে ত মন ভরে না। অন্য মেয়েরা রান্না লইয়া, রোজ একঘেয়ে তরকারি লইয়া খুব সমালোচনা করে, মৃণাল ততটা করিতে পারে না, তাহার লজ্জাই হয়। সে যে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অতি সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে, তাহা ত সবাই জানে। সে বেশী সমালোচনা করিলে কেহ যদি উল্টিয়া বলে, "বাড়ীতে তুমি দুবেলা কি পোলাও-কালিয়া খেতে গো?" তাহা হইলে সে কি উত্তর দিবে? কিন্তু মন তাহার অন্য মেয়েদের সমানই খুঁৎখুঁৎ করে।

মামীমা সামনে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। এত সকালে মানুষ কত ভাতই বা খাইতে পারে? তবু বারবার অনুরোধ করিয়া এটা-সেটা পাতে তুলিয়া দিয়া, মামীমা তাহাকে খানিকটা খাওয়াইয়াই ছাড়িলেন।

মৃণাল হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় পড়িতে গেল। গ্রামে যত দিন থাকে, জুতামোজার সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক থাকে না, যতই শীত পড়ুক না কেন। কিন্তু কলিকাতার জীবনে এ-সব ত তাহার নিত্য সঙ্গী। তাহাকে জুতামোজা পরিতে দেখিয়া চিনি-টিনিও লাফালাফি করে,

তাহারাও দিদির মত জুতামোজা পরিবে। হাতখরচের পয়সা জমাইয়া মৃণাল একবার তাহাদের জন্য দুই জোড়া জুতামোজা কিনিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু ঐ লাফালাফি পর্য্যন্তই। জুতামোজা পরিলে ত অমন বনের হরিণের মত লাফাইয়া বেড়ানো যায় না? কাজেই জুতামোজা তাকেই তোলা থাকে, আছে যে সেই আনন্দই চিনিদের যথেষ্ট।

বাহিরে গোরুর গাড়ী আবার জোতা হইল। মৃণালের নির্দ্দেশমত তাহার জিনিষপত্র গাড়োয়ান এক এক করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল। মামীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে, খান দু-চার চন্দ্রপুলি ছেঁড়া কানিতে বেঁধে দেব? পথে যেতে যদি খিদে পায়?"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "কিছু দরকার নেই মামীমা। এই ত পেট ভ'রে খেলাম, আর বিকেলবেলায়ই ত পৌছে যাব, আবার কখন খাব? আমি ত আর টিনি নয় যে আধ ঘণ্টা অন্তর না খেলে মারা যাব?"

মল্লিক-মহাশয় চাদর গায়ে দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, তিনি ভাগ্নীকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিবেন। ষ্টেশনমাষ্টারের এক বোন এই ট্রেনে কলিকাতা যাইতেছেন, কাজেই ষ্টেশন পর্যন্ত পৌছাইয়া দিলেই তিনি নিশ্চিন্ত।

মামীমাকে প্রণাম করিয়া, ভাইবোনদের আদর করিয়া মৃণাল গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। মুখটা অন্য দিকে ফিরাইয়া রাখিল, যাহাতে চোখের জল কেহ না দেখিতে পায়। পনর বৎসর বয়স ছাড়াইয়া গেল, এখনও প্রতি ছুটির শেষে বোর্ডিঙে ফিরিতে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠে।

চিনি ডাকিয়া বলিল, "এবার আসবার সময় ভাল দে'খে বেশী ক'রে চকোলেট নিয়ে এস।"

তাহার মা তাড়া দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তা আর নয়, দিদি একেবারে টাকার ছালার উপর ব'সে আছে, তোমাদের জন্যে বাক্স ভ'রে মিষ্টি নিয়ে আসবে।"

গ্রাম্য পথে ধূলা উড়াইয়া গোরুর গাড়ী চলিতে লাগিল। মৃণাল খানিকক্ষণ মুখ ফিরাইয়া রহিল, তাহার পর জোর করিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। বাড়ীর দিকে তাকাইয়া দেখিল, মামীমা তখনও কানুকে কোলে করিয়া বাহিরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছেন। চিনি-টিনি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

দু-ধারে অতি পরিচিত খড়ের ঘরগুলা, আঙ্গিনায় ধূলিমলিন-দেহ বালকবালিকার নৃত্য, ছোট সঙ্গীতমুখর নদীটি, সব একে একে পার হইয়া গেল। ছোট গ্রাম্য বাজারের ভিতর দিয়া এখন গাড়ী চলিতেছে। দুই ধারের পথিক উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছে গাড়ীর ভিতর কে যায়। সকলের আসা-যাওয়া সম্বন্ধে এখানে সকলের কৌতূহল, পল্লীসমাজ যেন একটি বৃহৎ পরিবার, কেহ কাহারও অচেনা নয়, অজানা নয়।

ক্রমে গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনের বাহিরে দাঁড়াইল। একটি লাল পাথরের ঘর, একটা টিনের শেড্ আর লাল কাঁকর-বিছানো প্রকাণ্ড প্ল্যাটফর্ম্ম। গোটা-দুই বড় বড় অশ্বত্থগাছ চারিদিকে ডালপালা ছড়াইয়া অনেকখানি জায়গা ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই তলায় যাত্রীর দল আড্ডা গাড়িয়াছে। এক জায়গায় লোহার বেঞ্চ, ষ্টেশনমাষ্টারের বোন সেইখানে নিজের ছেলেমেয়ে লইয়া বসিয়া আছেন। ঘরের ভিতর বড় গরম, পাখার কোনও ব্যবস্থা নাই, কাজেই পারতপক্ষে সেখানে কেহই বসে না।

মৃণালকে দেখিয়া তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "এইখানে এস, তবু একটু ছায়া আছে।"

মৃণাল আসিয়া তাঁহার পাশে বসিল। বলিল, "গাড়ী আসতেও ত আর বেশী দেরি নাই।"

ভদ্রমহিলা বলিলেন, "এই এসে পড়ল ব'লে। এখন একরাশ পোঁটলাপুঁটলি উঠলে বাঁচি।"

ট্রেন সত্যই আসিয়া পড়িল। মৃণাল মামাবাবুকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া গেল। এক মিনিট পরেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

৪

কলিকাতা পৌছাইতে প্রায় বেলা গড়াইয়া গেল। শীতকালের দিন, চারিটা বাজিতে-না-বাজিতে যেন দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিতে থাকে। তাহার পর নামিয়া আসে নগরের উপরে ধোঁয়ার পর্দ্দা, দুই হাত দূরে মাত্র মানুষের দৃষ্টি চলে, রাস্তার আলো সুদ্ধ ঘোলাটে দেখাইতে থাকে। মন মুষড়িয়া পড়ে, নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর এক অঞ্জলি করিয়া যেন কয়লার গুঁড়া ঢুকিয়া যায়।

মৃণাল ষ্টেশনে নামিয়া বলিল, "আমি কি আজ আপনাদের সঙ্গেই যাব, না আমাকে বোর্ডিঙে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবেন?"

তাহার সঙ্গিনীর মৃণালকে বাড়ী পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার অতি ছোট বাড়ী, শুইবার ঘর মাত্র একখানি। বাহিরের লোক আসিলেই বিপদে পড়িতে হয়। পুরুষ-অতিথি হইলেও না-হয় তাহাকে যেখানে সেখানে শুইতে দেওয়া যায়, কিন্তু এ যে আবার স্ত্রীলোক!

তিনি একটু অনাবশ্যক ব্যস্ততার সঙ্গেই বলিলেন, "তোমাকে উনি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসুন ভাই, আমি খোকার সঙ্গেই বেশ যেতে পারব, চেনা রাস্তা ত? বাড়ীঘর সব এক-হাঁটু হয়ে আছে, আমি এতদিন ছিলাম না।"

মৃণাল ভাবিল, সে ত মস্ত আয়েসী মানুষ, তাহার জন্য আবার ভাবনা! কিন্তু যাহার বাড়ী সে-ই যদি না রাখিতে চায় ত মৃণাল কি আর জোর করিয়া যাইবে? বোর্ডিঙেই যাওয়া যাক। যদিও আজকার রাত্রিটা অন্ততঃ বাহিরে কাটাইতে পাবিলে তাহাব ভাল লাগিত।

বলিল, "তা বেশ, আমাকে উনি দিয়েই আসুন।"

দুইখানা গাড়ী ডাকা হইল। মৃণাল নিজের অল্পস্বল্প জিনিষপত্র লইয়া একখানাতে উঠিয়া বসিল। ষ্টেশন-মাষ্টারের বোন নিজের ছেলে-পিলে লটবহর লইয়া আব-একখানি অধিকার করিলেন। কুলির চিৎকার, গাড়ীর ঘডঘডানি, ট্রাম-বাসের কোলাহলের ভিতর দিয়া গাডী চলিতে আরম্ভ করিল।

কি দানবীয় মূর্ত্তি এই কলিকাতা শহরটার। মৃণালের যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না যে আর কয়েকটা মাত্র ঘণ্টা আগে সেই শ্যামল গাছের ছায়ার কোলে সাজানো ছোট সুন্দর গ্রামখানিতে সে ছিল। যেন মায়ের কোলের মত স্নিগ্ধ, ভোরের আলোর মত মনোহর। তাহার কাছে কলিকাতা যেন মায়াবিনী রাক্ষসী। চোখ ভুলাইবার, মন ভুলাইবার অসংখ্য উপকরণ তাহার আছে, কিন্তু সে একবার এই মুখোস খুলিলে হয়, তখন সে সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপিণী পিশাচী। এখানে থাকিতে থাকিতে মানুষ কেন পাথর হইয়া যায় না, তাহাই মৃণাল ভাবে। খানিকটা হয় বই কি? পাড়াগাঁয়ে মানুষের মনে যতখানি

স্নেহ-প্রীতি থাকে, এখানে ততটা সত্যই যেন থাকে না। অন্ততঃ মৃণালের তাহাই মনে হয়।

মামার বাড়ী হইতে ষ্টেশনে আসিতে মৃণাল চোখকে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম দেয় নাই, সেই সহস্রবার-দেখা মাঠ, বন, নদী খেলাঘরের মত সাজানো খড়ের ঘরগুলি, সব অতৃপ্ত চোখে দেখিতে দেখিতে আসিয়াছে। এখানে কিন্তু তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, চোখ বুজিয়া রাস্তাগুলা পার হইয়া যায়। কিন্তু চোখ সে চাহিয়াই রহিল। ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক, এই কলকোলাহল, এই মানুষের আর বিবিধ রকমের গাড়ী-ঘোড়ার স্রোত, ইহার দিক্ হইতে মনও ফিরে না, চোখও ফিরে না। দুই দিন বাদেও যদি কোথা হইতে ঘুরিয়া এস তাহা হইলে মনে হয় কলিকাতা অনেকখানিই যেন অন্য রকম হইয়া গিয়াছে। দোকানপাটের ত নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে। রাস্তাঘাটও থাকিয়া থাকিয়া বদ্‌লাইয়া যায়। আর নূতন বাড়ীর ত সংখ্যাই করা যায় না, একটার পর একটা এমন দ্রুতবেগে গজাইয়া উঠিতে থাকে, যে, তাহাদের কল্যাণে দেখিতে দেখিতে সমস্ত জায়গাটারই চেহারা বদ্‌লাইয়া যায়।

হাওড়া হইতে বোর্ডিঙে পৌঁছাইতে মৃণালের প্রায় পূরা এক ঘণ্টাই কাটিয়া গেল। তাহার পর নিয়ম মত দারোয়ান আসিয়া গেট খুলিয়া দিল, কোন্ দিকে গাড়ী লইয়া যাইতে হইবে তাহাও গাড়োয়ানকে দেখাইয়া দিল। মৃণালের সঙ্গীটি এইবার নামিয়া পড়িয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। কে আসিয়াছে দেখিবার জন্য মেয়েরা দুই-চারজন ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মৃণালকে দেখিয়া দুইজন আবার চলিয়া গেল, মৃণাল অন্য ক্লাসের মেয়ে, তাহার আসা-না-আসায় এই দুইজনের কিছু আসিয়া যায় না, আর দুইজন দাঁড়াইয়া রহিল, ইহারা তাহার বন্ধুর দলের।

মৃণাল নামিয়া পড়িতেই একজন বলিল, "খুব সময়ে এসে পড়েছিস, এখনই খাবার ঘণ্টা পড়বে। সারাটা দিন ট্রেনে না-খেয়ে এসেছিস ত ? তোর নিয়ম আমার জানা আছে।"

মৃণাল একটু হাসিয়া তাহাদের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিল, পিছনে বেয়ারা তাহার বাক্স-বিছানা বহন করিয়া আনিতে লাগিল।

আবার সেই খাঁচায় বন্দী। আর সে মানুষ নয়, কলের পুতুলমাত্র। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে উঠিতে বসিতে হইবে, শুইতে হইবে, ঘুমাইতে হইবে। ইচ্ছামত, যখন যাহা খুশী মানুষ যে করিতে পারে, তাহা একেবারে ভুলিয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু এই জীবনেরও মূল্য আছে, এমনভাবে কঠিন শাসনের অধীন হইয়া থাকারও প্রয়োজন আছে তাহা স্বীকার না করিয়া মৃণাল থাকিতে পারে না। কিন্তু মন বুঝিতে চায় না, মৃণালের মন অন্য মেয়েদের চেয়ে যেন একটু বেশী ঘরমুখী। ছেলেবেলা হইতে আপন ঘর তাহার নাই, পরের ঘরেই সে পালিত, তাই কি ঘরের দিকে এত বেশী তাহার মন পড়িয়া থাকে ? বড় হইয়া কি সে করিবে, কেমন ভাবে জীবন যাপন করিবে ? ভাবিতে গেলে ঐ রকম একটি সুন্দর পল্লীভবনের ছবিই কেন সবার আগে তাহার মানস-নেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে ? আর কোনও রকম ভবিষ্যতের কল্পনা কেন সে করিতে পারে না ?

ছুটির আগে একদিন বেড়াইবার সময় তিন বন্ধুতে গল্প হইতেছিল। আশা বলিল, "বাপ রে, কবে যে এই ঘানিতে ঘোরা শেষ হবে ! আর পারা যায় না, এখনও হয়ত পাঁচছ'টা বছর এরই মধ্যে কাটাতে হবে, ভাবলেই আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে।"

প্রমীলা বলিল, "আমি বাবা এই ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত, তার পর আর এমুখো হচ্ছি নে। অত ব্লু ষ্টকিং হয়ে আমার দরকার নেই।"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "ও, সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করবে বুঝি? সব ঠিক হয়ে আছে নাকি?"

প্রমীলা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "নাই বা ঠিক হল? ঠিক হতে কতক্ষণ? আমার বাপু সোজা কথা, একটু পড়াশুনো না করলে আজকাল চলে না, লোকে মুখ্যু ব'লে ঠাট্টা করে, তাই পড়তে আসা। তারপর কলেজের পড়া পড়তে পড়তে পিঠ কুঁজো হয়ে যাক, চোখে চশমা উঠুক, তখন যা ছিরি হবে।"

আশার বাড়ীর সব মেয়েরাই উচ্চশিক্ষিতা। মা বি-এ পাস, দুই দিদি বি-এ পাস। তাহাকেও যে বি-এ পাস করিতে হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই, এবং তাহাতে আশার বিন্দুমাত্র আপত্তিও নাই। তাই প্রমীলার কথায় চটিয়া গিয়া বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সবই পড়াশুনোর দোষ। তোমরা স্বাস্থ্যের কোনও একটা নিয়ম মেনে চলতে জানবে না, আর দোষ হবে পড়াশুনোর। আমার মায়ের ত তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, কোনওদিন তাঁকে চশমা পরতে দেখেছিস? বড়দি আর মেজদি ত তোর সামনেই এখান থেকে ড্যাং ড্যাং করতে করতে বি-এ পাস ক'রে বেরিয়ে গেল, তাদের পিঠে কত বড় কুঁজ ছিল? তাদের কেউ আর পোঁছে নি, না?"

আশার বড় বোন বিভা সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, তাঁহার বিবাহ চট্ করিয়াই হইয়া গিয়াছে। মেজ বোন শুভাও বেশ জোর কোর্টশিপ চালাইতেছেন, কাজেই তাঁহাদের কেহ পোছে না একথা আর কি করিয়া বলা যায়? তবু প্রমীলা হটিবার মেয়ে নয়, বলিল, "দু-একটা একসেপ্‌শন্' থাকলেই যে জিনিষটা অপ্রমাণ হয়ে যায় তা ত নয়? কত গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ে দেখেছি, উচ্চশিক্ষার ঠেলায় যাদের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য দুইই নষ্ট হয়ে গেছে।"

আশা বলিল, "আর আমি হাজারে হাজারে অশিক্ষিতা মেয়ে দেখেছি যাদের স্বাস্থ্যও নেই, সৌন্দর্য্যও নেই, আছে কেবল বোকার মত লম্বা লম্বা কথা, যা তারা স্বার্থপর পুরুষের কাছে শিখেছে এবং না বুঝে তোতা পাখীর মত আওড়াচ্ছে। আর আছে কোলে, পিঠে, কাঁখে, গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে।"

তর্কটা শেষে ঝগড়ায় পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া মৃণাল বলিল, "যাকগে ভাই, ও নিয়ে তর্ক ক'রে কি হবে? তর্কেতে আর কি প্রমাণ হবে? দু-পক্ষেই ত ঢের কথা বলবার আছে।"

আশা বলিল, "আচ্ছা, তোর নিজের মতলবখানা কি শুনি? তুই ম্যাট্রিক পাস ক'রেই বিয়ে করতে দৌড়বি, না, কলেজে পড়বি?"

মৃণাল বলিল, "সবটাই কি আর আমার হাতে থাকবে ভাই? বাবা রয়েছেন, মামা রয়েছেন, তাঁদের কি মত হবে কে জানে? আমার নিজের অবশ্য ইচ্ছে যে কলেজেই পড়ি।"

আশা বলিল, "তবে দেখ, মৃণাল যে অত পাড়াগাঁয়ের ভক্ত, সেও মুখ্যু হয়ে থাকতে চায় না, আর তোর বাড়ী কলকাতায়, তোর এত সাত-তাড়াতাড়ি গোয়ালে ঢুকবার সখ কেন রে?"

প্রমীলা হাসিয়া বলিল, "তা আমার যদি সখ হয় বাপু ত কি করা যাবে? হাই-হীল জুতো প'রে, হাতে ব্যাগ নিয়ে, খট্ খট্ ক'রে ক্লাসে পড়াতে যাচ্ছি, কি ডাক্তারী করতে যাচ্ছি, তা ভাবতে আমার একটুও ভাল লাগে না। তার চেয়ে রান্নাবান্না ঘরকন্নার কাজ করছি ভাবতে ঢের বেশী ভাল লাগে।"

আশা বলিল, "আসল পয়েণ্টটা বাদ দিয়ে যাচ্ছ কেন?"

প্রমীলা বলিল, "বাদ দেওয়াদেওয়ি আর কি? সংসার যখন করব, তখন ঘরের কর্ত্তা একটা থাকবে, সে ত জানা কথা।"

মৃণাল বলিল, "আমার ভাই একটি ছোট সুন্দর খড়ের চাল-দেওয়া ঘর, আর চারিদিকে খোলা মাঠ, এই ভাবতেই চমৎকার লাগে। কিন্তু কর্ত্তাটর্ত্তার ভাবনা এখনও মনে আনতে পারি নে বাপু।"

প্রমীলা বলিল, "তা খড়ের ঘরে কি তুই একলা হাত পা ছড়িয়ে ব'সে থাকবি নাকি? যত অনাস্মৃষ্টির কথা, চিরকেলে খুকী এক তুই।"

এই সময় ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িয়া যাওয়ায় বেড়ানো এবং গল্প দুই-ই শেষ হইয়া গেল।

সত্যই মৃণাল ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিত না যে ভবিষ্যৎ জীবনটা কি রকম হইলে তাহার পক্ষে সব চেয়ে সুখের হয়। শিক্ষা যতদূর পাওয়া সম্ভব সব সে পাইতে চায়, কাহারও গলগ্রহ হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেও সে চায় না, কিন্তু চিরকাল চাকরি করিয়া কাটাইতেছে ভাবিতেও তাহার ভাল লাগে না, শহরে থাকিতে সে চায় না, পল্লীভবনেই ফিরিয়া যাইতে চায়। কিন্তু সেখানে কেমন ভাবে থাকিবে, কি কাজে দিন কাটিবে, তাহা এখনও তাহার মনে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। কিন্তু অদৃষ্টে তাহার কি আছে তাহা কেই বা বলিতে পারে? মামা-মামী ত উচ্চশিক্ষার একান্ত বিরোধী। বাবা যদিও তাহাকে পড়িতে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু সেটা উচ্চশিক্ষার প্রতি অনুরাগ বশতঃ নয়, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে। মেয়ের যদি বিবাহ তিনি না দিতে পারেন, তাহা হইলে সে একেবারে অসহায় না হইয়া পড়ে, সেটা ত দেখিতে হইবে? সেই জন্যই তাহাকে পড়িতে দেওয়া। বিবাহ দিতে পারিলে ত তিনি দিবারই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, এবং মামা-মামীও তাঁহাকে সাহায্যই করিবেন।

ট্রেন হইতে নামিয়া মৃণালের মাথাটা কেমন যেন ধরিয়া উঠিয়াছিল। একবার স্নান করিতে পাইলে হইত। পাড়াগাঁয়ে সে দিব্য শীত

উপভোগ করিয়া আসিয়াছে, কলিকাতায় কিন্তু এখনও বিশেষ শীত পড়ে নাই। কিন্তু বোর্ডিঙে ইচ্ছা করিতেছে বলিয়াই ত আর কিছু করিবার জো নাই? কাজেই হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় বদলাইয়া সে খাইতে চলিল। আয়োজন বাড়ীর চেয়ে এখানে বেশী, তবু খাইয়া মন উঠে না। প্রতি টেবিলে একজন করিয়া শিক্ষয়িত্রী মেয়েদের সঙ্গে খাইতে বসেন, কাজেই হাজার অসন্তোষ মনের মধ্যে জমা হইয়া থাকিলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। ভাল লাগুক বা মন্দ লাগুক, সব-কিছু মুখ বুজিয়া খাইয়া যাইতে হইবে।

খাওয়া চুকিয়া গেল, তাহার পর একটা একটা করিয়া ঘণ্টা পড়িবে, আর পুতুলনাচের পুতুলের মত মেয়েদের তালে তালে হাত-পা নাড়িতে হইবে। একেবারে শুইবার ঘণ্টা পড়িলে তখন এই নাট্যের শেষ। কাল হইতে সমানে ক্লাস আরম্ভ হইবে, তখন আর এসব ভাবিবার অত সময় থাকিবে না। মামার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম কয়টা দিন বড় বেশী খারাপ লাগে, তাহার পর এখানকার কর্ম্মস্রোতে সে ভাসিয়া চলে, মন লইয়া নাড়াচাড়া করিবার অত সময়ও সে পায় না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গও তাহাকে খানিকটা ভুলাইয়া রাখে। সামনে পরীক্ষা, তাহার ভাবনাও বড় কম নয়। এবারে বাৎসরিক পরীক্ষায় পাশ করিলে সে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠিবে, তাহার পর ত মস্ত বড় পরীক্ষা। তাহা কি মৃণাল পাস করিতে পারিবে, কে জানে? বয়স ত যথেষ্ট হইয়াছে, ফেল করিলে ছোট ছোট সব মেয়ের সঙ্গে পড়িতে হইবে, সে এক মহা লজ্জার কথা।

ম্যাট্রিকের পর বাবা তাহাকে পড়াইবেন কিনা কে জানে? মামা-মামী ত এইতেই বিরক্ত। ষোল বছরের মেয়ে হইতে চলিল, এখনও বিবাহের নামগন্ধ নাই। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ ত অনেকেই করে

কিন্তু এমন পর হইয়া কেহ যায় না। নিতান্ত কয়েকটা টাকা না দিলে নয়, তাই ফেলিয়া দিয়াই মৃণালের বাবা খালাস। মেয়ের কাছে বৎসরে একখানা চিঠিও লেখেন কি না সন্দেহ, বিজয়ার সময় হয়ত লেখেন। মল্লিক-মহাশয়ের কাছে কখনও কখনও একটা করিয়া পোষ্টকার্ড আসে, এই পর্য্যন্ত।

মৃণাল জানে, তাহার অনেকগুলি ভাইবোন হইয়াছে, কিন্তু কাহাকেও সে চোখে দেখে নাই, নাম-ধামও বিশেষ কাহারও জানে না। বড় বোনটি বোধ হয় দশ বৎসরের হইবে। মাঝে মাঝে তাহাদের দেখিতে ইচ্ছা করে, বাবাকেও দেখিতে ইচ্ছা করে। যেমনই ব্যবহার করুন তিনি, বাবা ত বটে? ভাইবোনগুলিও আপনারই। কিন্তু মৃণাল জানে, এ-সব সাধ পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কে তাহাকে সেখানে লইয়া যাইবে? বাবাও যে তাহাকে দেখিয়া খুশী হইবেন এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। বিমাতা নিশ্চয়ই খুশী হইবেন না।

এবারে বাবার কাছ হইতে বিজয়ার সময় যে চিঠিখানা পাইয়াছে, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর ভাল নাই। বেশী অসুখ কিনা কে জানে? মৃণাল চিঠির উত্তর দিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর চিঠি পায় নাই।

৫

মৃগাঙ্কের সংসার এখন ভরিয়া উঠিয়াছিল। প্রিয়বালার ছয়-সাতটি ছেলেমেয়ে হইয়াছে, সব কয়টিই প্রায় সমান ডানপিটে, ঘরের কাজকর্ম্ম সারিতে আর ছেলে মেয়ে সামলাইতে একলা মানুষ তাঁহার প্রাণান্ত হইয়া যায়। বড়মেয়ে সুবালার বয়স বছর দশ হইয়াছে, সে-ই যা

একটু মানুষের মত। আর কোন কাজে লাগুক বা নাই লাগুক, ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে সামলাইয়া মায়ের অনেকটা সাহায্য করে। বাকী-গুলা এখনও বনের পশুর মত আছে, মানুষের পদবীতে উন্নীত হয় নাই। ভালর মধ্যে এইটুকু যে অসুস্থ কেহ নয়, সব কটারই মোটের উপর শরীর ভাল। তা না হইলে এই টানাটানির সংসারে আর তাহাদের বাঁচিতে হইত না। ঔষধ, পথ্য, ডাক্তারের ভিজিট, এসব কোথা হইতে আসিত? মৃগাঙ্কের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই, যেমন ছিল তাই আছে, কিন্তু মানুষ এখন এত বাড়িয়াছে যে এই অল্প আয়ে আর কুলায় না, মোটা ভাত মোটা কাপড় জুটাইতেই জিব বাহির হইয়া পড়ে। বড় মেয়ে সুবালা ওরফে বুলু, তাহার পরে এক ছেলে গুলু, তাহার পরে আবার দুই মেয়ে টেঁপী আর ক্ষেপী, তাহার পর তিন ছেলে নিধু, বিধু আর সিধু। সিধুর বয়স মাত্র কয়মাস, সবে হামা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

গ্রামে ভাল স্কুল নাই, বিদ্যালয় বলিতে দুইটি পাঠশালা আছে, একটি ছেলেদের, একটি মেয়েদের। মেয়েদের পড়াইবার কথা প্রিয়বালা স্বপ্নেও মনে স্থান দেন না। বুলু যদি হঠ্‌ হঠ্‌ করিয়া বিবি সাজিয়া রোজ দশ ঘণ্টা পাঠশালায় কাটাইয়া আসে তাহা হইলে একটা আটমাসের ও একটা দুই বছরের ছেলে ট্যাঁকে গুঁজিয়া তিনি এই রাবণের গুষ্টির পিণ্ডি রাঁধিবেন কি প্রকারে? তিনি ত আর দশভুজা নন? ও সব মেমসাহেবীআনা মেমসাহেবের মেয়েদেরই পোষায়, পাড়াগাঁয়ে হিন্দুঘরে পোষাইবে না। টেঁপী আর ক্ষেপীরও পড়া আরম্ভ করিবার বয়স হইয়াছে, সেগুলি ঘর হইতে যতক্ষণই বাহিরে থাকুক, তাহতে প্রিয়বালার সম্মতি বই আপত্তি নাই, কিন্তু বড় বোনকে বাদ দিয়া তাহাদের পড়িতে পাঠাইলে বুলি আর মায়ের রক্ষা রাখিবে?

এমনিতেই সতীনঝি সহরে গিয়া পরীক্ষায় পাশ দিবার জোগাড় করিতেছে, আর বুলির এখনও অক্ষর-পরিচয়ের অধিক বিদ্যা অগ্রসর হইল না, ইহারই খোঁটা প্রিয়বালাকে কতবার খাইতে হয়। কিন্তু উপায় নাই। মৃতা সতীন এবং জীবিতা সতীন-কন্যাকে গাল পাড়িয়া যেটুকু গায়ের ঝাল মিটান যায়, তাহার বেশী কিই বা প্রিয়বালা করিতে পারেন? তাও যদি সতীন-ঝিটা গালাগালিগুলি শুনিতে পাইত। স্বামী ত কানে তুলা গুঁজিয়া, পিঠে কুলা বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন, একেবারে কাঠের পুতুল।

ছেলে গুলু পাঠশালাতে পড়ে, সে বেটাছেলে, তাহাকে লেখাপড়া শিখিতেই হইবে। পাশের গ্রামে ভাল মিড্‌ল্‌ ইংলিশ স্কুল আছে, সেখানে এ গ্রামের কয়েকজন ছেলে পড়িতেও যায়, কিন্তু প্রিয়বালার আদরের ছেলে অতদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিবে না বলিয়া তাহার আজ পর্য্যন্ত স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া হয় নাই। নিজে একেবারে বর্ণজ্ঞানহীন বলিয়া পড়াশুনার প্রয়োজনটা যে কতখানি তাহা প্রিয়বালা ঠিক বুঝিতে পারেন না। টাকা আনিবার জন্য বিদ্যার প্রয়োজন বটে, কিন্তু গুলুর বয়স ত মাত্র আটবৎসর। এখনই কি আর সময় উৎরাইয়া গিয়াছে?

মৃগাঙ্কমোহনের বয়স বেশী হয় নাই, কিন্তু ইহারই ভিতর তিনি যেন অনেকখানি বুড়া হইয়া পড়িয়াছেন। পাশের গ্রামে জমিদারী সেরেস্তায় তিনি কাজ করেন, ইহা তাঁহার পৈত্রিক ব্যবসা, তাঁহার বাবাও এই কাজই করিতেন। কিন্তু ঐ যে যাইতে আসিতে ক্রোশ দুই আড়াই হাঁটিতে হয়, ইহাতেই তিনি এখন কাতর বোধ করেন। পাড়াগাঁয়ের মানুষ এইটুকু হাঁটাকে গণনার মধ্যেই আনে না, কিন্তু পূর্ব্বের স্বাস্থ্য আর তাঁহার নাই। সংসারের বোঝাটা ক্রমেই যেন গুরুভার হইয়া

তাঁহার কাঁধে চাপিয়া বসিতেছে। মাঝে মাঝে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। এতগুলা অপোগণ্ড ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মন আশঙ্কায় ভরিয়া উঠে। তিনি যদি অকালে চলিয়া যান ত ইহাদের হইবে কি? মামার বাড়ীর দিকে ত কাহারও কাছে আধলার সাহায্য পাইবার উপায় নাই। কপর্দ্দকহীন দরিদ্রের ঘরে যখন বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন এদিক্‌টা মৃগাঙ্ক ভাবিয়া দেখেন নাই।

শীতকালের সকালটায় বিছানা ছাড়িয়া নড়িতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে সকালে না উঠিলে, নানাদিকে নানা অসুবিধা। কাজেই দোলাইখানা দুপাকে গায়ে জড়াইয়া কাশিতে কাশিতে মৃগাঙ্ক উঠিয়া বসিলেন এবং বাহিরে যাইবার জোগাড় দেখিতে লাগিলেন। বুলু রান্নাঘরের দাওয়া হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবা, গরম জল চাই নাকি?"

মৃগাঙ্ক খিড়কীর দরজা দিয়া বাহির হইতে হইতে বলিলেন, "এখন না, পরে দিস্।"

প্রিয়বালা মুখ ভ্যাঙাইয়া বলিলেন, "পরে দিস্! দশটা দাসীবাঁদী ব'সে আছে কিনা, তাই পঞ্চাশবার ক'রে গরম জল ক'রে দেবে। এদিকে ত দুখানা কাঠ ভেঙে আনবারও ক্ষমতা নেই, তাও আমি বেটী গিয়ে ভাঙব।"

বুলু একটু বাপের ভক্ত বেশী, সে মায়ের অবিচারে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আহা, কাল যত কাঠ সব ত আমি আর টেঁপি কুড়িয়ে নিয়ে নিয়ে এসেছি, তুমি আবার কখন ভাঙলে? বাবার যদি এখন জলের দরকার না থাকে, তবু জোর করে নিতে হবেক্ নাকি?"

প্রিয়বালা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "যা যা ছুঁড়ী, বেশী আদিখ্যেতা করতে হবে না। আমার কথায় আবার উনি এলেন খুঁত ধরতে,

যেন বুড়ী শাশুড়ী ঠাকুরুণ। যা দিখি, সিধুটা কেঁদে উঠল কেনে দেখ গিয়া।”

বুলি অগত্যা গজর গজর করিতে করিতে উঠিয়া গেল। ঝগড়ায় সেও মায়ের চেয়ে কমে যায় না, তবে সকালবেলা উঠিয়াই ঝগড়া করিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, কেমন যেন নিস্তেজ লাগিতেছিল। অন্ততঃ এক ধামি মুড়ি কাঁচা লঙ্কা বা কচি পেঁয়াজ দিয়া পার করিতে না পারিলে, কোমর বাঁধিয়া ঝগড়া করার মত জোর পাওয়া যায় না। কিন্তু মা যে এখনই মুড়ি বাহির করিবেন, তাহার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

প্রিয়বালা ভাতের হাঁড়িতে ধোওয়া চালগুলি ঢালিয়া দিলেন, সঙ্গে গোটা দুই আলু বেগুনও দিলেন। ন'টা বাজিতে না বাজিতেই ত ভাতের তাগিদ আসিবে। ইহার ভিতর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আর তিনি কোথা হইতে রাঁধিবেন? ইহারই ভিতর দুধ জ্বাল দিয়া ছোটগুলাকে খাওয়াইতে হইবে, বড় ছেলেমেয়েদেরও মুড়ি হোক, খই হোক কিছু খাইতে দিতে হইবে। সারাদিনের ভিতর মরিবার ফুরসৎ নাই, পোড়া শীতকালের বেলা দেখিতে দেখিতে গড়াইয়া যাইবে। তাহার পর এটা এখানে পড়িয়া ঘুমায়, সেটা ওখানে পড়িয়া ঘুমায়। সবগুলিকে টানিয়া তোল, ভাত খাওয়াও, আবার কাপড় ছাড়াইয়া, মুখ হাত পা ধোওয়াইয়া লইয়া গিয়া বিছানায় শোওয়াও। বুলু আর গুলু এখন কিছু কিছু সাহায্য করে এই যা রক্ষা।

মস্ত একটা মাটির কলসী, মুখটা তাহার ছেঁড়া কাপড় দিয়া ঠাশিয়া বন্ধ করা, না হইলে ভিতরের মুড়ি মিয়াইয়া যায়, খাইবার যোগ্য থাকে না। প্রিয়বালা ছেঁড়া কাপড়খানা টানিয়া বাহির করিয়া মস্ত বড় একটা ধামায় হড়্ হড়্ করিয়া বেশ অনেকগুলি

মুড়ি ঢালিয়া ফেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দিলেন, "ওরে আয়, মুড়ি লিয়ে যা।"

সিধু বাদে আর সব কজন ছেলে মেয়ে বেতের নানা রঙের ছোট ছোট ধামা হাতে দৌড়াইয়া আসিল। যাহার যেরকম খাইবার ক্ষমতা, প্রিয়বালা তাহাকে সেই আন্দাজে মুড়ি মাপিয়া দিতে লাগিলেন। সবাইকার আবার একরকম উপকরণ পছন্দ নয়, কেহ চায় গুড়, কেহ টাট্‌কা সরিষার তেল আর কাঁচা লঙ্কা, কেহ বা চায় একগোছা কচি পেঁয়াজ। যথাসাধ্য সকলের আবদার মিটাইয়া প্রিয়বালা আবার রান্নাঘরে ঢুকিলেন, এইবার দুধ জ্বাল দিতে হইবে। সৌভাগ্যক্রমে বাড়ীতে দুই-তিনটি গাই আছে, তাই কচিকাচা একটু গলা ভিজাইবার দুধ পায়, নচেৎ কিনিয়া আনিতে হইলে আর বাপের সাধ্যে কুলাইত না।

গরু দুহিয়া দিয়া যায় বুড়ী তারণের মা গোয়ালিনী, তাহাকে কিছু ধান পারিশ্রমিক স্বরূপ ধরিয়া দিতে হয়। যেদিন সে না আসিতে পারে সেদিন ভীমসেনাকৃতি তারণ ঘোষই আসিয়া কাজ উদ্ধার করিয়া দিয়া যায়।

বাহির হইতে বুড়ীর ভাঙা গলার চীৎকার শোনা গেল, "ওগো কে বাছুর ধরবেক্, এস গো।"

গুলু মুড়ির ধামি রাখিয়া উঠিয়া দৌড়াইয়া চলিল। বাছুর ধরাটা তাহারই নিত্যকর্ম্ম, বুলি যাইতে চায় না, 'টেঁপি, ক্ষেপী এখনও গোরুর ফোঁস-ফোঁসানিতে ভয় পায়। যাইবার সময় গুলু ভাইবোনদের শাসাইয়া গেল, "কেউ আমার ধামি থেকে এক মুঠো মুড়ি কি একটু গুড় লিয়েছিস্ কি, ফিরে এসে ঠ্যাং ভেঙ্গে দুব।"

ক্ষেপী তাহাকে মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, "দিবে বই কি ? ঠ্যাং মাগ্‌না, লয় ?"

গুলু তখন বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, কাজেই ঝগড়াটা তেমন জমিল না। প্রিয়বালা কলাইয়ের ডাল চড়াইয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ঘোষান্‌ বুড়ী বড় দেরী ক'রে দিলেক্‌ গা।" গুলুর মুড়ির উপর মাছি বসিতেছে দেখিয়া তিনি একখান তালপাখা দিয়া ধামিটা চাপা দিয়া দিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে আবার সিধু গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে দিনের বেলায় সাম্‌লানোর কাজটা বুলুর, কাজেই সে অত্যন্ত বিরক্ত মুখে মুড়ি রাখিয়া দিয়া ছোট ভাইকে দেখিতে চলিল। সিধু ভিজা কাঁথায় শুইয়া আকাশ ফাটাইয়া চীৎকার করিতেছে। এক হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আর এক হাতে কাঁথাখানা বাহিরের দাওয়ায় ফেলিয়া দিয়া, বুলু দুম্‌ দুম্‌ করিয়া পা ফেলিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। মায়ের দিকে সিধুকে অগ্রসর করিয়া ধরিয়া বলিল, "ল্যাও গো তোমার ছা, মুড়ি ক'টা খেয়ে লি।"

মা ছেলেকে কোলে গুঁজিয়া বালতির দুধ মাপিতে বসিয়া গেলেন। কোনদিন বেশী হয়, কোনদিন কম হয়। বেশী থাকিলে একটু দই, ক্ষীর করা যায়, কম হইলে ছেলেমেয়েদের খাইতে দিতেই কুলায় না।

মস্ত একটা কড়ায় করিয়া দুধ উনানের উপর বসাইয়া দেওয়া হইল। নিধু, বিধু, সিধু তিনজন আসল দুগ্ধপোষ্যের দলে, টেঁপী, ক্ষেপীও কিছু কিছু ভাগ পায়। তাহার পর গুলু, সে একে বেটা ছেলে, তাহার উপর বুলুর চেয়ে বয়সেও ছোট বটে, কাজেই বুলুর ভাগ্যে দুধটা বড় জোটে না। যে দিন দই বা ক্ষীর হয়, সেদিন অবশ্য সে ভাগ পায়।

ছেলেমেয়েদের মুড়ি খাওয়া চুকিয়া গেল। বিধু মুড়ি বড় একটা খাইতে পারে না, ধামায় করিয়া লইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া বেড়ায়। সে যথা-কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া এখন দুধের জন্য কাঁদিতে বসিল।

মৃগাঙ্কমোহন বাহির হইতে এই সময় ঘুরিয়া আসিলেন। ছেলের চ্যাচানিতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ট্যাঁ, ট্যাঁ, ট্যা, লেগেই আছে। ঘরে কাগ চিল বসবার জো নেই।"

প্রিয়বালা রান্নাঘরের ভিতর হইতে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ই আঁটকুড়ার ঘর লয়।" অর্থাৎ ছেলেপিলে থাকিলে তাহারা অবশ্যই চীৎকার করিবে, ইহা তাহাদের বিধিদত্ত অধিকার।

মৃগাঙ্ক আর কথা না বাড়াইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। গামছাখানা হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, "বুলু, গরম জল কই গো?"

বুলু একটা কেরোসিনের টীনে আধ টীন গরম জল সংগ্রহ করিয়া আনিল। জল অবশ্য প্রিয়বালাই গরম করিয়া দিয়াছেন। বকাবকি রোজই করেন, তবে জলটাও রোজই তিনি গরম করিয়া দেন। তাঁহার আর যে দোষই থাক, অলস তিনি নন। আর হাঁপানি বাধাইয়া মৃগাঙ্কমোহন শয্যা লইলে ভুগিবেন ত তিনিই, আর কেহ ভুগিতে অসিবে না।

পল্লীগ্রামে সকলেই শীত গ্রীষ্ম নির্ব্বিশেষে পুকুরে স্নান করে। নিতান্ত রোগী ভিন্ন ঘরে স্নান কেহই করে না। কিন্তু ইহারই মধ্যে মৃগাঙ্কমোহনকে রোগীর দলে ভর্ত্তি হইতে হইয়াছে। তাঁহার দিদিমার হাঁপানি ছিল বলিয়া শোনা যায়, এখন সেই রোগটি উড়িয়া আসিয়া নাতির স্কন্ধে জুড়িয়া বসিবার উপক্রম করিতেছে। অল্পেতেই তাঁহার সর্দ্দি লাগে, সর্দ্দি লাগিলেই কাশি, আর কাশি সুরু হইতে না হইতে

হাঁপানি। চিকিৎসা বিশেষ কিছু করানো হয় নাই, পাড়াগাঁয়ে তেমন ডাক্তারই বা কোথায়? আর ডাক্তারী চিকিৎসায় এ সনাতন রোগ সারিবে কেন? মৃগাঙ্কের দিদিমা কোন এক মহাপুরুষের নিকট একটি মাদুলি পাইয়া জীবনের শেষ কয়েকটা বৎসর একটু স্বস্তিতে ছিলেন। মৃগাঙ্কেরও ইচ্ছা সেই মাদুলি একটি জোগাড় করা, কিন্তু সময়াভাবে তিনি এখনও গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইতে পারেন নাই। যাতায়াতের খরচ জোগাড় করাও কঠিন। তরিতরকারী, ধান, দুধ কিছুই পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না বলিয়া, এখনও হাঁড়ি চড়ার ব্যাঘাত হয় না, না হইলে ত মাসের সাতটা দিন যাইতে যাইতেই নগদ পয়সা ঘরে একটিও থাকে না। যাহাই প্রয়োজন তাহা হয় ধান দিয়া কিনিতে হয়, নয় ধারে কিনিতে হয়। কিন্তু এ সকল ব্যবস্থা গ্রামের ভিতরেই চলে, গ্রামের বাহিরে চলে না। ধান অচেনা লোক কেহ লয় না এবং ধারও অজানা মানুষকে দিতে চাহে না।

উঠানের এক কোণে দরমার বেড়া আর টীনের সাহায্যে ছোট একখানি স্নানের ঘর তৈয়ারী হইয়াছে। কর্ত্তা এখন এখানেই স্নান করেন। খুব গরমের দিনে, খট্‌খটে রৌদ্র থাকিলে পুকুরে স্নান করিতে যান। আজন্ম যাহাদের পুকুরে স্নান করা অভ্যাস, তাহাদের এই তোলা জলে স্নান করিয়া একেবারে আরাম হয় না। কিন্তু রোগের ভয়ে মৃগাঙ্ককে এখন এই ব্যবস্থাটি মানিয়া লইতে হইয়াছে।

ইহার পর খাইয়া কর্ম্মস্থলে যাওয়া। এতটা হাঁটিতেও এখন ভাল লাগে না। দুই-একজন সাইকেলে যায়, কিন্তু বুড়া বয়সে ওসব অভ্যাস নূতন করিয়া অর্জ্জন করাও শক্ত। কাজেই একটু সকাল সকাল বাহির হইয়া, আস্তে আস্তে হাঁটিয়াই তাঁহাকে যাইতে হয়।

স্নান করিয়া মাথা মুছিতে মুছিতে মৃগাঙ্ক রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন, "ভাত দাও গো।"

প্রিয়বালা তাড়াতাড়ি বড় পিঁড়িখানা পাতিয়া ঠাঁই করিলেন, চুম্‌কি ঘটিতে এক ঘটি জল গড়াইয়া রাখিলেন। তাহার পর মস্ত বড় কানা-উঁচু কাঁসার থালায় ভাত বাড়িয়া দিলেন। ভাত, কলাইয়ের ডাল, আলু বেগুন ভাতে আর পোস্ত চচ্চড়ি। মাছ সব দিন জুটে না, অন্ততঃ এত সকালে আসে না।

মৃগাঙ্ক খাইতে খাইতে বলিলেন, "বেশ শীত প'ড়ে গেল।"

প্রিয়বালা সিধুকে কোলে করিয়া সামনে আসিয়া বসিয়া তাঁহার দুঃখের কাহিনী সুরু করিলেন। তাঁহার একখানা র‍্যাপার না লইলে চলে না, সকালে উঠিয়া শীতে হাত পা যেন পেটের ভিতর ঢুকিয়া যাইতে চায়। ছেলেমেয়েগুলারও গরম জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, এ বছর আর ওগুলাতে কাজ চলিবে না।

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "বুঝি ত সবই, কিন্তু পয়সা কোথা ?"

প্রিয়বালা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "মাইনা পেলেই মুঠা ক'রে কলকাতায় চালান দিবে ত পয়সা থাকবে কি ক'রে ?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "সেটা বানের জলে ভেসে আসে নাই ত, সেও সন্তান। তাকে খরচ দিতে হবেক্ নাই ?"

প্রিয়বালার তরকারি পুড়িয়া যাইতেছিল, তাই উত্তর না দিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উনানের কাছে চলিয়া গেলেন। বলিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়। সন্তান কি খালি সেই সতীনের বেটাই, আর প্রিয়বালার ছেলেমেয়েরাই কি বানের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে ? তবে এমন ভিন্ন ব্যবস্থা কেন ? তিনি বিবির মত চেয়ারে বসিয়া পাশের পড়া পড়িবেন, জুতা মোজা পরিয়া খট্‌খট্ করিয়া বেড়াইবেন, আর এগুলি

দারুণ শীতের দিনে বুকে হাঁটু দিয়া বেড়াইবে? কেন শুনি? অবস্থা মত ব্যবস্থা করিলেই ত হয়? ধাড়ী মেয়ে, বিবাহ দিলে এতদিনে ছেলের মা হইত! তাহার অত পড়ার সখ কেন? সে কি খ্রীষ্টানের মেয়ে না ব্রাহ্মের মেয়ে? তাহার মা ক'টা পাশ দিয়াছিল? যেমন অবস্থা তেমনই দেখিয়া বিবাহ দিয়া দিলেই ত আপদ্ ঘাড় হইতে নামিয়া যায়? মায়ের গহনা-গাঁটি আছে, মামার অবস্থা ভাল, সেও কিছু সাহায্য করে। তা প্রিয়বালা বলিবেন কাকে? ঘটে কি মানুষের বুদ্ধি কিছু আছে? মৃণালের কথা উঠিলেই তাহার দুই কান যেন কালা হইয়া যায়, কোনো কথাই আর শুনিতে পায় না।

মৃগাঙ্কমোহনের কালা সাজা ছাড়া উপায় কি? এ বিষয়ে প্রিয়বালার সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইলে এক দিনে শেষ হইবে না। মৃণালকে তিনি ক'টা টাকা দিয়াই পিতৃত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লইয়াছেন, সেই ক'টাতে তাহার চলে কিনা, সে খোঁজও তিনি করিতে যান না। বাদ বাকী যা লাগে, মৃণাল তাহা মামামামীর কাছেই চাহিয়া লয়। এটুকুও যদি না করেন, তাহা হইলে মৃগাঙ্ক-মোহন জনসমাজে মুখ দেখাইবেন কি করিয়া? প্রিয়বালার ত সে হতভাগী সম্বন্ধে কোনও কর্ত্তব্যের দায় নাই, তিনি চিৎকার করিয়াই খালাস।

সুতরাং রান্নাঘরে বসিয়া প্রিয়বালার অমন চোখাচোখা স্বগতোক্তি সব উপেক্ষা করিয়া তিনি ভাত খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া গেলেন। কাছারি যাইবার ফরসা জামা কাপড় দড়ির আল্‌নায় ঝুলান থাকে, তাহা পাড়িয়া বেশ করিয়া ঝাড়িয়া পরিধান করিলেন, এবং জীর্ণ ছাতাটি হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ছোট ছেলেমেয়ে গোটা

দুই তিন, খানিক পথ তাঁহার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে চলিল, তাঁহার পর ফিরিয়া গেল।

প্রিয়বালা রান্না শেষ করিয়া টেঁপী ক্ষেপীকে, আর ছোট ছেলে দুইটাকে লইয়া স্নান করিতে চলিলেন। এই ফাঁকে কাপড়-চোপড় কাঁথা প্রভৃতি যাহা কাচিবার তাহা কাচিয়াও আনিবেন। সময় খানিকটা যাইবে। এতক্ষণ বাড়ী খালি ফেলিয়া যাওয়া যায় না। কাজেই বুলু বাড়ী আগ্‌লাইয়া থাকে। মা ফিরিলে পর সে যায়।

সকালের স্নান খাওয়া সারিতে সারিতে একটা দেড়টা হইয়া যায়। তাহার পর দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া প্রিয়বালা একটু গড়াইয়া নেন। গড়াইতে গড়াইতে ঘুম আসিয়া যায়। রোদ দাওয়ার কোল হইতে নামিয়া গেলে একটু শীত শীত করে, তাহাতেই তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। ছেলেটাকে কাঁথা চাপা দিয়া উঠিয়া পড়েন। আবার বিকালের পাট সারিতে হইবে ত?

বিকালে রান্না বড় বেশী করিতে হয় না। ও বেলার ডাল তরকারি সবই থাকে, শুধু কোনও মতে এক হাঁড়ি ভাত নামাইয়া নেওয়া। নেহাৎ অবেলায় মাছ টাছ আসিয়া পড়িলে অন্য কথা। তাহা না হইলে শীত গ্রীষ্ম বারো মাস এই নিয়মেই প্রিয়বালার সংসার চলে।

৬

আবার বৎসর ঘুরিয়া পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। আর তিন-চার দিন পরেই স্কুল বন্ধ হইবে। মৃণালের এবার পরীক্ষার বৎসর, ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই টেষ্ট্ দিতে হইবে। এবার ছুটিতে সে বাড়ী যাইবে কি না তাহা এখনও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই।

পড়াশুনা অনেক বাকী, মামাবাড়ীতে ছেলেপিলের গোলমালে পড়িবার সুবিধা মোটেই হয় না। বাড়ীর ভিতর জায়গা এমন নাই যে সে নিরিবিলি বসিয়া পাঠচর্চ্চা করিবে। চিনি, টিনি আর কাছু ত দিদি বাড়ী গেলে তাহার আঁচল ছাড়িয়া এক দণ্ড নড়িতে চায় না, তাহাদিগকে মৃণাল ঠেকাইয়া রাখিবে কি করিয়া? বাড়ীর বাহিরে জায়গার অভাব নাই, কিন্তু পড়ায় মন বসে কই? পল্লীগ্রামের সুনীল উদার আকাশ, দিগন্ত-বিস্তৃত খোলা মাঠ, ঘন নীল গাছের সারি মৃণালের মনকে যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতে থাকে, হাতের বই কখন হাত হইতে খসিয়া কোলে লুটাইয়া পড়ে তাহা সে জানিতেও পারে না। এমনভাবে পড়া করিলে টেষ্টে তাহার উত্তীর্ণ হওয়া শক্ত। বয়স তাহার এমনিই সতেরো বৎসর হইতে চলিল, এখনও যদি ম্যাট্রিক্ দিতে না পারে ত কবে পারিবে? আর বাবাই বা আর কতদিন তাহাকে খরচ দিবেন তাহাই বা কে বলিতে পারে? হাঁপানির অসুখ বাড়িয়া তিনি ত ক্রমেই অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন। জমিদারী সেরেস্তার কাজটি যদি যায়, তাহা হইলে অতগুলি ছেলেমেয়ে লইয়া অর্দ্ধেকদিন তাঁহাকে না খাইয়া কাটাইতে হইবে, তখন কি আর তিনি মৃণালকে পড়াইবার টাকা দিতে পারিবেন? মামাবাবুর অবস্থা পাড়াগাঁয়ের হিসাবে সচ্ছল হইলেও এতটা নগদ টাকা তাঁহার নাই যে মাসে মাসে এতগুলি টাকা মৃণালকে পাঠাইতে পারেন। আর কেনই বা পাঠাইবেন? মৃণালের স্কুলে পড়া তাঁহারা মোটে পছন্দই করেন না, মামীমার ত ইহাতে ঘোর আপত্তি। মৃণাল এত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকায় পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে তাঁহাকে নানা রকম কথা শুনিতে হয়। এখন মধ্যে মধ্যে মৃগাঙ্কের কাছে তাঁহারা অনুরোধ করিয়া চিঠি লেখেন শীঘ্র শীঘ্র কন্যার বিবাহ দিবার জন্য। মল্লিক মহাশয়

যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। মৃণালের মায়েরও গহনাগাঁটি কিছু কিছু আছে। বেশী উঁচু নজর না করিয়া যেমন মানুষ তেমন জামাই দেখিয়া যদি দিতে রাজী থাকেন ত মৃণালের বিবাহ সহজেই হইয়া যায়। মেয়ে দেখিতে সুশ্রী, ঘরও ভাল। মৃগাঙ্ক হাঁ না কিছুই স্পষ্ট করিয়া বলেন না। এই অজানা পল্লীবাসী মানুষটির মনে মেয়েকে উচ্চশিক্ষিতা করিবার এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কেন যে আবির্ভাব ঘটিল তাহা কেহ ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। মোটের উপর বুঝা যায়, মৃণালের স্কুলে পড়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিবেন। মৃণাল ইহাতে খানিকটা আশ্বাস পায়, কিন্তু মামা-মামীর ভাব দেখিয়া তাহার মাঝে মাঝে ভয় হয় যে পাছে তাঁহারা মৃণালের বাবার অপেক্ষা না রাখিয়াই তাহার বিবাহ দিয়া দেন।

বোর্ডিঙের মেয়ে দুই-একটি ইহারই মধ্যে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুবিধামত সঙ্গী পাইলে দুই-চারদিন আগে চলিয়া যাওয়ার অনুমতি সহজেই মিলে। মৃণালেরও এক দূর সম্পর্কের মেসোমহাশয় দুইদিন পরে তাহার মামার বাড়ীর গ্রামে যাইতেছেন। মৃণাল ইচ্ছা করিলেই তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারে। কিন্তু যাইবে কি? একটা মাস একেবারেই কি নষ্ট হইবে না? যাওয়া কি তাহার উচিত? কিন্তু যাইতে না পারিলেও প্রাণ তাহার একেবারে অস্থির হইয়া উঠিবে। নির্জ্জন সঙ্গীহীন বোর্ডিঙে দিন তার কাটিবে কেমন করিয়া? তাহার ক্লাসের মেয়েরা প্রায় সকলেই চলিয়া যাইবে।

বিকাল হইয়া আসিয়াছে। আজ শনিবার, স্কুল মাত্র তিনঘণ্টা হয়, অনেক আগেই ছুটি হইয়া গিয়াছে। চুল বাঁধিয়া, কাপড় বদলাইয়া, মৃণাল বোর্ডিঙের 'লন' এ বেড়াইতে যাইতেছে, এমন সময় মাঝপথে দারোয়ান আসিয়া একখানা শ্লেট তাহার চোখের সম্মুখে উঁচু করিয়া

ধরিল। তাহার সেই মেসোমহাশয় তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। মৃণাল আবার ঘুরিয়া স্কুল বাড়ীর দিকে চলিল।

ছোট্ট একখানি ঘর, মাঝে একটা চৌকা টেবিল, তিন দিকে তিনখানা চেয়ার। ইহার বেশী আস্‌বাব এ ঘরে ধরে না। মৃণাল ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আপনার পরশু যাওয়াই ঠিক নাকি মেসোমহাশয় ?"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "হ্যাঁ। তুমি যাবে নাকি জানতে এলাম।"

মৃণাল আর কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, "হ্যাঁ যাব।" বলিয়াই তাহার নিজেরই অবাক্ লাগিয়া গেল। এক মিনিট আগে পর্য্যন্ত তাহার মন যাওয়া না-যাওয়ার মধ্যে দোলা খাইতেছিল। যাক্, মুখ দিয়া কথাটা যখন বাহির হইয়াই গিয়াছে তখন যাওয়াই ঠিক।

তাহার মেসোমহাশয় বলিলেন, "তাহলে সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে তৈরি থেকো, আমি একেবারে গাড়ী নিয়ে আসব। পার ত কিছু খেয়ে নিও, পৌছতে সেই ত বেলা গড়িয়ে যাবে ?"

মৃণাল বলিল, "আচ্ছা, যদি খেতে পাই ত খেয়েই নেব, না হলেও ভাবনা নেই, তিনটের সময় বাড়ী গিয়েই খাওয়া যাবে।"

তাহার মেসোমহাশয় চলিয়া গেলে মৃণাল আবার সঙ্গিনীদেরমধ্যে গিয়া জুটিল। প্রমীলাকে বলিল, "বাড়ী যাওয়াই ঠিক ক'রে এলাম রে।"

প্রমীলা বলিল, "বেশ করেছিস্। একমাস ধ'রে মামীর আদর হাঁ ক'রে গিলে, টেষ্টে গোল্লা পাস এখন।"

মৃণাল বলিল, "না, এবার পড়াশুনো একটু একটু করতে চেষ্টা করব।"

মাঝের দিন দুইটা যেন কাটিতেই চায় না। মৃণাল পারিলে ঘণ্টাগুলিকে ঠেলা মারিয়া পার করিয়া দেয়। সুখের ক্ষণগুলি যেন হাওয়ায় উড়িয়া চলে, আর অন্য সময় তাহাদের গতি কি একেবারেই লুপ্ত

হইয়া যায়? ক্রমাগত ঘড়ি দেখিতে দেখিতে মৃণালের চোখ যেন টাটাইতে থাকে।

যাইবার আগের দিনটায় তবু জিনিষপত্র গুছাইবার কাজে সময়টা কিছু তাড়াতাড়ি কাটিল। রাত্রে বোর্ডিঙের মেট্রনের কাছে গিয়া মৃণাল বলিল, "মাসীমা, কাল সকালের ট্রেনে আমি যাচ্ছি, ভাত তখন হবে কি?"

মাসীমা বলিলেন, "আলুভাতে ভাত হবে আর কি? অত সকালে ত আর মাছ মাংস হতে পারে না?"

আলুভাতে ভাত পাইলেই ঢের হয়। মাছ মাংস যে জুটিবে না, তাহা মৃণালের জানিতে বাকী নাই। ইহা ত আর তাহার মামার বাড়ী নয় যে যাত্রার আগে তাহাকে মাছভাত খাওয়াইবার জন্য সকাল হইতে সকলে উঠিয়া ছুটাছুটি করিতে থাকিবে?

বাক্সটা গুছাইয়া রাখিয়া সে শুইতে চলিয়া গেল। বিছানা সকালে উঠিয়া বাঁধিলেই চলিবে। আর ত বিশেষ কিছু তাহার গুছাইবার নাই?

সকালে উঠিয়া প্রথমেই সে স্নান করিয়া ফেলিল। তাহার পর বাকী জিনিষপত্র বিছানার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া বিছানাটাও বাঁধিয়া ফেলিল। ভিজা চুল বাঁধিলে তাহার মাথা ধরে, তাই আজ মৃণাল চুল না ভিজাইয়াই স্নান করিয়াছে। সারাপথ ত এতখানি চুল ঝুলাইয়া যাওয়া যায় না? কাপড়-চোপড় পরিয়া একেবারে প্রস্তুত হইয়া সে খাইতে গেল।

মেট্রন বলিয়াছিলেন, শুধু আলুভাতে ভাত খাইতে পাইবে, কিন্তু সে একবাটি ডাল এবং দইও তাহার সঙ্গে পাইল। বোর্ডিঙের এই মাসীমাটি স্বভাবে অতিশয় রুক্ষ, কিন্তু অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত একটি গুপ্ত

স্নেহের স্রোত যে তাঁহার মধ্যেও প্রবাহিত,তাহার পরিচয় মেয়েরা যখন তখন পাইয়া থাকে।

খাইয়া উঠিয়া বার দুই-চার ঘড়ি দেখিবার পরেই মৃণালের মেসোমহাশয় গাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্কুলের অধ্যক্ষ ও সঙ্গিনীদের কাছে বিদায় লইয়া মৃণাল তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। দারোয়ান তাহার বাক্স বিছানা গাড়ীর ছাদে তুলিয়া দিল।

কলিকাতার রাস্তার দিকে তাকাইলে মন ভরিয়া উঠে না, কিন্তু না তাকাইয়াও মৃণাল থাকিতে পারে না। ইহার কেমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। এত বিচিত্র লোকের মেলা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কি? ষ্টেশনেও দেখা যায়, সেই ভীড়, সেই কোলাহল, সেই প্রচণ্ড ব্যস্ততা। পৃথিবীতে এত মানুষ যে আছে, কলিকাতায় অসিবার আগে মৃণালের তাহা ধারণাই ছিল না।

ষ্টেশনে সেদিন যেন মানুষের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। কি তার কলরব, কি তার তুমুল আস্ফালন। মৃণালের ভয় করিতে লাগিল। এই ভীষণ ঘূর্ণির মধ্যে সে একেবারে তলাইয়া যাইবে না ত?

মেসোমহাশয় মুটের মাথায় জিনিষপত্র চাপাইয়া বলিলেন, "সাবধানে আমার পিছন পিছন এস। যা ভয়ানক ভীড় হয়েছে, আজ গাড়ীতে জায়গা পেলে হয়। ভাগ্যে কাল টিকেটটা ক'রে রেখেছিলাম।"

মৃণাল অসংখ্য মানুষের গুঁতা খাইতে খাইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে মেসোমহাশয়ের সঙ্গে চলে, মাঝে মাঝে পিছাইয়া পড়ে। তখন ভয়ে তাহার বুকের ভিতরটা গুর্‌গুর্‌ করিয়া উঠে। আর যদি উহাদের সঙ্গ না ধরিতে পারে? তখনই আবার দূরে জনসমুদ্রের মাথার উপর ভাসিয়া উঠে মুটের মাথায় তাহার নীল ডোরা কাটা ট্রাঙ্কের মূর্তি, মেসোমহাশয়ের কাঁচ-পাকা মাথাটাও

কাছাকাছিই দেখা যায়। খানিক নিজের চেষ্টায়, খানিক পিছনের জন-স্রোতের ঠেলায় মৃণাল অগ্রসর হইয়া যায়। লোহার গেটটা পার হইয়া, প্ল্যাটফর্ম্মের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া তবে মৃণাল যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। এখানে এতটা মারামারি ঠেলাঠেলি নাই।

মেসোমহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, "আমার সঙ্গেই উঠবে, না মেয়েদের গাড়ীতে যাবে?"

মেয়েদের গাড়ীই ভাল। পুরুষ যাত্রীদের সঙ্গে যাইতে হইলে মৃণালের অস্বস্তির সীমা থাকে না। একে ত একপাল অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টির সম্মুখে ততক্ষণ বসিয়া থাকিতেই তাহার দেহমন যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠে। জলটুকু খাইতে শুদ্ধ তাহার সঙ্কোচ লাগে, একটু পা বদ্‌লাইয়া বসিতে পর্য্যন্ত লজ্জা করিতে থাকে। গাড়ীতে উৎপাতেরও অন্ত নাই, তামাক খাওয়া, সিগারেট খাওয়া লাগিয়াই থাকে, গন্ধে মৃণালের মাথা ধরিয়া উঠে। তাহার উপর ক্যান্‌ভাসারের উপদ্রব, ভিখারীর উৎপাত, ইহার হাত হইতেও নিষ্কৃতি নাই। ভীড়ও এই গাড়ীগুলিতেই হয় বেশী। আজকাল কিসের ভয়ে জানি না, কোনো মেয়েই প্রায় মেয়ে গাড়ীতে উঠিতে চায় না। আণ্ডাবাচ্চা, পোঁট্‌লা-পুঁটুলি লইয়া সেই পুরুষদের গাড়ীতেই ভীড় করে, মেয়েদের গাড়ী অপেক্ষাকৃত ফাঁকাই থাকিয়া যায়। কাজেই সেখানেই যাওয়া সুবিধা।

মেসোমহাশয় বলিলেন, "দেখ, ভয়টয় করবে না ত?"

মৃণাল বলিল, "দিনের বেলা আবার ভয় কিসের? আর সে গাড়ীতেও ত লোক থাকবে?"

মেসোমহাশয় তাহাকে লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন। মেয়েদের গাড়ী একেবারে যে খালি তাহা নয়, তবে এখনও বোঝাই হইয়া উঠে নাই। জিনিষপত্র লইয়া মৃণাল তাহারই মধ্যে উঠিয়া পড়িল। একটি

বেঞ্চ জুড়িয়া একটি ফিরিঙ্গী ললনা চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন, অন্ত যাত্রীদের দিকে দৃক্‌পাতও করিতেছেন না, তাহা হইলে অসুবিধা হইতে পারে। আর একটি বেঞ্চে দুইটি উৎকলবাসিনী বসিয়া কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের দিকে তাকাইয়া আছে। মৃণাল উঠিয়া মাঝের বেঞ্চে গিয়া বসিয়া পড়িল, জিনিষগুলি বেঞ্চের তলায় ঢুকাইয়া রাখিল।

গাড়ী ছাড়িতে তখনও বেশ কিছু দেরি। বসিয়া বসিয়া জনস্রোত দেখা ছাড়া কাজ নাই। বিরাট দানবাকৃতি ব্যাপার এই হাওড়া ষ্টেশনটা। লোকের যেন সমুদ্র, কত পথে তাহারা আসিতেছে, যাই-তেছে, প্ল্যাটফর্ম্মেরও শেষ নাই, ট্রেনেরও শেষ নাই। আর এখানেই যেন একটা বাজার বসিয়া গিয়াছে। ইচ্ছা করিলে কি না এখানে পাওয়া যায়? খাইবার, পরিবার, পড়িবার, সাজিবার যাহা চাও তাহাই পাইবে, যদি পয়সা খরচ করিতে রাজী থাক। যাবতীয় রোগের ঔষধও এইখানে মেলে, যদি ক্যান্‌ভাসারগুলির কথা বিশ্বাস করিতে হয়।

যাক্‌, কোনোও মতে আধটা ঘণ্টা কাটিয়া গেল। এইবার ঘণ্টা পড়িল, ট্রেন ছাড়িবে। এখনও যাত্রীর ছুটাছুটি হুড়াহুড়ির বিরাম নাই, সৌভাগ্যক্রমে মৃণালদের গাড়ীতে আর কেহ উঠিল না। কতবার সারিসারি মেয়ে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে দেখা গেল, সঙ্গে আণ্ডাবাচ্চা, বোঁচ্‌কাবুঁচ্‌কি, কিন্তু ঢুকিবার বেলা তাহারা সেই পুরুষদের গাড়ীতেই ঢোকে, এদিকে আসে না।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তাহার বেঞ্চে সে একলা, সুতরাং জুতা খুলিয়া মৃণাল পা উঠাইয়া আরাম করিয়া বসিল। এখন একখানা মাসিক পত্র বা বাংলা উপন্যাস পাইলে সময়টা আরামেই কাটিত, কিন্তু

মৃণাল পাঠ্য বই ছাড়া অপাঠ্য কিছুই সঙ্গে আনে নাই। সঙ্গিনী তিনটিও গল্প করিতে নিশ্চয়ই চাহিবে না। মেম সাহেবের সঙ্গে কথা বলিতে মৃণালের কোনো উৎসাহ বোধ হইল না। আর উড়িষ্যা-বাসিনীরা বাংলা হয়ত বুঝিতে পারিবে না। তাহারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলিতে এবং পান দোক্তা খাইতেই ব্যস্ত।

হাওড়া ছাড়াইয়া গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে সবুজ টোপা পানায় ঢাকা পুকুর, বাঁশঝাড়, ভাঙাচোরা খড়ের ঘর। মাঝে মাঝে আবার শহরের জয়ধ্বজা তুলিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলের চিম্‌নি আকাশে মাথা উঁচাইয়া আছে, পাশে তাহাদের বড় বড় টিনের ছাউনি। শহর বা পল্লী, কোনোটারই সৌন্দর্য্য এ জায়গাগুলির মধ্যে নাই। কেমন যেন নিরানন্দ, ম্লান, শ্রীহীন মূর্ত্তি, দেখিলেই মনের ভিতরটা মুষড়াইয়া যায়। খানিক পরে পরে এক-একটা পানের বরজ চোখে পড়ে। ছোট ছোট ষ্টেশনগুলি, বেশ পুতুল খেলার ঘরের মত সুন্দর পরিপাটি, হাওড়ার আসুরিক আকৃতির পাশে বাস্তবিকই এগুলিকে খেলার ষ্টেশনই মনে হয়। বেশীর ভাগ জায়গায়ই ট্রেন দাঁড়ায় না, আবার এক আধটায় দাঁড়ায়ও। যাত্রীরা সব চীৎকার করিয়া ডাবওয়ালাকে ডাকে, এসব জায়গায় ডাব খুব সস্তা। মৃণালও দুই পয়সা দিয়া বড় একটা ডাব কিনিয়া খাইল।

গাড়ী আবার অগ্রসর হইয়া চলে। এইবার চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য ক্রমেই মনোরম হইয়া আসিতেছে। আর বাঁশঝাড়, পানাপুকুর নাই, মাটির চেহারাও আর পঙ্কিল নয়। দিগন্তবিস্তৃত ধানের ক্ষেত, কাশবন, ছোট বড় নদী, তাহার জল স্বচ্ছ নির্ম্মল। মাঠে মাঠে গোরু মহিষ চরিতেছে, সঙ্গে রাখাল আছে না-আছে চোখে পড়ে না।

শুধু শুধু বসিয়া মৃণালের চোখ ঢুলিয়া আসিতে লাগিল। পা ছড়াইয়া সে বেঞ্চের উপরেই শুইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া পড়িল সে অবিলম্বেই, কিন্তু ঘুমটা তাহার খুব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে চকিত হইয়া সে উঠিয়া বসিল। আর কিছুই নয়, গাড়ী রূপনারায়ণের ব্রিজ পার হইতেছে!

কোলাঘাটে ট্রেন পৌছিলেই মৃণালের মন খুসী হইয়া উঠে। সে যেন এইবার বাড়ীর গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এই স্থানটার উপর রাক্ষসী রাজধানীর কোনও অধিকার নাই।

ষ্টেশনের প্ল্যাট্ফর্ম্মের উপর কয়েকটা জেলে ছুটাছুটি করিতেছে বড় বড় সদ্যধরা ইলিশমাছ লইয়া। পাড়াগাঁয়ে সদা সর্ব্বদা এ সব মাছ পাওয়া যায় না। মামীমা দেখিলে অত্যন্ত খুসী হইবেন, চিনি, টিনিও খুসী হইবে মনে করিয়া মৃণাল আট আনা পয়সা খরচ করিয়া একটা মাঝারি গোছের মাছ কিনিয়া লইল। তাহার হাতে পয়সাকড়ি বিশেষ থাকে না, না হইলে দুইটা লইতে পারিত।

আবার ট্রেন ছুটিয়া চলে। খানিক বাদে প্রকাণ্ড এক জংশন, এখানে গাড়ী প্রায় অর্ধঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকে। উৎকল-বাসিনী দুটি এখানে নামিয়া গেল, তাহাদের স্থানে আসিয়া বসিল একটি বাঙালী বধূ। সঙ্গে তাহার একটি শিশু কন্যা ও একটি ঝি। তরুণীটি কোনো কারণে অতিশয় চটিয়া আছে। সঙ্গের লোকদের এবং শিশুকন্যাকেও মাঝে মাঝে তাহার মেজাজের ঝাঁজ সহ্য করিতে হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া মৃণাল তাহার সঙ্গে ভাব করিবার কোন চেষ্টা করিল না।

গাড়ী ক্রমে মেদিনীপুর ছাড়াইয়া গেল। এইবার রাঢ়ের রাঙা মাটি আর রুক্ষ কঠিন পার্ব্বত্য শ্রী চোখে পড়িতে আরম্ভ করে। ঝোপঝাপ কমিয়া আসিতেছে, তাহার স্থান অধিকার করিতেছে শালবন।

পাহাড়ের অস্পষ্ট আভাস দিগন্তের কোলে ফুটিয়া উঠিতেছে। মৃণালকে যেন উহা হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে, আগ বাড়াইয়া লইবার জন্য যেন ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

এখান হইতে মৃণাল খালি মিনিট গুণিতে আরম্ভ করে। আর চার পাচটা ষ্টেশন, তার পরেই মামার বাড়ীর গ্রাম। ঘর বলিতে আজ পর্য্যন্ত মৃণাল এই গ্রামটিকেই জানিয়াছে, বাপের বাড়ীর দেশের সঙ্গে তাহার মনের কোনোই সম্পর্ক নাই, চোখেও সে উহা একবার মাত্র দেখিয়াছে।

সূর্য্য মাঝ আকাশ ছাড়িয়া ক্রমে পশ্চিমে হেলিয়া পড়িতেছে। খোলা জানলার পথে এক ঝলক রোদ আসিয়া মৃণালের মাথার উপর ছড়াইয়া পড়িল। সে একটু সরিয়া বসিল।

মাঝের ষ্টেশনগুলা একটা একটা করিয়া পার হইয়া গেল। ইহার পরেই তাহাকে নামিতে হইবে। সে চুল ঠিক করিয়া, পায়ে জুতা দিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। কয়েক মিনিট পরেই গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া থামিয়া গেল। মামাবাবু তাহাকে লইতে আসিয়াছেন।

৭

গোরুর গাড়ী চড়িয়া ষ্টেশন হইতে বাড়ী পৌছিতে আধ ঘণ্টা পার হইয়া যায়। মৃণালকে হাঁটিয়া যাইতে দিলে সে পনেরো মিনিটে এ পথটুকু অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু হাঁটিয়া যাওয়া মামামামী পছন্দ করেন না। গ্রামের বাজারটা মাঝে পড়ে, সেখানে নানারকম লোক থাকে; তাহাদের চোখের উপর দিয়া অতবড় মেয়ে নাই বা হাঁটিয়া গেল? এমনিতেই কত কথা উঠে।

বাজার পার হইয়া রাস্তাটা খানিক নামিয়া গিয়াছে, মাঝে একটি ছোট নদী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কল্যাণে তাহার উপর একটি সাঁকোও আছে। গোরুর গাড়ী হুড় হুড় করিয়া নামিয়া গিয়া সেই সাঁকোর মুখে থামিল। গ্রামের এক দল মেয়ে জল ভরিতে আর কাপড় কাচিতে আসিয়াছে, তাহারা কৌতূহল-বিস্ফারিত নেত্রে গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। কে আছে ছইয়ের ভিতরে তাহা ভাল করিয়া বুঝা যায় না, আবার না জানিলেও এই সব সরল গ্রাম্য ললনাদের খেদের সীমা থাকে না। কয়েকজন ত জল ছাড়িয়া উঠিয়াই আসিল, সন্দেহভঞ্জন করিবার জন্য। মৃণাল হাসিয়া মুখ বাহির করিয়া বলিল, "আরে, আমি রে আমি।"

মেয়েদের ভিতরে অগ্রবর্ত্তিনী হাসিয়া বলিল, "মল্লিক বাবুদের বিটী বটে গো।" তাহারা সব কয়জন আবার ঘাটে নামিয়া গিয়া মহোৎসাহে কাপড় কাচিতে আরম্ভ করিল।

মাঠ, নদী, বন, সব যেন মৃণালকে হাসিয়া অভ্যর্থনা করিতেছে। নদীর কুল্ কুল্ শব্দটিও যেন আনন্দের রাগিণী। রাস্তার দুই ধারের বড় বড় শাদা পাথরের ঢিপিগুলি যেন উজ্জ্বল নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। ইহারা যে মৃণালের আজন্মকালের বন্ধু; ইহাদের ভুলিয়া কি সে কখনও কলিকাতার নির্ম্মম কারাগৃহে পড়িয়া থাকিতে পারে?

গোরুর গাড়ী প্রায় বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। দূর হইতে দেখা যায় মামীমা বাহিরের দাওয়ার উপর ছোট খোকাটাকে কোলে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। চিনি আর টিনি বাতাসে ঝাঁকড়া চুল উড়াইয়া, পায়ের মল বাজাইয়া প্রাণপণে দৌড়াইয়া আসিতেছে। গাড়ী থামিবার আগেই তাহারা ছোট খাট ঘূর্ণিবায়ুর

মত আসিয়া গাড়ীর উপর আছড়াইয়া পড়িল। "আরে থাম্ থাম্, প'ড়ে যাবি গাড়ীর তলায়।"

কে বা কাহার কথা শোনে?

মৃণাল গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। গাড়োয়ান আর মামাবাবু জিনিষপত্রগুলির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। চিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "মা, দিদি এসেছে গো!" মা যেন তাহা দেখিতে পান নাই, চিনির বলার অপেক্ষাতেই ছিলেন।

টিনি ঢোক গিলিয়া বলিল, "মস্ত বড় মাছ এনেছে গো, এত্ত বড়।"

মামীমা বলিলেন, "মাছটা দে'খেই তুই বেশী খুশী হয়েছিস্, না?"

টিনি একথার কোনও প্রতিবাদ না করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। খাইতে পাইলে খুশী আবার জগতে কে না হয়? ইহা কি আবার একটা জিজ্ঞাসা করিবার কথা? চিনি জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, এবার বিলাতি মিঠাই আন নি?"

মৃণাল মামীমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "এনেছি গো এনেছি, সব এনেছি। মামীমা, খোকাটা যে মস্ত হয়ে উঠল?"

মামীমা হাসিয়া বলিলেন, "বড় হবার বয়স হ'লেই বড় হয়, বাছা। চল্ ঘরের ভিতরে, হাত মুখ ধুবি, কাপড় ছাড়বি। কিছু খেয়ে এসেছিস, না সারা পথ শুকিয়ে এলি?"

মৃণাল বলিল, "সকালে দু-গ্রাস ভাত খেয়েছি বটে, কিন্তু আসতে আসতে আবার খিদে পেয়ে গেছে।"

মামীমা বলিলেন, "তা ত পাবেই, সেই সাত সকালে খাওয়া, তাতে কি আর সারা দিন যায়? আমি তোর জন্যে ভাতে জল দিয়ে রেখেছি, তুই হাত মুখ ধুয়ে আয়।"

মৃণাল বাক্স খুলিয়া প্রথম চিনি-টিনিদের ফরমাসী লজেন্স চকোলেট বাহির করিয়া দিল, তাহার পর হাত-মুখ ধুইয়া ট্রেনের কাপড় বদলাইয়া রান্নাঘরে খাইতে চলিল। মামীমা ক্ষুদকুঁড়ো যা খাইতে দেন, তাহাই মৃণালের মুখে অমৃতের মত লাগে। অথচ কলিকাতার বোর্ডিঙে কত রকম উপকরণ দিয়া তাহারা রোজ খায়, তাহাদের পেট ভরে ত মন ভরে না কেন?

মামীমা আজকের দিনটাই মাছ একেবারে পান নাই, শুধু পোস্ত চচ্চড়ি, কুমড়োর ঝাল আর ডাল দিয়া ভাগ্নীকে ভাত বাড়িয়া দিলেন! বলিলেন, "না খেয়ে এত পথ এসেছিস, এই খা। আর ত দেরি করা চলে না? না হলে দুখানা মাছ ভেজে দিতাম।"

মৃণাল বলিল, "রাত্রে সকলের সঙ্গে খাব এখন, অত তাড়া কিসের? এখন এইতে বেশ হবে।"

খাওয়া চুকিলে পর মৃণাল নিজের জিনিষপত্র শুইবার বড় ঘরের এক কোণে গুছাইয়া রাখিল। বিছানা খুলিয়া চিনি-টিনির খাটের উপর এক পাশে পাতিয়া রাখিল। এখানে আসিলে বরাবরই সে ইহাদের সঙ্গে শোয়। পড়ার বইগুলি কোথায় রাখিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। এই-সব ক্ষুদ্র দস্যুদের হাতে পড়িলে ত আর তাহাদের আয়ু বেশীক্ষণ থাকিবে না? ছবি দেখার ছুতায় তাহারা প্রত্যেকটি পাতা আলগা করিয়া রাখিবে।

মামীমা বলিলেন, "কি এত ভাবছিস বাক্স সামনে নিয়ে?"

মৃণাল বলিল, "এগুলি কোথায় রাখি বল ত মামীমা, সব আমার পড়বার বই।"

মামীমা বলিলেন, "ওঁর ঘরের তাকের একেবারে মাথায় তুলে রাখ, না হ'লে এ দস্যিরা একেবারে সব শেষ ক'রে রাখবে।"

মৃণাল বই-খাতার রাশ তুলিয়া লইয়া মল্লিক-মহাশয়ের ঘরে চলিল। দেওয়ালের গায়ে বসানো তাক, তাহার সর্ব্বোচ থাকটি এত উঁচু যে মৃণালও সহজে নাগাল পায় না। একটা টুল জোগাড় করিয়া আনিয়া, সে কোনও মতে জিনিষগুলি তুলিয়া রাখিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। আজকার দিনটা মৃণাল নিজেকে ছুটি দিবে স্থিরই করিয়া আসিয়াছিল। সে মামীমার হাত হইতে তাড়াতাড়ি লণ্ঠনগুলি কাড়িয়া লইয়া মুছিতে বসিয়া গেল। তাহার পর মাছ কুটিল, সরিষা বাঁটিয়া দিল, দুষ্ট খোকাকে অনেকক্ষণ সামলাইয়া রাখিল। কলিকাতায় শীতের লেশমাত্র নাই, এখানে সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল। টিনি-চিনির তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই, তাহারা ডুরে শাড়ীর আঁচল গায়ে জড়াইয়াই নিশ্চিন্ত। মৃণাল কিন্তু গায়ে একটা গরম জামা না দিয়া থাকিতে পারিল না। মামীমাও শীতকে গ্রাহ্য করেন না, জামা কোনও সময়েই গায়ে দেন না, দারুণ শীতেও একখানা মোটা কাঁথা মুড়ি দিলেই তাঁহার চলিয়া যায়।

রাত্রে খাইতে বসিয়া মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "মিনুর কল্যাণে আজ খাওয়াটা ভালই হ'ল।"

চিনি জিজ্ঞাসা করিল, "আর একটা মাছ আনলে না কেন? তা হ'লে কাল আমরা চচ্চড়ি ক'রে খেতাম, টক ক'রে খেতাম?"

তাহার মা বলিলেন, "হ্যাঁ, মাছ সব তোমার শ্বশুরের কিনা, তাই যত চাইবে তত বিনি পয়সায় দিয়ে দেবে।"

খাওয়া চুকিয়া গেলেই এখানে আর কোনও কাজ থাকে না। ছোটর দল হাত পা ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া বিছানায় গিয়া চট্‌পট্ ঢুকিয়া পড়িল। মৃণাল খানিকক্ষণ মামীমার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরের কাজ

সারিতে লাগিল, কিন্তু মামীমা খানিক পরেই জোর করিয়া তাহাকে শুইতে পাঠাইয়া দিলেন।

যতবারই ছুটিতে বাড়ী আসে, প্রথম রাতটা আনন্দেই বোধ হয় মৃণালের ঘুম হয় না। আবার ফিরিয়া কলিকাতায় যাইবার আগের রাতটাও না ঘুমাইয়া কাটে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। আজও তাই ভাল করিয়া সে ঘুমাইতে পারিল না। চিনি আর টিনিও জাগিয়া থাকিতে তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিল, তাহাদের গুঁতাগুঁতি, মারামারি এবং অবিশ্রাম নালিশ প্রায় রাত বারোটা অবধি চলিল, তাহার পর মায়ের হাতের গোটা-দুই চড় খাইয়া তবে ঠাণ্ডা হইল।

শীতের দিন, ভোর বেলাটা অন্ধকার হইয়া থাকে, কুয়াসা কাটে না অনেক বেলা পর্য্যন্ত। কিন্তু মৃণালের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, খানিক এ-পাশ ও-পাশ করিয়া সে উঠিয়া বসে। চিনি-টিনি এখন কুণ্ডলী পাকাইয়া পরস্পরের গায়ে মাথা গুঁজিয়া ঘুমাইয়া আছে। মুখ দুটি দেখিলে মনে হয় একেবারে দেবশিশুর মুখ, কোনও রকম দুষ্টামির চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। অথচ চোখ চাহিবামাত্র কোথা হইতে যে দুষ্ট সরস্বতী ইহাদের স্কন্ধে আসিয়া ভর করেন, তাহা মৃণাল ভাবিয়াই পায় না।

মামীমা ভোর থাকিতেই উঠেন, না হইলে তাঁহার কাজকর্ম্মের সুবিধা হয় না। নামে মাত্র একটি ঝি আছে, সে কাজ যথাসম্ভব কমই করে, বেশীর ভাগ কাজ তাঁহাকে এক হাতেই সারিতে হয়। মৃণালও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িল।

অন্যান্য বার সে বাড়ী আসিলে সারাক্ষণ মামীমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, যথাসাধ্য তাঁহার কাজে সাহায্য করে। এবার কিন্তু ঠিক করিয়া আসিয়াছে, পড়াশুনায়ই সে বেশীর ভাগ সময় দিবে, ঘরের কাজের

দিকে বেশী ভিড়িবে না। মামীমা জানেন, ইহা তাহার পরীক্ষার বৎসর। তিনি নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু মনে করিবেন না।

সে মুখ-হাত ধুইয়া মামাবাবুর ঘরে ঢুকিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। এখন বাড়ী একেবারে নীরব, যেন নিশুতি রাত, হাট বসাইবার লোকগুলি এখনও জাগে নাই কিনা? ঘণ্টা-দুই মৃণাল এখন নিরুপদ্রবে পড়িতে পারিবে। উঠানের ওধার হইতে মাঝে মাঝে ঘটি বাটির টুংটাং শব্দ আসিতেছে। রাধী বাসন গুছাইতেছে, এখনই পুকুর-ঘাটে লইয়া যাইবে। আর দূরে গোয়ালে গোরুবাছুরের সাড়াও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। মামীমা উনান ধরাইতেছেন, ধোঁয়ার ঝাঁজ ঘরে বসিয়াই অনুভব করা যাইতেছে।

মৃণাল জানালাটা খুলিয়া দিয়া তাহার সামনে পড়িতে বসিয়াছে। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় গোয়ালঘর, খিড়কি-পুকুরের ঘাট, তরিতরকারির বাগানের খানিক খানিক দেখা যায়, এখনও সব কিছু কুয়াসার ঘোমটায় মুখ অর্দ্ধেক ঢাকিয়া রাখিয়াছে। শিরশির করিয়া শীতের বাতাস বহিতেছে, মৃণাল গায়ের র‍্যাপারটা আরও ভাল করিয়া গায়ে জড়াইতেছে। মন যত সে বইয়ের পাতায় নিবদ্ধ করিতে চায় চোখ ততই তাহার বাহিরের মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ডুবিয়া যায়। তাহাদের পোষা হাঁসগুলি গা ঝাড়া দিতে দিতে পুকুরের পারে ইহারই মধ্যে প্রাতরাশের সন্ধানে বাহির হইয়াছে, তাহাদের কলরব ঘরে বসিয়াই বেশ শোনা যায়। গোয়ালে মংলী গাইয়ের নূতন বাছুরটা গলা ছাড়িয়া ডাকিতেছে, তাহার বোধ হয় আর বন্দী হইয়া থাকিতে ভাল লাগে না। মৃণালের ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া সেটাকে একটু আদর করিয়া আসে। কি সুন্দর উহার চোখ দুটি! এমন নিষ্পাপ দৃষ্টি আর কোনও জীবের আছে কি? কবিরা হরিণশিশুর পিছনে ত কম সময় নষ্ট করেন না,

কিন্তু ইহাদের প্রতি এত অবজ্ঞা কেন? মৃণাল কবিতা লিখিতে জানিলে এই বাছুরটার নামে গোটা দশ-বারো কবিতা লিখিয়া ফেলিত বোধ হয়।

কিন্তু এই রকম করিলেই তাহার পরীক্ষার পড়া হইয়াছে আর কি? মৃণাল তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া জোর করিয়া পড়ায় মন ডুবাইয়া দিল। ঘণ্টা দেড়েক সত্যই সে নির্ব্বিবাদে পড়িয়া ফেলিল। তাহার পর শুইবার ঘর হইতে নানা রকম শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, বুঝা গেল ভোরের শান্তি টুটিবার উপক্রম হইয়াছে। টিনি, চিনি আর খোকা উঠিলেই নিশ্চিন্ত, আর কাহাকেও কিছু করিতে হইবে না।

মামীমা ইহার মধ্যে অনেক কাজ সারিয়া ফেলিয়াছেন। দুধ দোয়ান, জ্বাল দেওয়া, সবই হইয়া গিয়াছে, এইবারে সকলের খাইবার পালা। মৃণালও ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে রান্নাঘরেই খাইতে চলিয়া গেল।

এখানে চা নাই, ডিম নাই, টোষ্ট-মাখনও নাই। কিন্তু বড় বড় কাঁসার বাটিতে খাঁটি দুধ আছে, তাহাতে ইচ্ছামত কেহ মুড়ি ভিজাইয়া খাইতেছে, কেহ খই, কেহ চিঁড়া। মৃণাল চিঁড়াটাই বেশী পছন্দ করে। তাহার পর ঘরে তৈয়ারী নারকেল-নাড়ু আছে, মুড়কির মোওয়া আছে, চন্দ্রপুলি আছে। যে যাহা চায়, তাহাই পায়। কিনিয়া ত এ-সব খাইতে হয় না, উপকরণও ঘরের, তৈয়ারীও হয় ঘরে।

জল খাবার খাওয়া শেষ হইতেই মামীমা বলিলেন, "তুই আর আমার পিছন পিছন এখন ঘুরিস নে। পরীক্ষার বছর, পড়গে যা। আর চিনি, টিনি, যদি দিদিকে গিয়ে জ্বালাবি, ত একেবারে ঠ্যাং ভেঙে দেব।"

চিনি, টিনির তখনও হাঁসের বাচ্চা, বাছুর, বিড়ালছানা প্রভৃতি অনেক জীবের তদারক করা বাকি, কাজেই দিদিকে তখনকার মত রেহাই দিয়া তাহারা বাহিরে ছুটিয়া চলিয়া গেল। মৃণাল আবার গিয়া পড়িতে বসিল।

এবার কিন্তু ঘণ্টা-খানেকের বেশী আর পড়া হইল না। একেবারে দিনরাত বইয়ের মধ্যে যদি ডুবিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে ত তাহার এখানে আসাই বৃথা। সে বই তুলিয়া রাখিয়া রান্নাঘরে মামীমার কাছে বসিয়া তরকারি কুটিতে আরম্ভ করিল। মামীমা বারণ করিলেও শুনিল না। জেলেনী চুবড়ি করিয়া কতকগুলি চুনা ও পুঁটি মাছ আনিয়া দিয়া গেল, তাহা বাছিতেও বড় কম সময় লাগিল না। পাড়াগাঁয়ে এই রকম মাছই বেশীর ভাগ দিন জোটে, বড় মাছ ক্বচিৎ কদাচিৎ। কিন্তু এখানে ইহারই মূল্য অসাধারণ, এক থালা ভাত এই মাছ-চচ্চড়ির সাহায্যে উঠিয়া যায়।

মল্লিক-মহাশয় সকাল বেলাটা নিজের ক্ষেত-খামার তদারক করিয়াই কাটাইয়া দেন, না দেখিলে আয় কমিয়া যায়। গোরু-বাছুরও অনেকগুলি আছে, তাহাদেরও রাখাল-ছোঁড়াদের দয়ার উপর একেবারে ছাড়িয়া রাখা চলে না।

তাঁহার হাতে একখানি পোষ্টকার্ড দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি এল গো?" চিঠিপত্র বড় তাঁহাদের বাড়ী আসে না, তাই চিঠি দেখিলেই মনে কৌতূহল জাগে।

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "মৃগাঙ্ক লিখেছে।"

মৃণাল তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দাওয়ায় বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কি লিখেছেন মামাবাবু? আমার কথা কিছু লিখেছেন?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "পূজোর সময় একবার তোমাকে নিয়ে যেতে লিখেছে। তার শরীর মোটে ভাল যাচ্ছে না, হাঁপানির টানটা বড্ড বেড়েছে, কাজকর্ম্ম আর বেশী দিন করতে পারবে না ব'লে ভয় করছে।"

মৃণাল চিন্তিতভাবে বলিল, "তবে ত বড় মুস্কিল। সংসারটি ত ছোট নয়। ওঁদের চলবে কি ক'রে?"

মামীমা বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "আগে-ভাগে অত কু-ভাবনা ভাবতে হবে না। হাঁপানির অসুখ কতবার বাড়ে, আবার ক'মেও যায়। আর বাড়ীঘর জমিজমা সবই ত রয়েছে, নিজে দেখে না, বিলি ক'রে রেখেছে, তাই তত বেশী আদায় হয় না। নিজেরা হাতে ক'রে করলে, সামনে দাঁড়িয়ে লোক খাটালে ওরই থেকে দুগুণ পাওয়া যায়। তাতে কি আর চলে না? আমাদের পাড়াগাঁয়ে চাকরি ক'রে টাকা আর ক'টা মানুষে আনে? ঘরের ধান-চাল তরিতরকারি, দুধ-ঘি, এইতেই সংসার চলে। তবে হ্যাঁ, বাবুগিরি করা চলে না।"

তাঁহার বাপের সংসারে বাবুগিরি যে বিশেষ হয়, এমন ধারণা মৃণালের ছিল না। বিমাতাটির যেটুকু পরিচয় সে পাইয়াছিল তাহাতে খুব ফ্যাশানদুরস্ত মানুষ বলিয়া তাঁহাকে মনে হয় নাই। আর ঐ অসংখ্য ছেলেমেয়ে, রুগ্ন স্বামী সাম্‌লাইয়া তিনি ফ্যাশান করিবেনই বা কখন?

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "পূজোর আগেই কি যেতে বলেছেন?"

মামীমা বলিলেন, "থাক্, যা না সুখের বাপের ঘর, পূজোর আগে আর যেতে হবে না। বিজয়ার পরে যাস্ এখন। কখনও ত বাপ-মা

একখানা মিলের কাপড় দিয়েও জিজ্ঞেস করে না। চোখের চামড়াও নেই।”

এই মা-মরা ভাগিনেয়ীর প্রতি তাহার পিতামাতার অবহেলা মল্লিক-গৃহিণী মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। মৃগাঙ্কমোহনের কথা উঠিলে তাঁহার মনের ঝাঁজ খানিকটা বাহির হইয়া পড়িত। মৃণালের এ-সব শোনা চিরকাল অভ্যাস, সে জিনিসটাকে স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল।

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, “গেলে ত বিজয়ার আগে যেতেই পারব না। কিন্তু যাতে একেবারেই না যেতে হয় তারই চেষ্টা দেখছি। মৃগাঙ্ককেই লিখলাম একবার আসতে সে সময়। বহুকাল ত এ-মুখো হয় নি। মিনু যখন আমাদের কাছে রয়েছে তখন একবারে সম্পর্ক তুলে দেওয়া ভাল দেখায় না।”

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, “হ্যাঁ, তার গিন্নি আসতে দিলে আর কি? যা দজ্জাল!”

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, “লিখে ত দিলাম। তার পর না আসতে পারে, আমিই মিনুকে নিয়ে একদিনের জন্যে যাব।”

মৃণাল বলিল, “সেই ভাল, অনেক দিন বাবাকে দেখি নি।”

মামীমা আবার রান্নাঘরে গিয়া ঢোকাতে, সেও তাঁহার পিছন পিছন চলিল। রান্না শেখার সখ তাহার অসাধারণ, কিন্তু এই ছুটির দিনকয়টি ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে শিখিবার সুবিধা নাই। সাদাসিধা রান্না প্রায় সবই সে শিখিয়াছে, তবে মামীমার রান্নার স্বাদ যেমন, তেমনটি তাহার হাতে কিছুতেই হয় না। ইহা লইয়া দুঃখ করিলে তিনি বলেন, “আমি দশ বছর বয়সে হাতা-বেড়ি ধরেছি রে, আর বুড়ী

হ'তে চললাম, চুলে পাক ধ'রে গেল। আমার রান্না যেমন হবে, তোরও এই ক'দিন ক'রেই তেমন হবে? তাহলে আর ভাবনা ছিল কি?”

৮

মৃণালের মামার বাড়ীতে পূজা হয় না বটে, তাই বলিয়া পূজার আনন্দ তাহারা কিছু কম উপভোগ করে না। গ্রামের জমিদার গ্রামেই বাস করেন, তাঁহাদের বাড়ীতে খুব ধুমধাম করিয়াই পূজা হয়। আর একটি বারোয়ারী পূজাও হয়। এক ঘর সাহা মহাজন আছে গ্রামে, তাহারাই এই দ্বিতীয় পূজাটির কর্ণধার হয়। গ্রামের অধিকাংশ লোকই ইহাতে সাধ্যমত চাঁদা দেয়।

জমিদার গ্রামে বাস করায়, এ গ্রামখানির বেশ শ্রী আছে। এখানে স্কুল আছে দুইটা, একটা ছেলেদের মিড্‌ল্ ইংলিশ স্কুল, আর একটি পাঠশালা, ইহার আবার দুইটা বিভাগ। একটিতে বালিকারা পড়ে, আর-একটিতে বালকরা। ইহার জন্য যাহা ব্যয় হয় তাহা জমিদার মহাশয়ই বহন করেন। এখানে ছোটখাট একটি বাজারও আছে, অবশ্য তরিতরকারি, মাছ-মাংসের জন্য সাপ্তাহিক হাটের উপরই বেশীর ভাগ নির্ভর করিতে হয়। হাসপাতালও আছে একটি চলনসই গোছের। এখানকার রাস্তাঘাটের অবস্থা মোটের উপর আশেপাশের গ্রামের চেয়ে ভাল, পুকুরগুলিও মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার হয় এবং জমিদার-বাড়ীর সীমানার মধ্যে গোটা-দুই টিউব-ওয়েল থাকাতে মহামারীর প্রকোপ এখানে অনেকটা কম।

গ্রামে একটি কাপড়ের দোকান আছে। গ্রামেরই এক ভদ্রলোক ইহা খুলিয়াছেন, ইহার সাহায্যেই তাঁহার সংসার চলে। প্রায়ই কলিকাতায় যান বলিয়া নানারকম কাপড় তাঁহার কাছে সর্ব্বদাই মজুত থাকে, মণিহারী বিভাগও তাঁহার একটি আছে। তাহা ভিন্ন গ্রামের যে-কেহ যাহা কিছু ফরমাস করে তাহা তিনি কলিকাতা হইতে কিনিয়া আনেন, রেলভাড়া হিসাবে সামান্য কিছু পারিশ্রমিক লন। ইলিশ মাছ হইতে কবিতার বই পর্য্যন্ত নানারকম ফরমাশই তাঁহার কাছে আসিয়া জুটে। পূজার দিন-পনেরো আগে কলিকাতায় গিয়া সস্তা অথচ নয়নরঞ্জন অনেক রকম শাড়ী, জামা, ধুতি তিনি কিনিয়া আনেন। পূজার সময় তাঁহার বিক্রি বেশ ভালই হয়, জমিদারবাবুরা বাদে আর সকলেই প্রায় এই দোকানে কাপড় কিনিতে আসে। জমিদারগৃহিণী কলিকাতার মেয়ে, তিনি স্বয়ং দিন-দুয়ের জন্য কলিকাতায় গিয়া পূজার বাজার করিয়া আনেন। তবে ঝি-চাকরের জন্য অনেক সময় এই দোকান হইতেই কাপড় কেনেন।

মল্লিক-মহাশয় ধনী মানুষ নহেন, তবে অবস্থা তাঁহার কিছু অসচ্ছল নয়। তাঁহার গৃহিণীও হিসাবী মানুষ বলিয়া সংসারে কখনও অকুলান হয় না। মেয়েরা কেহ এখনও বিবাহযোগ্যা হয় নাই, কাজেই বাপমায়ের মেরুদণ্ড এখনও ভাঙিয়া পড়ে নাই।

পূজার সময় সকলেই কাপড় পায়। ঝি, নাপতিনী, মেথরাণী, কেহই বঞ্চিত হয় না। এখানে বাড়ীর মেয়েদের দোকানে যাওয়ার প্রথা এখনও চলন হয় নাই, কাজেই মল্লিক-মহাশয়কেই প্রায় সমস্ত দোকানটাকে কাঁধে করিয়া ঘরে বহিয়া আনিতে হয়। গৃহিণী বলেন তাঁহার কর্ত্তার মোটে পছন্দ নাই, ছেলেমেয়েদেরও সেই মত, সুতরাং কর্ত্তা এক বস্তা কাপড় দোকান হইতে উঠাইয়া আনেন, যে যাহার

পছন্দমত কাপড় বাছিয়া লয়। পোষ্ট আফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে তাঁহার কিছু টাকা জমা আছে, তাহা হইতে এই সময় কিছু উঠাইতে হয়।

আজ বিকালের দিকে খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিয়া মল্লিক-মহাশয় কাপড় আনিতে চলিয়াছেন। গৃহিণী বলিয়া দিলেন, "সেবারকার মত সব যেন রঙীন কাপড় নিয়ে এস না গো। বাড়ীতে বুড়ী একটা আছে তাও মনে রেখো।"

ছেলেমেয়েরা সব গৃহিণীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মৃণালও তাহাদের মধ্যে, কাজেই কর্ত্তা সদুত্তর কিছু দিতে পারিলেন না, হাসিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মৃণাল বলিল, "মামীমা যেন কি! বয়স ত তোমার কতই। ঐ বয়সে দেখ ত কলকাতার মেয়েদের। তারা সব পরী সেজে ঘুরে বেড়ায়। বুড়ী বললে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। ওখানে ত দেখি যত বয়স বাড়ে, তত সাজের বহর বাড়ে। খুব কম বয়স যাদের, তারাই যা একটু সাদাসিধে থাকে।"

মামীমা বলিলেন, "তোমার কলকাতার নিয়ম কলকাতাতেই থাক্ বাছা। আমাদের ওসব করবার অবসর কোথায়? রাতদিন হাঁড়ি ঠেলব, না সেমিজ-সায়া প'রে, গালে রং মেখে বিবি সেজে ব'সে থাকব?"

মৃণাল বলিল, "আহা, গালে রং মাখতেই যেন আমি তোমাকে বলছি, তাই ব'লে একখানা রঙীন শাড়ী পরলে কিছু চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে না তোমার।"

মামীমা হাসিয়া ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। সমস্তটা দিন এবং রাতেরও প্রথম কয়েকটা ঘণ্টা তাঁহার এই ভাঁড়ার ঘর আর রান্নাঘরেই কাটিয়া যাইত। শুইবার ঘরে ঘণ্টা কয়েক ঘুমাইতেন, এই ছিল

তাঁহার সে ঘরখানার সঙ্গে সম্পর্ক। অবশ্য, বার-দুই সেগুলিতে ঝাঁট দিতে, নিকাইতে তাঁহাকে যাইতে হইত।

টিনি জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, এবার কি শাড়ী নেবে? রাঙা?"

মৃণাল বলিল "দূর্, বারেবারেই কি রাঙা নেয় নাকি? আমি এবার নীলাম্বরী নেব। তুই বুঝি রাঙা নিবি?"

টিনি সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, বুলু চাই।"

মৃণাল বলিল, "যাঃ, তোর কেলে রঙে ব্লু মোটে মানাবে না।"

চিনি বলিল, "আমি চাই ডুরে, ওবাড়ীর শোভাদিদির মত।"

টিনিকে কালো বলায় সে চটিয়া গেল। "তুমি কেলে কুচকুচে!" বলিয়া মৃণালকে এক চড় মারিয়া সে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল।

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "শুনলে মামীমা, তোমার মেয়ের কথা?"

মামীমা বলিলেন, "যেমন তুই পাগল ক্ষেপাতে যাস। ওটা কি আর মানুষ? মানুষের কোনো লক্ষণই ওর মধ্যে নেই।"

মল্লিক-মহাশয় কাপড়ের বস্তা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন সন্ধ্যার কিছু আগে। এবার আবার দুইটি বস্তা, ছোটটি তিনি নিজেই বহন করিয়া আনিয়াছেন, বড়টি দোকানের এক ছোকরা চাকর পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। বড় বারান্দাটার উপর দুইখানা মাদুর বিছাইয়া কাপড়গুলি তাহার উপর নামানো হইল। দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিতেছে, কাজেই মৃণাল তাড়াতাড়ি একটা হারিকেন লণ্ঠনও জ্বালিয়া আনিল। ছেলেমেয়ে কে কোথায় ছিল তাহার ঠিক নাই, কিন্তু সকলেরই যেন মাথার টনক নড়িয়া উঠিল। সবাই হুড়মুড় করিয়া উঠিতে পড়িতে ছুটিয়া আসিয়া জুটিল কাপড় বাছিতে। মল্লিক-গৃহিণীও রান্নাঘর হইতে হাত ধুইয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

কর্ত্তা বলিলেন, "নাও গো, কম হ'লেও বিশখানা সাদা শাড়ী নিয়ে এসেছি। বুড়ো মানুষের উপযুক্ত শাড়ী বেছে বার কর।"

মৃণালের মামীমা ছেলেমেয়ে, ভাগ্নী, প্রভৃতির সামনে যতই বৈরাগ্য দেখান না কেন, সখ তাঁহার কিছু কিছু ছিল। না থাকিলেই অন্যায় হইত, কারণ বয়স তাঁহার ত্রিশের কোঠার মাঝামাঝির বেশী অগ্রসর হয় নাই। তিনি হাসিতে হাসিতে আসিয়া মাদুরের এক কোণে বসিয়া পড়িলেন। মৃণাল তাঁহার দিকে একরাশ কাপড ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নাও মামীমা, শান্তিপুরে তিন-চার খানা শাড়ী রয়েছে, চমৎকার। ওর মধ্যে থেকে একখানা বাছ না?"

মামীমা শাড়ীগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া পরখ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। একখানি চওড়া লাল কল্কাপাড়ের শাড়ী তাঁহার খুবই পছন্দ হইল, কিন্তু দাম সাড়ে পাঁচ টাকা। গৃহিণী হাত গুটাইয়া বলিলেন, "বড্ড যে দাম গো? অত টাকা খরচ করতে চাই না। তার চেয়ে ঐ বোম্বাইয়ের দিকের মিলের শাড়ী একখানা নিই। ওরও ত খোল বেশ পাতলা, পাড়ও নানারকম রয়েছে।"

মৃণাল বলিল, "না, ঐ শান্তিপুরেটাই তোমাকে নিতে হবে। ভারি ত বছরে একখানা কাপড় কিনবে, তাও আবার মিলের। এই শাড়ীটা রাখি মামীমার জন্যে, মামাবাবু?"

মামাবাবু বলিলেন, "তা রাখ না, রাখবার জন্যেই ত আনা? মিলের কাপড় নেওয়ার কি দরকার?"

মামীমা হাসিয়া শাড়ীখানা হাতে করিয়া উঠিয়া গেলেন। বলিলেন, "ভাতটা দে'খে আসি, না হলে ধ'রে উঠবে। তোরা ততক্ষণ কাপড় বাছ্।"

চিনি আর টিনির কিছুতেই কাপড় বাছা শেষ হয় না। তাহারা যেন বাঁশবনে ডোম কাণা। বস্তাসুদ্ধ রাখিয়া দিলে তবে তাহাদের মনের মত হয়। টিনি যদিও নীল শাড়ী লইবার সখ জানাইয়াছিল, কার্য্যতঃ সে নিল, একখানি বাসন্তী রঙের শাড়ী, পাড়টা তাহার জরির, এবং চিনিও ডুরে শাড়ীর মায়া ত্যাগ করিয়া একখানি ছোট বুটিদার ঢাকাই শাড়ীর মায়ায় মজিয়া গেল। কিন্তু অন্য কাপড়গুলি হাত-ছাড়া করিতেও তাহাদের কোনও প্রকারেই আর মন উঠে না। অবশেষে তাহাদের মা আসিয়া দুইজনের পিঠে দুই চড় মাড়িয়া টানিয়া লইয়া গেলেন, না হইলে চটকাইয়া তাহারা শীঘ্রই ছোট শাড়ীগুলিকে আমসত্ত্বে পরিণত করিত। বুকের উপর নিজের নিজের শাড়ী চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহারা তখনকার মত রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া গেল।

মামাবাবু বলিলেন, "নাও মিনু, এবার তোমার পালা, তাহলেই বস্তাটা আবার বেঁধে ফেলতে পারি।"

মৃণাল বলিল, "আমি এবার একটা সাদা শাড়ী নিই, মামাবাবু?"

মামাবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কেন, তুমিও কি বুড়ী হয়ে গিয়েছ?"

মৃণাল বলিল, "বুড়ী নাই বা হলাম, তাই ব'লে কি এত খুকী যে রঙীন ছাড়া কিছুই পরতে পারব না? আমি এই মুগার ডুরে শাড়ীখানা নিই। বেশ সোনার ডোরার মত ঝক্ ঝক্ করছে।"

মামীমা কাছে আসিয়া বলিলেন, "একবার কাচতে দিলেই ত যাবে।"

মৃণাল বলিল, "না, আমাদের বোর্ডিংএ ঢাকাই ধোপা আছে, তাকে দিলে কিছু নষ্ট করবে না, ঠিক থাকবে।" সে সেই শাড়ীখানাই বাছিয়া আলাদা করিয়া রাখিল।

ছেলেদের কাপড় বাছার বিশেষ হাঙ্গামা নাই, একটু পাড়টা দেখিয়া রাখিয়া দিলেই হয়। সে কাজ শীঘ্রই চুকিয়া গেল, তাহার পর আবার ভাল করিয়া পুঁটুলি বাঁধিয়া দোকানের চাকর কাপড় দোকানে ফিরাইয়া লইয়া গেল।

শাড়ীখানি অতি যত্নে মৃণাল নিজের বাক্সে ঢুকাইয়া রাখিয়া দিল। ভাল জিনিষ পায় সে অতি কম, কাজেই যাহা পায়, তাহা পাওয়ার রসটাকে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া উপভোগ করে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কোনও ঘরে প্রদীপ, কোনও ঘরে হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে। মৃদু আলোকপাতে আলোছায়ায় সারা বাড়ী চিত্রিত ছবির মত সুন্দর। এমন সময় পড়ায় মন বসে না, দাওয়ার এক কোণে পা ঝুলাইয়া বসিয়া মৃণাল একদৃষ্টে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মামীমা ডাকিয়া বলিলেন, "ও মিনু, সন্ধ্যেটা দিয়ে দে মা। আমার হাত জোড়া।"

মৃণাল তুলসীতলায় প্রদীপ রাখিয়া প্রণাম করিল। শাঁখের শব্দ একবার প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া বাজিয়া উঠিল, পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল।

গোয়ালের গোরু-বাছুরগুলি সদলে ফিরিয়া আসিতেছে, তাহাদের ডাক দূর হইতেই শোনা যায়। সন্ধ্যার ছায়া ধূসর অবগুণ্ঠনের মত নামিয়া আসিতেছে, পল্লীরাণীর মুখ আর স্পষ্ট দেখা যায় না, কেবল উজ্জ্বল তারাগুলি যেন শ্যামাঙ্গিনীর ললাটের চন্দনতিলকের মত ক্রমেই বেশী পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। শীতের হাওয়া শরীরে শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছে। মৃণালের চোখ সম্মুখের দৃশ্য হইতে ফিরিতে চায় না, সে গায়ের আঁচল গায়ে শক্ত করিয়া জড়াইয়া আরও খানিকক্ষণ সেইখানেই বসিয়া থাকে।

পাড়াগাঁয়ে খাওয়া-দাওয়া সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই সুরু হইয়া যায়। বাতি জ্বালাইয়া কাজ করা পল্লীবাসীরা যেন পছন্দ করে না। দিনের কাজ দিন থাকিতে শেষ হইলেই ভাল, রাতে যখন ভগবান আলোক দেন নাই, তখন রাতে কাজ করা হয়ত তাঁহার বিধান নয়। রাত্রিটার সবটাই প্রায় ইহারা ঘুমাইবার জন্য রাখিয়া দেয়, তেমনি দিনের আলো ফুটিতে-না-ফুটিতে তাহারা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া কাজে লাগিয়া যায়।

চিনি, টিনি, খোকা সকলে খাইতে বসিয়া গেল। মেয়ে দুটি খায় যা, ছড়ায় তাহার বেশী। তাহাদের মা আবার এসব নোংরামি মোটেই দেখিতে পারেন না, অথচ খোকাকে সামলাইয়া মেয়েদের খাওয়াইয়া দিতেও পারেন না। কাজেই খাইতে বসিয়া চিনি-টিনি ভাত-ডাল যত না খায়, মার খায় তার বেশী। এখন মৃণাল আসাতে কয়েকটা দিন তাহারা বাঁচিয়া গিয়াছে, সে-ই তাহাদের গুছাইয়া খাওয়াইয়া দেয়, মুখ-হাতও ধুইয়া দেয়।

তাহার পর মৃণাল, মল্লিক-মহাশয় এবং তাঁহার বড় ছেলে খাইতে বসিলেন। মামীমা সবাইকে দিয়া-থুইয়া তবে নিজে খাইতে বসেন, দুই বেলাই তাঁহার এই ব্যবস্থা। মৃণাল আগে আগে রাত্রে তাঁহার সঙ্গে খাইত, এখন কিছুক্ষণ পড়াশুনা করিতে হয় বলিয়া আগে খায়। কিন্তু হারিকেনের মৃদু আলোতে বেশীক্ষণ পড়াশুনা করিতে ইচ্ছা করে না। চারিদিকের গভীর নীরবতারও যেন কেমন একটা সুর আছে। সেই সুর ঘুমপাড়ানি গানের মত কেবলই তাহার মনের ভিতর গুঞ্জন করিয়া ফিরে, দেখিতে দেখিতে ঘুমে তাহার চোখ ঢুলিয়া আসে। আলো কমাইয়া দিয়া, বই-খাতা গুছাইয়া তুলিয়া রাখিয়া সে শুইতে চলিয়া যায়।

সকাল বেলা জলখাবার খাওয়া শেষ করিয়া মৃণাল আর-এক পালা পড়িতে বসিবে মনে করিতেছে, এমন সময় মামাবাবু বাহিরের কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আজও তাঁহার হাতে একখানি চিঠি। মৃণালকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে মিনু, তোর বাবা যে আসছে।"

মৃণাল কিছু বলিবার আগেই মল্লিক-গৃহিণী বাহিরে আসিয়া উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে গো ?"

মৃণাল চিঠি লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিল, "দাও না দেখি মামাবাবু, বাবা কি লিখেছেন।"

মল্লিক-মহাশয় চিঠিখানা মৃণালের হাতে দিয়া বলিলেন, "আসছে পরশু। পূজোর সময় আসতে পারবে না, বিজয়ার পরেও কি কাজ পড়েছে, তাই আগেই আসছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা যখন হয় এলেই হলো। মিনুকে কত বছর যে দেখে নি তার ঠিক ঠিকানা নেই। নিজে আবার যে-বছর বিয়ে করলে সেই বছর মিনুকে নিয়ে গিয়েছিল। তার বছর-দুই পরে একবার দেখতে এসেছিল। তারপর থেকে ত বাপে বেটীতে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। সেই সাত বছরের মেয়ে দে'খে গেছে আর এবারে এসে সতেরো বছরের দেখবে। ধন্যি বাপ যা হোক। সাধে কি বলে, মা মরলে বাপ তালুই ?"

মৃণাল অনেক কষ্টে তাহার বাবার লেখা পোষ্টকার্ডখানা পড়িতেছিল। মৃগাঙ্কের লেখা এমন অদ্ভুত রকম জড়ানো যে তাহার পাঠোদ্ধার করা এক অসম্ভব ব্যাপার। যাহা হউক, এইটুকু বুঝিতে পারিল যে তিনি পরশু দিন আসিতেছেন, তবে দিন দুইয়ের বেশী থাকিতে পারিবেন না।

চিঠিখানা মামীমার হাতে দিয়া সে গিয়া ঘরে ঢুকিল। কিন্তু মন পড়ায় কিছুতে বসিতে চায় না। কতদিন পরে বাবাকে সে দেখিবে। বাপের চেহারা এখন আর স্পষ্ট তাহার মনে পড়ে না, আবছায়া মতন একটা মূর্ত্তি মনে ভাসিয়া উঠে। এখন তিনি কেমন হইয়া গেছেন কে জানে? এখানকার কাহারও সঙ্গেই এই দীর্ঘ দশ-এগারো বৎসরের মধ্যে তাঁহার দেখা হয় নাই। বাপকে দেখিবার ইচ্ছা মনে মনে মৃণালের অনেকখানিই ছিল, কিন্তু তাহা সে বলিবে কাহার কাছে? মামাবাবু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত, তাঁহার সঙ্গে গল্প চলে না। মামীমা মৃগাঙ্কমোহনকে একেবারেই দেখিতেই পারেন না, কাজেই তাঁহার সামনেও মৃণাল এ-সকল কথা তোলে না। টিনি-চিনি এখন পর্য্যন্ত জগৎসংসারে দুইটি মাত্র রসের সন্ধান পাইয়াছে, তাহা খাওয়ার এবং খেলার। ইহার অতিরিক্ত আর কিছু বুঝিতে তাহারা অক্ষম। কাজেই মৃণাল মনের ইচ্ছা মনেই রাখে। এতদিন পরে বাবাকে দেখিতে পাইবে শুনিয়া মনটা তাহার আনন্দে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু এ আনন্দের ভাগ লইবার লোক এ বাড়ীতে কেহ ছিল না।

সারাটা দিন এই কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে কেবলই ধ্বনিত হইতে লাগিল। নিজেকে ভাগ্যহীনা তাহার মনে হয় না, মামামামীর স্নেহের ছায়ায় সে যেমন বাড়িয়া উঠিতেছে, যত আরামে দিন কাটাইতেছে, অনেকে নিজের মা-বাপের ঘরেও ততটা আরাম পায় না। তবু বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মৃণালকে দুর্ভাগিনীই বলিতে হয়। তাহার মা নাই, বাবা থাকিয়াও নাই, ভাইবোন সহোদর কেহ নাই। সে কুমারী। এখন পর্য্যন্ত তাহার জীবন স্নেহপ্রেমের বন্ধনে অন্য কোনও জীবনের সহিত বাঁধা পড়ে নাই।

জগতে সে বড় একাকিনী। কিন্তু এই একাকীত্ব সে তেমন অনুভব করে না ত? হৃদয়ের শূন্যতা কিসে তাহার পূর্ণ হইয়া আছে?

৯

আজই মৃগাঙ্কমোহনের আসিবার দিন। বেলা নয়টা-দশটার সময় তিনি আসিয়া পৌঁছিবেন। সকালে উঠিয়াই মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "কার্ত্তিক জেলেটাকে একবার ডাকি, কি বল গো? একবার পুকুরে জাল ফে'লে দেখুক বড় মাছ একটা পায় নাকি? হাজার হোক এ-বাড়ীর জামাই ত বটে?"

গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "তা ডাক; জামাই ত শ্বশুরবাড়ীর মান কত রেখেছেন। এ বছর যা বৃষ্টি গেল পুকুর এখনও জলে থৈ থৈ করছে, মাছ উঠবে কি?"

কর্ত্তা বলিলেন, "উঠতেও পারে এক-আধটা, দেখুক একবার জাল ফেলে। আর দেখ, মিষ্টি আনব নাকি দোকান থেকে?"

গৃহিণী চটিয়া বলিলেন, "অতয় আর কাজ নেই। ঠাকুরঝি বেঁচে থাকত, কি মেয়েটাকে ওরা একটু ডেকে জিজ্ঞেস করত, তাহলেও না-হয় কথা ছিল। ঐ মাছ ধরালেই ঢের হবে। মিষ্টি দরকার হয় ত আমি ঘরেই ক'রে দেব। দুধেরও অভাব নেই, গুড়েরও অভাব নেই।"

কর্ত্তা অগত্যা প্রস্থান করিলেন। মৃগাঙ্ক বহু বৎসর পরে এ বাড়ীতে আসিতেছেন, একটু যত্ন-আদর বেশী করিয়া করিবারই মল্লিক-মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল। তিনি জামাই ত বটে এ-বাড়ীর, ব্যবহারটা না-হয় জামাইয়ের মত বহুকাল করেন নাই। কিন্তু গৃহিণী মৃগাঙ্কের নামে একেবারে খড়্গহস্ত, কিছু করিবার নামেই "আদিখ্যেতা" বলিয়া

মুখ ঝাম্‌টা দিয়া উঠিবেন, কাজেই কর্ত্তা আর বেশী বাড়াইতে ভরসা করিলেন না। কার্ত্তিক জেলেকে ডাকিয়া পুকুরে জাল ফেলিবার আদেশ দিয়া ধীর পদে ষ্টেশনের দিকে চলিলেন। মৃগাঙ্ককে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অন্ততঃ কাহারও ত সেখানে উপস্থিত থাকা উচিত?

ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখিলেন, ট্রেন আসিতে তখনও মিনিট-পাঁচ দেরি আছে। প্ল্যাটফর্ম্মের উপরই পায়চারি করিয়া সময়টা কাটাইয়া দিবেন স্থির করিলেন।

ষ্টেশনমাষ্টার ঘরের ভিতর হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আবার কে আসছে মল্লিক-মশায়? ভাগ্নীটি ত সেদিন এসে গেল।"

মল্লিক-মহাশয় হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আজ আসছে ভাগ্নীর বাপ।"

ষ্টেশনমাষ্টার দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? হঠাৎ এত দয়া যে? বারো বছর বোধ হয় এমুখো হন নি? মেয়ের বিয়ের-টিয়ের জোগাড় হচ্ছে নাকি?"

পল্লীগ্রামের লোক, সকলেই সকলের হাঁড়ির খবর রাখে, ইহাতে কেহ কিছু মনে করে না।

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "না, মেয়ের বিয়ের কথা এখনও কিছু ওঠে নি। এমনি মেয়েকে দেখতেই আসছে আর কি? বহুকাল দেখে নি কিনা!"

ট্রেন আসিবার সিগ্‌ন্যাল্ পড়িয়া গেল, কাজেই ষ্টেশনমাষ্টারকে গল্পের মায়া ত্যাগ করিয়া কাজে ছুটিতে হইল।

ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের ষ্টেশন, ট্রেন থামে মাত্র এক মিনিট। মানুষ উঠিবার নামিবার সময় পায় না। সঙ্গে একটার বেশী দুইটা পোঁটলা থাকিলে যাত্রীর মাথায় আকাশে ভাঙিয়া পড়ে যে নামাইবে কি

করিয়া। প্ল্যাটফর্ম্মও গাড়ীর সিঁড়ি হইতে প্রায় এক-মানুষ নীচে। নামা-উঠা করা এক রীতিমত কসরতের ব্যাপার।

গাড়ী থামিবার আগেই মল্লিক-মহাশয় দেখিতে পাইলেন, মৃগাঙ্কমোহন জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে তাকাইয়া আছেন। পাশের একটি কুলি-ছোক্‌রাকে ডাকিয়া লইয়া মল্লিক-মহাশয় সেই গাড়ীখানার দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

গাড়ী থামিবামাত্র মৃগাঙ্ক মস্ত একটা ক্যাম্বিশের ব্যাগ হাতে করিয়া গাড়ীর দরজার হাতল ধরিয়া ঝুলিয়া নামিয়া পড়িলেন। মল্লিক-মহাশয় ব্যাগটা তাঁহার হাত হইতে টানিয়া লইয়া কুলিটার হাতে দিয়া বলিলেন, "আর আছে নাকি কিছু?"

মৃগাঙ্ক নামিয়া পড়িয়াই কাশিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কোনও মতে নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন, "একটা হাঁড়ি।"

গাড়ীর ভিতরের আর একজন যাত্রী হাঁড়িটা অগ্রসর করিয়া দিল, কুলি-ছোক্‌রা সেটা টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। ট্রেনও তখনই আবার ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে করিতে প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

কাশি থামিলে পর মৃগাঙ্কমোহন মল্লিক-মহাশয়কে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব ভাল ত?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "আমরা ত সব ভালই, কিন্তু তোমাকে ত একেবারেই ভাল দেখছি না। এমন চেহারা হয়ে গেল কি ক'রে?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "আর কি ক'রে? যা রোগে ধরেছে, একেবারে শেষ না ক'রে ছাড়বে না। বারো মাস ত্রিশ দিন এই এক হাঁপানির

টান, যখন বাড়াবাড়ি হয় তখন খেতেও পারি না, শুতেও পারি না। জীবন্তে যমযন্ত্রণা ভোগ, মানুষের শরীরে আর কতই সয় ?”

মল্লিকমহাশয় দুঃখিত ভাবে বলিলেন, “তাই ত, স্বাস্থ্যটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে দেখছি। তুমি আমার চেয়ে কত ছোট, অথচ দেখাচ্ছে যেন তোমারই বয়স দশ বছর বেশী। চল এগনো যাক্। গাড়ী করি একখানা, তোমার আবার হাঁটতে কষ্ট হবে ?”

মৃগাঙ্ক গোরুর গাড়ীগুলির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “নাঃ, আস্তে আস্তে হেঁটেই যাই চলুন। ও ঝাঁকড়ানি আমার সহ্য হবে না, তার চেয়ে পায়ে হাঁটাই ভাল।”

দুইজনে জনবিরল পল্লীপথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন। লাল মাটির পথটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া কত গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে কে জানে ? কোথাও তাহার দুই ধারে খোলা মাঠ, কোথাও শ্যামল ধানের ক্ষেত ; মধ্যে মধ্যে পুকুর, এবার বর্ষার প্রাচুর্য্যে কানায় কানায় ভরিয়া আছে। দূরে নির্ম্মলসলিলা ছোট একটি নদীর স্রোত রজতহারের মত শ্যামা ধরিত্রীর বুকে দুলিতেছে।

চলিতে চলিতে মৃগাঙ্ক বলিলেন, “দোকানপাট অনেকগুলো হয়ে গেছে দেখছি, প্রায় ছোটখাট শহর। আগে ত এর অর্দ্ধেকও দেখিনি ?”

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, “হ্যাঁ, ক্রমেই গাঁয়ে লোকও বাড়ছে, দোকান-পাটও বাড়ছে। ইংরেজী স্কুল হয়েছে একটা। জমিদারবাবু গাঁয়ে থাকাতেই নানা রকম সুবিধে হচ্ছে আর কি ?”

মৃগাঙ্ক বলিলেন, “আর আমাদের গাঁ, যাকে বলে পাড়াগাঁ। দিনদুপুরে মানুষকে সাপে খাচ্ছে, বাড়ীর আনাচে-কানাচে শেয়াল ডেকে বেড়াচ্ছে। গেল বছর শীতকালে ত একটা বাঘই ঢুকে পড়ল

গাঁয়ে। নেহাৎ পৈত্রিক ভিটা, যাবার ঠাঁইও নেই আর কোথাও, তাই ওখানে থাকা, নইলে মানুষের বাসের আর যোগ্য নেই।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "স্বাস্থ্যটা কেমন ? ছেলেপিলে বেশী ভোগে না ত ?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "ভোগে আবার না ? এটার জ্বর, ওটার সর্দ্দি, সেটার আমাশা, এ ত লেগেই আছে। তবে ঘরের দুধটা ফলটা পায় এখনও তাই টিকে আছে কোনও মতে। ম্যালেরিয়া তত বেশী নেই, তাই ব'লে একেবারে যে নেই তা নয়।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "আমরা ওদিক্ দিয়ে ভাল আছি। কর্ত্তার এসব দিকে দৃষ্টি খুব, নিজে বারো মাস থাকেন কি না ? পচা পুকুর, কি ডোবা একটিও নেই গ্রামে। টিউব ওয়েলের জল পেয়ে অবধি কলেরাও বড়-একটা হয় নি। তবে সর্দ্দিজ্বর কি আর না হচ্ছে ? তা হবে বইকি ?"

কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরের বারান্দাটি ভরিয়া বাড়ীর সব কয়টি মানুষ দাঁড়াইয়া আছে, মল্লিক-গৃহিণী বাদে। তাঁহার রান্না-ঘরের কাজের ফাঁক পড়িবার জো নাই, তাহা ছাড়া মৃগাঙ্ককে দেখিতে বা অভ্যর্থনা করিতে তিনি বিন্দুমাত্রও ব্যস্ত নহেন।

মৃগাঙ্ক দাওয়ার নীচে আসিয়া দাঁড়াইতেই মৃণাল নামিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মৃগাঙ্ক অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মল্লিক-মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "এই যে মনু, চিনতে পারছ না নাকি ?"

মৃগাঙ্ক শেষ দেখিয়াছিলেন কন্যাকে সাত বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকা। শ্যামবর্ণ রং ছিল তখন বলিয়া মনে হয়, শরীরও যেন কৃশ ছিল। আর এ

যেন পল্লবিনী লতার মত মনোহর, প্রথম যৌবনের শোভায় সৌন্দর্য্যে ইহার সুকুমার দেহখানি কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। একটা দীর্ঘশ্বাস দমন করিয়া মৃগাঙ্ক বলিলেন, "কত কাল আগে দেখেছি, তখন ছোটটি ছিল। বেশ ডাগর হয়েছে, শৈলজারই চেহারা পেয়েছে।"

মৃণালের পর চিনি, টিনি, তাহাদের দাদা একে একে সকলেই মৃগাঙ্ককে প্রণাম করিতে লাগিল। মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "রোস্ রোস্, মানুষটাকে ঘরে ঢুকে বসতে দে। এতটা পথ হেঁটে এল।" তিনি সঙ্গে করিয়া অতিথিকে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। কুলি-ছোকরাকে বলিলেন, "হাঁড়ি আর ব্যাগ এখানে রেখে বাইরে গিয়ে দাঁড়া। পয়সা দিচ্ছি।" তাহার পর রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া হাঁকিলেন, "কই গো?"

মল্লিক-গৃহিণী হাত ধুইয়া আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, "এই চাল ক'টা হাঁড়িতে দিয়ে এলাম আর কি।" মৃগাঙ্ক প্রণাম করিতেই বলিলেন, "এস ভাই এস, এতদিনে তবু মনে পড়ল। ও মা, এ কি চেহারা হয়ে গেছে? এ যে চিনবার জো নেই।"

মৃগাঙ্ক হতাশভাবে বলিলেন, "আর চেহারা! বেঁচে যে আছি সেই ঢের। তা আপনারা সব ভাল আছেন ত?"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "এই যেমন রেখেছ! তা জুতো খুলে হাত-মুখ ধোও। চা-টা খাওয়া অভ্যেস আছে না কি?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "না বউঠাকরুণ, ওসব অভ্যেস করবার মত পয়সা কই? সকালে একটু গুড় হোক কি দুটো মুড়ি হোক, এই মুখে দিয়ে এক ঘটি জল খাই, এই পর্য্যন্ত।"

চিনি আর টিনি পিসেমহাশয় আনীত হাঁড়িটাকে গভীর মনোযোগ দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, মৃগাঙ্ক তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এক হাঁড়ি টানা লাড়ু আনলাম, ছেলেমেয়েদের জন্যে। যেমন মানুষ তেমন জিনিষ। ওরা কত ভাল ভাল মিষ্টি খায়। আমাদের যা দেশ, যেন ভূতের বাথান, সেখানে পাওয়াও যায় না কিছু।"

মল্লিক-গৃহিণী ভদ্রতার খাতিরে বলিলেন, "ঐ বেশ এনেছ। ওরাই কি আর সোনারূপো খায় নাকি? এখানে মিষ্টি কিনছেই বা কে, আর বেচছেই বা কে। আমি মাঝে মাঝে ঘরে দু-একটা কিছু ক'রে দিই যদি তবেই।" মনে মনে বলিলেন, "তোমার হিঁসুকুটি গিন্নি আবার ভাল মিষ্টি আনতে দেবে!"

হাঁড়িটা খুলিয়া ছেলেমেয়েদের হাতে একটা একটা মিঠাই গুঁজিয়া দিয়া, তখনকার মত উহা তিনি শিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিলেন। এখন ঐ বাজে মিঠাই খাইয়া পেট বোঝাই করিলে ভাত তাহারা আর এক গ্রাসও খাইবে না। ভালমন্দ দু-একটা আজ রান্নাও করিতে হইবে, তাহার জন্যও পেটে জায়গা রাখা চাই।

মৃণাল বাপের পা ধুইবার জন্য জল আর গামছা আনিয়া ভিতরের বারান্দায় রাখিল। জুতা-মোজা ছাড়িয়া, হাত-পা ধুইয়া তিনি আবার মল্লিক-মহাশয়ের খাটের উপর আসিয়া বসিলেন। মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "মিনু আয় ত আমার সঙ্গে। একটু জলখাবার গুছিয়ে দিই গিয়ে।" মৃণাল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। মামীমা এক বাটি দুধ আর একটি কাঁসার রেকাবিতে খান-চার চন্দ্রপুলি আর দুইটা মুগের লাড়ু সাজাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই খেতে দে এখন, যা চেহারা করেছে, আর বেশী খেতে পারবে না। আর রান্নাও ত হয়ে এল ব'লে, মাছটা এলেই হয়।"

মৃণাল জলখাবার লইয়া মামাবাবুর ঘরে ফিরিয়া গেল। একখানি কার্পেটের আসন পাতিয়া জায়গা করিয়া দিল, এক গেলাস জল গড়াইয়া রাখিল। মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "নাও হে, একটু জল খাও।"

মৃগাঙ্ক নামিয়া আসনে বসিলেন, রেকাবির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এত খাবার ?" কিন্তু দেখিতে দেখিতে রেকাবিটা খালি হইয়া গেল, বাটির তলায় দুধ এক ফোঁটাও পড়িয়া রহিল না। পল্লীগ্রামের মানুষ, দেখিতে যতই রোগজীর্ণ হউক, খাইবার ক্ষমতা সর্ব্বদাই রাখে। মৃণাল বাসন উঠাইয়া লইয়া গেল। এমন সময় কার্ত্তিক জেলে খিড়কির দরজা দিয়া উঠানের ভিতর প্রবেশ করিল। রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া বলিল, "এই নাও মা-ঠাকরুণ, মা দুগ্‌গার কৃপায় বড় মাছটাই পাওয়া গেছে।" সঙ্গে সঙ্গে ধপাস্ করিয়া একটা চার সের ওজনের কাতলা মাছ সিঁড়ির উপরে ফেলিয়া দিল।

ছেলেবুড়া সকলেই দৌড়াইয়া আসিল মাছ দেখিতে। পাড়াগাঁয়ের মানুষ, খাইতে সকলেই ভালবাসে, ভাল সুখাদ্যের সন্ধান পাইলে তাই সকলেই উৎসুক হইয়া বাহির হইয়া আসে। এমন কি মৃগাঙ্কও বাহির হইয়া আসিলেন। মাছের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দিব্যি মাছটি ত দাদা ! চার-পাঁচ সের ওজন হবে, কি বল ?".

মল্লিক-মহাশয়ও মাছ দেখিয়া বেশ খুশী হইয়াছিলেন। মৃগাঙ্ক প্রায় এগার বৎসর পরে এ বাড়ীতে পা দিলেন, তাঁহাকে আজ নিরামিষ খাইতে দিতে হইলে মল্লিক-মহাশয়ের আর খেদের সীমা থাকিত না। বলিলেন, "হ্যাঁ, তা হবে বই কি ? পাঁচ সের না হোক, চার সের ত হবেই।"

তাঁহার গৃহিণী বলিলেন, "আর একটু ছোট হ'লেও দুঃখ ছিল না। এত মাছ এক দিনে খাবে কে ?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "এক দিনে না হোক দু-দিনে খাবে। শীত প'ড়ে গেছে, নষ্ট হবে না। তুমি কিছু কালকের জন্যে তুলে রেখে দিও। টক দিয়ে দিব্যি হবে!"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমি ত ব'লে খালাস, তার পর একরাশ ক'রে টক মাছ খেয়ে ছেলেমেয়েরা যখন পেট ছাড়বে, তখন ত আর তুমি সামলাতে আসবে না। গতবার যা ভুগলাম এই নিয়ে।"

মৃগাঙ্কমোহন বলিলেন, "অবাক্ করলেন আপনি বউঠাকরুণ, মাছ আবার এক দিনে বাসি হয় নাকি? পাড়াগাঁয়ের মানুষ, বাসি খেতে ভয় করে এও কখনও দেখিনি। আমরা ত এমন মাছ পেলে চার দিন ধ'রে খাই। অসুখ হয়ত এক-আধটার করে, তা কে মানছে অত? খাবার জিনিষ ভাল পাওয়া যায় কালেভদ্রে, তাও যদি ভয়ে না খায়, তাহলেই হয়েছে আর কি?"

মল্লিক-গৃহিণী মনে মনে বলিলেন, "নোলা দেখ বুড়ো মিন্সের!" মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বাহিরে বলিলেন, "তা মাছ রেখে দেব ভাই, যত পার কাল টক খেয়ো তোমরা। কুচোকাচাগুলোকে আর দেব না। ও মিনু, মাছটা কুটবি আয় মা, এক হাতে ত পেরে উঠব না।"

মৃণাল মামীমাকে সাহায্য করিতে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল। পিতার আগমনের খাতিরে সে আজ নিজেকে নিজে ছুটি দিয়া রাখিয়াছিল।

রান্না হইতে একটু বেলাই হইয়া গেল। মাছের মুড়া দিয়া ডাল রান্না হইল, একটা ঝোলও হইল, খানকতক বড় বড় মাছ কালকার জন্য তুলিয়াও রাখা হইল। রাত্রির আহারের জন্যও সেরখানেক মাছ গৃহিণী রাখিয়া দিলেন।

ছেলেমেয়ে ছোটর দলের সঙ্গেই বড়রাও বসিয়া গেলেন। মৃণাল আর তাহার মামীমা পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

মৃগাঙ্ক দুই চার গ্রাস খাইয়াই বলিলেন, "বউঠাকরুণের রান্নার হাত আরও খুলেছে দেখছি। এমন রান্না বহুকাল খাই নি।"

মল্লিক-গৃহিণী একটু অম্লমধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন. "কেন, বউ ভাল রাঁধে না?"

মৃগাঙ্ক একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "ওসব জায়গায় অত নানা রকম রান্নার চলন নেই, জানেও না বিশেষ কেউ, কোন মতে সেদ্ধ ক'রে নামায় আর কি? আর ছেলেমেয়ে নিয়ে তারও মরবার সময় নেই, রাঁধবে কি পাঁচ রকম। লোকজন রাখবার ত ক্ষমতা নেই?"

মল্লিক-মহাশয় কথার মোড় ফিরাইবার জন্য বলিলেন, "ছেলেমেয়ে ক'টি হ'ল?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "তা অনেকগুলি হয়েছে, ছেলে. চারটি, মেয়ে তিনটি। বড় কষ্টে দিন যাচ্ছে। এই ত শরীর, কাজকর্ম্মই যে কতদিন করতে পারব তার ঠিকানা নেই।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "খাবার সময়ে আর দুঃখকষ্টের কথা তুলে কাজ নেই, ওসব আর কার সংসারে নেই বল? মাছ আর একখানা দিই?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "তা দিন। বেশী খেলে আবার সব সময় সয় না, এই যা ভয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "অত ভয় করে না। এই না তুমিই বললে পাড়াগেঁয়ে মানুষের ভয় করলে চলে না। টাটকা পুকুরের মাছ, খেয়ে নাও, কিছু হবে না আমি বলছি।"

মৃগাঙ্কমোহনকে বেশী বলিবার প্রয়োজন হইল না, তিনি আবার খাইয়া চলিলেন।

বিকালবেলা ভগিনীপতিকে সঙ্গে করিয়া মল্লিক-মহাশয় সারা গ্রামখানি ঘুরাইয়া আনিলেন। নিজের জন্মভূমিটি সম্বন্ধে ভদ্রলোকের গর্ব্বের সীমা ছিল না। এ গ্রামখানা যে আশেপাশের আর পাঁচখানা গ্রামের মত অস্বাস্থ্য, মূর্খতা আর দারিদ্র্যের আড়ত নয় তাহা তিনি কাহাকেও বলিতে ছাড়িতেন না। সুবিধা পাইলে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াও দিতেন।

মৃগাঙ্ক ছেলেদের পাঠশালা, মেয়েদের পাঠশালা, মিড্‌ল্ ইংলিশ স্কুল, হাসপাতাল সবই দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনারা রাম-রাজত্বে আছেন দাদা। আর আমাদের জমিদার বেটা, ছোঃ! ঠিক যেন কসাই। সাতজন্মে গ্রাম মাড়ায় না। কলকাতায় ব'সে বদমাইসি ক'রে-পয়সা ওড়াচ্ছে বারোটা মাস, আর যত শকুনি মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ হচ্ছে, কি ক'রে গরীবের গলায় পা দিয়ে আরও দুটো পয়সা বেশী আদায় করবে।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "দেশের বেশীর ভাগ জমিদারই ঐ রকম ভায়া, আমরা কপালগুণে সদাশয় প্রভু পেয়ে গিয়েছি। আমাদের মা-ঠাকুরুণটিও চমৎকার মেয়ে, তাঁর সুপরামর্শেই এতটা উন্নতি হয়েছে। তা চল, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, তোমার আবার ঠাণ্ডাটাণ্ডা লেগে যাবে।" দুই জনে ফিরিয়া চলিলেন।

রান্না হইতে তখনও দেরি ছিল, সবে দু-একটা প্রদীপ জ্বালা হইতেছে। মল্লিক-মহাশয় হাত-পা ধুইয়া ঘরে ঢুকিলেন, মৃগাঙ্ককে বলিলেন, "তুমি এমনি জুতো ছেড়ে খাটে উঠে বস, বারে বারে ঠাণ্ডা জলে পা ভিজিয়ে আর কাজ নেই।"

মৃগাঙ্ক তাহাই করিলেন।

মৃণাল আসিয়া ঘরে একটি হারিকেন লণ্ঠন রাখিয়া গেল। মল্লিক-মহাশয়ও বলিলেন, "আজ আর তোমার পড়া হবে না মিনু, জায়গার অভাব।"

মৃণাল সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "তা নাই বা হ'ল? একদিন না পড়লে কিছু এসে যাবে না।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। পড়ার জায়গাও নাই, রান্নাঘরেও মামীমার সাহায্যের প্রয়োজন, বেশী আয়োজন করিতে হইলেই তিনি আর এক হাতে পারিয়া উঠেন না।

সে বাহির হইয়া যাইতেই মৃগাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিনু পড়াশুনায় কেমন?"

তাহার মামা বলিলেন, "পড়ায় ত বেশ ভালই, প্রতিবারেই প্রথম কি দ্বিতীয় হয়। তবে অনেক বয়সে পড়া আরম্ভ করেছে, কাজেই বয়সের আন্দাজে একটু পিছিয়ে আছে। এইবার ত ম্যাট্রিক দেবে।"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "আর কতদিন পড়াতে পারব তা ত জানি না। কলেজে পড়ানোর খরচ ত অনেক। এই যা দিচ্ছি তাই দিতেই কত হাঙ্গাম যে হয় তা কি বলব! জানেন ত মেয়েমানুষের স্বভাব, অতি স্বার্থপর জাত। ওরও যে কিছু দাবী আছে তা যেন মানতেই চায় না। একেবারে অশিক্ষিতা কি না? কিছু বললেই এক উত্তর—'বিয়ে দিয়ে দাও না কেন? হিন্দু গেরস্ত ঘরে অত বিবিয়ানার কি দরকার'?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "ভাল বিয়ে যদি দেওয়া যায়, তা আমি ত ভালই বলি। বয়স ত ঢের হ'ল, গিন্নীর সঙ্গে আমারও মাঝে মাঝে এই নিয়ে তর্ক লাগে। উনি আবার বেশী একটু পুরাতনপন্থী কি না? পড়াশুনার প্রয়োজনটাও খুব বেশী যে বোঝেন তা নয়।"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "তা সম্বন্ধ-টম্বন্ধ কিছু হাতে আছে নাকি? ক'দিন যে আর বাঁচব, তার ঠিক নেই। আর বাঁচলেও কাজ যে আর অনেক দিন করতে পারব না, তা এক রকম ঠিকই। একটারও অন্ততঃ ভাল ব্যবস্থা ক'রে যেতে পারলে মনে অনেকটা শান্তি পাই।"

মল্লিক-মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "মেয়ের সম্বন্ধ কি আর সেধে আসে ভায়া, অনেক চেষ্টাচরিত্তির ক'রে তবে একটা সম্বন্ধ পাওয়া যায়। রাজারাজড়ার মেয়ে হ'লেও না-হয় কথা ছিল, টাকার লোভে বেটারা ছুটে আসত। আমরা ত টাকাকড়িও কিছু দিতে পারব না। তোমার ত এই অবস্থা। আর আমিও ছা-পোষা মানুষ, দিন-আনি দিন-খাই, কিছু হাজার-বারো-শ বার ক'রে দিতে পারব না। সম্বলের মধ্যে ত ওর মায়ের ক'খানা গয়না, তাতে আর খুব ভাল বিয়ে কি ক'রে হবে?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "সেটা কি আর না বুঝি দাদা, সেই জন্যেই ত বিয়ের কথা তুলি না। ছোটবেলায় মা গেল, বাপও ওর নামে মাত্র আছে। নেহাৎ তোমাদের স্নেহে যত্নে ও এত বড়টি হয়েছে, না হ'লে অদৃষ্টে ওর অনেক দুঃখ ছিল। তাই ভাবি, পড়ছে পড়ুক, জোর ক'রে যার-তার হাতে দিয়ে দেব না, চিরটাকাল জ্বলেপুড়ে মরবে। কলকাতায় অনেক মেয়ের ত লেখাপড়ার গুণে ভাল বিয়েও হয়ে যায়, ওরও যদি তেমনই হয় ত ভালই। না হলেও নিজে ক'রে খেতে পারবে ত? দুমুঠো ভাত আর দুখানা কাপড়ের জন্যে ঝাঁটা-লাথি খেয়ে মরতে হবে না।"

কথাগুলা মল্লিক-মহাশয়ের বিশেষ পছন্দ হইল না। গৃহিণীর মত উগ্র সনাতনপন্থী না হইলেও তিনি প্রাচীন প্রথাগুলি মানিয়া চলাই পছন্দ করিতেন। মৃণালের লেখাপড়া শিখিয়া খাটিয়া খাওয়ার চিত্রটা তাঁহার মোটেই ভাল লাগিল না। নিজে স্বয়ম্বরা হইয়া ভাল বিবাহ

করার সম্ভাবনাতেও তিনি যে খুব পুলকিত হইলেন তাহা নহে। বলিলেন, "ওসব যাদের সাজে তাদের সাজে ভায়া, ওসব আমাদের ঘরে কেন ? আমি বলি কি, ম্যাট্রিকটা দিয়ে নিক, তারপর তুমিও যা পার বার কর, আমিও যা পারি বার করি, ওর বিয়েটা দিয়ে ফেলা যাক্। গিরিজার কাছে চাইলে সেও খুশী হয়েই সাহায্য করবে, মা-মরা বোনঝিটিকে সেও খুবই ভালবাসে। খুব একেবারে রাজাবাদশার ঘরে দিতে পারব না তা জানি, সেরকম দুরাশা রাখিও না। তবে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের দুঃখ হবে না এমন ঘর দে'খে দেব, ছেলেও যাতে পাজি কি মূর্খ না হয় তাও দেখব। এর বেশী আর গেরস্ত মানুষে কি আশা করতে পারে বল ?"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "দেখা যাক, এখনও ত মাস-ছয় সময় আছে। তোমাকে গোপনে বলি দাদা, কিছু টাকা আমি ওর বিয়ের জন্যে রেখেছি। অতি সামান্যই যদিও। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, আমাদের সামর্থ্যই বা কত ? কিছু কয়লার খনির শেয়ার ছিল, বাপের আমলের, সেগুলি বেচে শ-চার-পাঁচ টাকা পেয়েছি। সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা আছে। গিন্নি লেখাপড়া জানেন না, কাজেই এর খোঁজ আর পান নি। মনে করেছি এ টাকাটা মিনুর জন্যেই দেব, তা তার বিয়েতেই হোক কি কলেজে পড়ানোর জন্যেই হোক। যা পাঁচ জন পরামর্শ ক'রে ভাল বোধ কর।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "ঐ বিয়ের পরামর্শই ভাল হে। একটি ভদ্র গেরস্ত-ঘরের ছেলে দেখ তুমি, আমিও দেখি, তার পর ওর পরীক্ষার পর বৈশাখ মাসে শুভকর্ম্মটা হয়ে যাক। এতেই ভাল হবে। একটি ছেলে আমার আঁচে আছে, তুমি দিন-দুই থাক ত দেখাতেও পারি।"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "আমাকে ত কাল দুপুরের গাড়ীতেই যেতে হবে দাদা, ছেলেমেয়ে নিয়ে একলা রয়েছে কিনা? কেন, সে ছেলেকে কাল সকালে দেখা যায় না?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "ছেলেটি মামার বাড়ী গেছে কিনা, ফিরতে দিন-দুই দেরি হবে। ঘর ভাল, আই-এ পরীক্ষা দিচ্ছে এ বছর। জমিজমা, ঘরদোর আছে।"

এমন সময় টিনি, চিনি একসঙ্গে বিকট চীৎকার করিয়া ওঠায় মল্লিক-মহাশয় ও মৃগাঙ্ক দুই জনেই চমকিয়া উঠিয়া পড়িলেন। মৃণালও লণ্ঠন-হাতে ছুটিয়া আসিল। ব্যাপার সাঙ্ঘাতিক কিছুই নয়, একটা মস্ত বড় তেঁতুলে-বিছা দেয়াল বাহিয়া উঠিতেছে। সেটাকে ঝাঁটা দিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিতেই আবার পাড়া জুড়াইয়া গেল।

ইতিমধ্যে রান্নাও হইয়া গেল। মৃণাল রান্নাঘরের ভিতর একটা দিক্ ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়া বড় বড় পিঁড়া পাতিয়া জায়গা করিতে লাগিল। টিনি খাইবার নামেই বিছার ভয় ভুলিয়া গিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল, দিদিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, জল গড়িয়ে দেব?"

দিদি কিছু বলিবার আগেই তাহার মা তাড়া দিয়া উঠিলেন, "থাক্, তোমার আর জলের কলসী ছুঁতে হবে না। যা পরিষ্কার কাপড়-চোপড়, তেমনি পরিষ্কার হাত-পা। আঁস্তাকুড়ে ত দশবার পা দিয়ে এসেছিস।" টিনি মুখ গোঁজ করিয়া দরজার ধারে সরিয়া দাঁড়াইল।

এবেলাও বড় ছোট সকলেই প্রায় একসঙ্গে খাইতে বসিয়া গেল। ছোটরা বিশেষ কিছু খাইতে পারিল না, দুপুরে বেশী বেলায় গোগ্রাসে গিলিয়া পেট ভার হইয়া ছিল। বড়দের আহার সমান উৎসাহেই চলিল।

গৃহিণী বলিলেন, "কাল সকালে টক রাঁধবার মাছ রেখে দিলাম ভাই, ভাল ক'রে খেয়ে যেতে হবে।"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "তা খাব বই কি? ট্রেন ত সেই বেলা দেড়টায়, না খেয়ে কি আর যাব?"

গৃহিণী বলিলেন, "এলে ত বারো বছর পরে, তা এক দিনের বেশী দু-দিন থাকতে পার না? ঘরের মানুষটির গুণ আছে বলতে হবে।"

মৃণালের সামনে এহেন রসিকতায় একটু লজ্জিত হইয়া মৃগাঙ্ক বলিলেন, "না না, গুণটুনের জন্যে কি আর? অজ পাড়াগাঁ কি না, বিপদ্-আপদ্ সহজেই হতে পারে, তাই একলা ছেলেপিলেশুদ্ধ ফে'লে রাখতে বেশী দিন ভরসা হয় না। এই ত সেদিন আমাদেরই বাগানে একটা রাখাল ছোঁড়াকে কেউটে সাপে কামড়ে দিল। বলছি কি, একেবারে ঘোরতর পাড়াগাঁ।"

গৃহিণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ঐদিকে ভাল আছি ভাই, সাপখোপের উৎপাত এখানে তেমন কিছু নেই। বর্ষাকালে দু-চারটে ঢোঁড়া ছেলে যে না বেরোয় তা না, তবে তার বেশী না। জঙ্গলটঙ্গল সব পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়েছে কিনা, তাই এসব আপদ্ আর নেই।"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "ও দিকে কেন, সকল দিকেই আপনারা ভাল আছেন, বউঠাকরুণ। আমাদের গাঁয়ে মানুষ যে বেঁচে থাকে সেই আশ্চর্য্য। অসুখ যত রকম আছে তা ত বারো মাস ঘরের দোরে বাঁধা, আর সাপখোপ, বাঘ, শূয়োর কিছুর অভাব নেই।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "নিজেরা পাঁচ জন ভদ্রলোক মিলেও ত গাঁটাকে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে পার? নিজেদেরও ত তাতে লাভ আছে, শুধু জমিদারের লাভ নয়।"

মৃগাঙ্ক বলিলেন, "হুঁঃ, তাহলে আর বাঙালী হয়ে জন্মেছে কেন? নিজের উপকার করতে গিয়ে যদি সেই সঙ্গে পাড়া-পড়শীরও উপকার হয়ে যায়, তাহলে সে দুঃখ ত আর রাখবার জায়গা থাকবে না।"

খাওয়া চুকিয়া গেল। চিনি, টিনি, খোকা সকলের হাত মুখ ধোয়াইয়া, কাপড় বদলাইয়া মৃণাল একেবারে বিছানায় তুলিয়া দিয়া আসিল। মামীমা দুই জনের ভাত বাড়িতে বাড়িতে বলিলেন, "দেখ, আমি বলেছিলাম না? এক কাঁড়ি মাছ নষ্ট হল কি না?"

মৃণাল বলিল, "সত্যি, চিনি-টিনির হাঁকাই আছে খুব, খেতে পারুক আর নাই পারুক। এমনি রেখে দিলে রাধীকে দেওয়া যেত।"

পরদিন একটু তাড়াতাড়ি করিয়া খাইয়া মৃগাঙ্ক সকাল সকাল বিদায় হইয়া ষ্টেশনের দিকে চলিলেন। ট্রেন পাছে ফেল্ হইয়া যায়, এই ভয়টা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। মল্লিক-মহাশয়ও চলিলেন তাঁহাকে তুলিয়া দিতে। ছোক্‌রা-কুলি এবারেও ব্যাগ এবং হাঁড়ি বহন করিয়া লইয়া চলিল। হাঁড়িতে মল্লিক-গৃহিণী ভর্ত্তি করিয়া বাড়ীর তৈরি মিঠাই দিয়া দিয়াছেন। প্রিয়বালার সন্তানদের মিষ্টিমুখ করাইবার কোনও রকম ইচ্ছাই তাঁহার নাই. তবু সামাজিক রীতি যাহা তাহা করিতেই হইবে। কোনও রক্তের সম্পর্ক না-থাকিলেও তাহারা নামে ভাগ্নে ভাগ্নী ত?

যাইতে যাইতে মৃগাঙ্ক বলিলেন, "তা হলে ঐ কথা রইল দাদা। গিয়েই আমি টাকাটা তুলে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। এখানকার পোষ্ট আপিসে মিনুর নামে রেখে দেবেন। ছেলে আপনিও দেখুন, আমিও দেখি। আমাদের কাছারিতে একটি ছেলে কাজ করে, বেশ বংশ ভাল, কুলীন, তবে লেখাপড়া তেমন জানে না, এই যা খুঁৎ। মেয়ের সঙ্গে সাজন্ত হবে না।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "সব রকমই দেখা যাক, তার পর যেখানে সুবিধা হয়।"

ষ্টেশনে তাঁহাদের অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল, কারণ মৃগাঙ্কের শত আগ্রহেও ট্রেনখানা এক মিনিটও আগে আসিল না। তাঁহাকে ট্রেনে উঠাইয়া তবে মল্লিক-মহাশয় গৃহে ফিরিলেন। সেদিন দুপুরের খাওয়া সারিতে সকলেরই অনেক বেলা হইয়া গেল। ছোট মেয়েরা অবশ্য ঠিক সময়েই খাইতে বসিয়াছিল। তবে টকের মাছ না পাওয়ায় দুঃখে তাহাদেরও খাওয়াটা ভাল করিয়া জমিল না। কর্ত্তা খান নাই বলিয়া গৃহিণী না-খাইয়া বসিয়া রহিলেন এবং মৃণালও কোনও মতেই মামামামীর আগে খাইতে রাজী হইল না।

এক দিনের জন্য দেখা দিয়া মৃগাঙ্ক মৃণালের মনটাকে অনেকখানি উতলা করিয়া দিয়া গেলেন। দুই-তিন দিন সে কেমন যেন বিমনা হইয়া রহিল। তাহার কাজে মন বসে না, পড়ায় মন বসে না। মামীমা পাছে তাহার মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারেন, এই ভয়ে সে শঙ্কিত থাকে। যে-বাপ তাহার প্রায় কোনও ধারই ধারে না, তাহার জন্য মন খারাপ করিলে মামীমার আইনে দণ্ডনীয় হইবার কথা। এই মানুষটি অতিশয় ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী। যাহারা তোমাকে ভালবাসে তাহাদের জন্য নিজের জীবনপাত করিতে দেখিলেও তিনি কিছু বলিবেন না, কিন্তু যেখানে পাওনা কিছু নাই, সেখানে দেওয়ার নামেই তিনি জ্বলিয়া ওঠেন।

কিন্তু এ ভাবটাও দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। পল্লীলক্ষ্মী তাহার মনের উপর যে মায়াজাল রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আবার ধীরে ধীরে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পূজা আসিয়া পড়িল। বাড়ীতে পূজা না থাকিলেও, আমোদ-আহ্লাদ

কিছুরই তাহাদের অভাব হইত না। জমিদার-বাড়ীর পূজা, যাত্রা, কীর্ত্তন সবই যাহাতে গ্রামের ভদ্র ইতর সকল শ্রেণীই প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারে, সদাশয় জমিদারবাবু সেই ব্যবস্থাই করিতেন। মল্লিক-মহাশয় আবার এ-সব ব্যাপারে তাঁহার প্রধান সাহায্যকারী, কাজেই জমিদার-বাড়ীর পূজা এ-বাড়ীর লোকের নিজের ব্যাপারের মতই ছিল। চার-পাঁচ দিন ত বাড়ীতে রান্নাও চড়িত না, কাহারও দু-দণ্ডের বেশী ঘরে দাঁড়াইবারও অবসর হইত না।

বিজয়ার পর কয়টা দিন আবার একটু অবসাদের মধ্যে কাটে, কিন্তু মৃণাল এবার একেবারে নিজের পড়ার মধ্যে ডুবিয়া গেল। আর অবহেলা করিলে চলে না। বাবার আসা, পূজার আনন্দ, প্রভৃতির ছুতায় অনেক দিন ফাঁকি দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

মামীমা তাহার রকম দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "নে, নে, শেষ পড়া প'ড়ে নে। পরের বছর এমন সময় আর পড়তে হবে না।"

মৃণালের বুকের ভিতর যেন ঝাঁৎ করিয়া একটা ধাক্কা লাগিল। সে উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মামীমা? শেষ পড়া হ'তে যাবে কেন?"

মামীমা বলিলেন, "এবার যে তোমার বাপে আর মামাতে একজোট হয়েছেন। আমার কথা এতদিন ঠেলে দিত, এবার মৃগাঙ্কের চোখ ফুটেছে। গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে কিনা? মনে করেছিল বোধ হয় যে তুই সেই সাত বছরেরই আছিস্।"

মৃণাল বলিল, "হ্যাঁ, তাই নাকি আবার কেউ মনে করে?"

মামীমা বলিলেন, "যাই হোক, ডাগরটি হয়েছিস দে'খে তোর বাবার এবার বিয়ে দেবার মত হয়েছে। পরীক্ষার পরই এবার তার

জোগাড় করতে হবে। আমি একলা হাতে পেরে উঠলে হয় এখন।" বলিয়া তিনি আবার নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

মৃণাল যেন একেবারে বিশবাঁও জলের তলায় চলিয়া গেল। পড়ার দিক হইতে মনটা একেবারে ঘুরিয়া গেল। কেন তাহার উপর এ উৎপাত? বিবাহ কোনদিনও করিবে না এমন কোন সংকল্প তাহার ছিল না, কিন্তু পড়াশুনা ভাল করিয়া করিবার. মানুষ হইবার সংকল্পটা বরাবরই ছিল। এমন করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল ছবিখানির উপর কালি মাখাইয়া দিবার বাবার কিই বা দরকার ছিল? বিবাহই যে তাঁহারা কাহার সঙ্গে দিয়া বসিবেন তাই বা কে জানে? মামার উপরই পাত্র-নির্ব্বাচনের ভার পড়িবে নিশ্চয়। তিনি কিছু শহরে ছেলে খুঁজিতে যাইবেন না। এই গ্রামেরই কোন একটা ছেলেকে তাঁহার পছন্দ হইবে। ইহাদের সকলকেই শিশুকাল হইতে মৃণাল দেখিতেছে, কাহাকেও ভাবী পতিরূপে বরণ করিবার সম্ভাবনায় তাহার মনে পুলকের বন্যা বহিয়া গেল না। সকালের পড়াটা সম্পূর্ণ সেদিন মাটিই হইল।

মামীমার ডাকে যখন খাইতে গেল তখনও তাহার মুখ অন্ধকার। মামীমা বলিলেন! "বাবা! এখনও সেই কথাই ভাবছিস্ না কি রে? মেয়ে বড় ক'রে রাখলেই এই সব বিপদ্। আমাদের দশ বছরে ধ'রে বিয়ে দিয়েছে, অত ভাবনাচিন্তা করতে হয় নি। তা এমন কি মন্দ আছি? চিরজন্ম আইবুড়ী থেকে মাষ্টারণীগিরি করতে হ'লেই কি খুব সুখে থাকবি?"

মৃণালের যে জবাবে কিছু বলিবার ছিল না তা নয়। কিন্তু বিবাহের কথা লইয়া মামীমার সঙ্গে তর্ক করিতে লজ্জাও করে, আর সব

কথা তাঁহাকে বোঝানও যায় না। তাঁহার মত একেবারে কাটাছাঁটা, কিছুতেই তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

১১

মৃগাঙ্ক বাড়ী পৌঁছিয়াই মৃণালের কথা সব ভুলিয়া গেলেন না। টাকাটা তুলিয়া সত্য সত্যই মল্লিক মহাশয়ের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "এবার বোনাইয়ের সত্যিই চৈতন্য হয়েছে দেখছি, কি বল গো?"

গৃহিণী বলিলেন, "তাই ত মনে হচ্ছে। তা চক্রবর্ত্তীদের পঞ্চাননের কথা যে বলেছিলে, সে প্রস্তাবটা একটু ওর জ্যাঠার কাছে তোল না। ছেলে বিয়ের যুগ্যি হয়েছে, ওরা আবার কোথায় হট্ ক'রে ঠিক ক'রে বসবে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "যাব একবার কাল সকালে। বুড়োর একটু টাকার খাঁই বেশী, সেই জন্যেই যা ভাবনা, নইলে মেয়ে আর আমাদের কোন্ দিক্ দিয়ে মন্দ?"

গৃহিণী বলিলেন, "মেয়ে কেমন তা আবার আমাদের দেশে কেউ দেখে নাকি? নেহাৎ কানা খোঁড়া না হলেই হল। টাকার থলির দিকেই সকলের নজর, সেই থলিটি ভর্ত্তি রাখতে পার তবেই হয়।"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "ভর্ত্তি করার মাল মশলা ত সহজে জোটে না? ওর বাপ দিয়েছে পাঁচ শ, আমি বড় জোর দু'তিন শ দিতে পারি, এই ত সম্বল।"

গৃহিণী বলিলেন, "দেখ বুড়োকে ব'লে কয়ে ঐতে যদি রাজী করাতে পার। বড় ঠাকুরঝিকে চিঠি লিখবে যে বলেছিলে, তা লিখেছ নাকি?"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "না, লেখা আর হয় নি। সনাতন যাচ্ছিল জয়রামপুরে, তাকে কথাটা একবার ওদের কাছে পাড়তে বলেছিলাম। তাতে গিরিজা বলেছে, 'অবস্থা ত দেখছ বাছা, ওঁর শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, এখন এ সব কথা কইতে গেলে রেগে উঠবেন,।"

গৃহিণী বলিলেন, "যা দিনকাল, নিজের ঘর সামলে ক'টা মানুষ আর আত্মীয়স্বজনের দিকে চাইতে পারে? বড় ঠাকুরঝি কিন্তু আগে আগে মিনুকে খুবই ভালবাসত।"

পাশের ঘরে যে মৃণাল বসিয়া পড়িতেছে, তাহা কর্ত্তা গৃহিণী কেহই খেয়াল করেন নাই, কাজেই গলার স্বরটাও তাঁহাদের স্বাভাবিক পর্দ্দা ছাড়াইয়া নামে নাই। মৃণাল তাঁহাদের সব কথাই শুনিতে পাইতেছিল। এইবার সুরু হইবে তাহার নির্য্যাতনের পালা, হাটে মাঠে সকলের কাছে তাহার রূপগুণের যাচাই, তাহার মনুষ্যত্বের অবমাননা। হিন্দু বালিকার জীবনের এই বেদনাময় অধ্যায়টিকে মৃণাল মনপ্রাণ দিয়া ঘৃণা করিত। কিন্তু অসহায় সে, অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিই বা করিতে পারে? তাঁহারা যে জগৎটাকে একেবারে অন্য দৃষ্টিতে দেখেন। যে কোনও মূল্য দিয়াই হউক, নারীকে একটি পুরুষের গলায় গাঁথিয়া দিতে হইবে, ইহার বাড়া সৌভাগ্য কোনও কন্যার জন্যই তাঁহারা কামনা করেন না। তাহার পর সে পুরুষটি গলার মণি গলায় রাখিল কি ছিঁড়িয়া পদদলিত করিল, তাহা কেহই দেখিতে আসিবে না। অদৃষ্ট ও কর্ম্মফলের স্কন্ধে সকল দায় চাপাইয়া সকলেই সরিয়া দাঁড়াইবে।

পঞ্চানন, সেই চক্রাকার মুখ আর কদম-ছাঁট চুল, তাহার মধ্যে ইহারই ভিতর একটি সূক্ষ্ম টিকি আত্মগোপন করিয়া আছে। তাহার

চেহারাটা মনে করিতেই মৃণালের হাড়ের ভিতর জ্বালা করিতে লাগিল। কোনও দিকের গোঁড়ামিই সে সহ্য করিতে পারে না, তাহা সনাতন-পন্থীরই হউক, কি আধুনিকেরই হউক। পঞ্চানন যে কালে একজন দিগ্‌গজ ধর্ম্মধ্বজী সনাতনপন্থী হইয়া উঠিবে তাহার সবক'টা লক্ষণই তাহার ভিতর বর্ত্তমান। এখনই সে যে রকম লম্বা লম্বা কথা বলে তাহা শুনিলে হাসি সামলানো দায় হইয়া উঠে। মামা কি আর জগতে বর খুঁজিয়া পাইলেন না? ক্ষোভে রোষে মৃণালের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। বাবা এবারে আসিয়া দেখি তাহার ঘোরতর অপকারই করিয়া গেলেন।

ছুটির দিন কয়টাও দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল। দুই-তিন দিন পরেই মৃণাল কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। এবার মনের দুঃখ তাহার যেন দ্বিগুণ হইয়া পাষাণ-ভারের মত বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। কলিকাতা-বাস শেষ হইয়া যাইবে, সেজন্য ত দুঃখ নাই, এই বৃহৎ কারাগার হইতে মুক্তি পাইলেই সে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু চিরদিনের মত অন্য এক নাগপাশ-বন্ধনে না বাঁধা পড়ে এই ভয় অহর্নিশি তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার ব্যথার ব্যথী হইতে পারে এমন একটা মানুষও সে দেখিতে পায় না।

বেলা নয়টা দশটার সময় সে চিনি টিনিকে লইয়া পুকুর ঘাটে স্নান করাইতে গিয়াছে। নিজে সে হয় ঘরে তোলা-জলে স্নান করে, না-হয় শীতের তীব্র দংশন উপেক্ষা করিয়া ভোর বেলায় ঘাটে গিয়া স্নান করিয়া আসে। হাজার লোকের চোখের উপর স্নান করিতে সে পারে না, দশ বৎসর কলিকাতা বাসের ফলে তাহার এই অবনতিটুকু হইয়াছে। পাড়ার লোকে ইহা লইয়া হাসাহাসি করিতেও ছাড়ে না।

ঘাটে তখন অনেকগুলি মেয়ে। কেহ বা স্নান করিতেছে, কেহ কাপড় কাচিতেছে, কেহ জলে তখনও নামে নাই, উপরে দাঁড়াইয়া সখীদের সঙ্গে গল্প করিতেছে। বাতাসের তীব্রতা যেন শাণিত বর্শা-ফলকের মত দেহের এ-পিঠ ও-পিঠ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। তবু এই নারীবাহিনীর অধিকাংশেরই অঙ্গে একের অধিক দ্বিতীয় কোনও বস্ত্র নাই। শাড়ীর আঁচলখানা গায়ে দুই পাক করিয়া জড়াইয়া তাহারা নিশ্চিন্ত।

একটি তরুণী বধূ মৃণালের গরম জামার আস্তিনটায় এক টান দিয়া বলিল, "বাবা, কত জামাজুমিই যে তোরা পরতে পারিস্, হাত পা চলে কি ক'রে?"

মৃণাল বলিল, "কেন গো, জামাটা কি লোহার? হাত চলবে না কেন? তুমি যে কনুই অবধি চুড়ি বালা দিয়ে ভর্ত্তি করেছ, তোমার কি হাত চলছে না?"

বউটির ননদ এতক্ষণ ঘুঁটের ছাই দিয়া দাঁত মাজিতেছিল, সে এবার কুলকুচা করিয়া জল ফেলিয়া বলিল, "ঐ ত, লিখিপড়িদের সঙ্গে কথায় পারবার জোটি নেই। এক কথার উপর দশ কথা বলবে। আচ্ছা, এর পর দেখব লো, কত জামা জোড়া পরিস্।"

মৃণাল বলিল, "তা দেখো এখন, চিরকালই পরব।"

"হ্যাঁ, পরতে আর হয় না, এর পর বুক অবধি ঘোমটা টেনে চলতে হবে।" বলিয়া আর একটি বউ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মৃণাল মনে মনে একেবারে জ্বলিয়া গেল। সব ফুলেই কাঁটা আছে, কোন না কোন সময় তাহা ফুটিবেই হাতে। তাহার এই সুন্দর শান্ত পল্লীজীবনটির মধ্যেও কাঁটা এইখানে, এই মূর্খতা, এই গোঁড়ামি, এই অজ্ঞতা।

কিছু দূরে একটি প্রৌঢ়া রমণী বসিয়া একরাশ পূজার বাসন ধুইতে-ছিলেন। তাঁহার কাছে গিয়া একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মামীমা, তোমাদের বড় বউ ঘোমটা দেয় না গা ?"

প্রৌঢ়া ভারি গলায় বলিলেন, "ঘোমটা দেবে না কেন গা ? এ কি শহুরে বিবি, না বেহ্মজ্ঞানী ? আমাদের ঘরে ও সব খিরিস্তানী চালচলন কেউ হ'তে দেয় না। ছেলেমেয়েদেরও সে শিক্ষা নেই।"

টিনি-চিনিকে এক হ্যাঁচকায় জল হইতে তুলিয়া মৃণাল তাড়াতাড়ি তাহাদের মাথা গা মুছিয়া দিতে লাগিল। তাহার পর তাহাদের ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া, গায়ে ছোট র‍্যাপার দুইটি জড়াইয়া দিয়া, হন্ হন্ করিয়া ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া গেল। চিনি-টিনিও দিদির পিছন পিছন দৌড়িয়া চলিল।

যে বউটি প্রথমে মৃণালের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিয়াছিল, সে বলিল, "দেখেছ মেয়ের দেমাক, মাটিতে পা পড়ে না যেন। দু'খানা বই পড়েছে কিনা, তাই মুখ্যু মানুষের সঙ্গে কথা কইতেও ওর ঘেন্না ধরে।"

তাহার ননদ বলিল, "রেখে দে লো, অমন দেমাক ঢের দেখিছি। কুড়ি বছর বয়স হল, এখনও ধুব্‌ড়ি হয়ে ব'সে আছে, তার আবার দেমাক। মামী-মাগীর গলা দিয়ে ভাত যায় কি ক'রে তাই ভাবি।"

মৃণালকে আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তার মামী বলিলেন, "ওমা, এই গেলি আর এই এলি ? মেয়ে দুটো চান করেনি নাকি ?"

মৃণাল তখনও রাগে ফুলিতেছে, বলিল, "চান যথেষ্ট করেছে। তোমাদের গাঁয়ের আর্য্যনারীদের বক্তৃতার তোড়ে ওখানে কি পাঁচ মিনিটের বেশী দাঁড়াবার জো আছে ?"

মামীমা বুঝিলেন, পঞ্চাননের সঙ্গে সম্বন্ধের কথাটা কিঞ্চিৎ ছড়াই-

য়াছে। হাসিয়া বলিলেন, "তা বাছা, রাগ করলে চলবে কেন? একটা কথা শুনলেই তা নিয়ে মানুষ ভালমন্দ পাঁচটা কথা বলে।"

মৃণাল ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। মামীমাও ত মতে ঐ আর্য্যনারীদের দলে, তাঁহাকে মনের ব্যথা জানাইয়া ত কোনও লাভ নাই? মনের জ্বালা তাহাকে মনেই পুষিয়া রাখিতে হয়। বিবাহ তাহাকে করিতেই হইবে, কয়েক দিন আগে বা পরে, ইহা মৃণাল ভাল করিয়াই জানিত। কিন্তু আর দু-একটা বছর তাঁহারা ইহাকে কি নিষ্কৃতি দিতে পারিতেন না? তার মধ্যে একটু ত সে মানুষের মত হইতে পারিত? আর নিতান্তই যদি এখনই তাহাকে বিদায় করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পঞ্চানন ছাড়া কি পাত্র ছিল না? স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্য, সব কিছুর বিরুদ্ধে এই বয়সেই যার পাঁচ মুখে খই ফোটে, সে মৃণালের মত মেয়েকে যে কতখানি আদর করিবে, তাহা বুঝাই যায়।

সেদিন তাহার মনটা এমন উতলা হইয়া রহিল যে দুপুরে পড়িতেও পারিল না। খানিক চেষ্টা করিয়া, পরে টিনির সহিত কাঁথা গায়ে দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

মল্লিক মহাশয় সেদিন সকালেই কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, ফিরিলেন অনেক বেলা করিয়া। অনাহারে এতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া গৃহিণীর মেজাজটা কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, স্বামীকে দেখিয়াই তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "কোথায় এতক্ষণ বিশ্ব-উদ্ধার করছিলে? তোমার না-হয় না খেলেও চলে, আমরা সারাদিন খাটি খুটি, আমাদের ত দুটি মুখে দিতে হয়?"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "এই জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী গিয়ে কথাবার্ত্তা কইতে কইতে দেরি হয়ে গেল একটু। এক-আধ দিন যদি

বেশী দেরি হয়, তুমি আগে খেয়ে নিলেই পার, আমি তাতে কিছু মনে করি না। তোমার শরীর ত তত ভাল নয়।”

গৃহিণী বলিলেন, “ওসব শিক্ষা আমরা পাইনি বাপু, পাড়াগেঁয়ে মানুষ। নাও, এখন দুটো ভাত খেয়ে কেতাথ কর।”

তিনি ভাত বাড়িতে বসিলেন, মল্লিক মহাশয়ও তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া আসিলেন। খাওয়া আরম্ভ করিয়া কর্ত্তা বলিলেন, “মিনু খেয়েছে ত?”

গৃহিণী তরকারিতে কাঁচালঙ্কা ভাঙিয়া মাখিতে মাখিতে বলিলেন, “হ্যাঁ তাকে খাইয়ে দিয়েছি, ছেলেমানুষ পিত্তি চুঁইয়ে যাবে। ওর ত এ সব অভ্যেস নেই, যদিও আমি ওর বয়সে ছেলের মা হয়েছি।”

মল্লিক মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, “তুমি যে গৌরীদানের গৌরী হয়ে ঘর আলো করেছিলে গো। মিনুর সে তুলনায় বয়স ঢের হয়ে গেল। এখন ভালয় ভালয় বিয়েটা হয়ে যায় তবেই। বুড়োর যা টাকার খাঁই, আর কিছু সে দেখতেই পায় না।”

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি, বললে কি? অনেক টাকা চায় নাকি? তা হলে ত আমাদের অসাধ্য। কথাটা মিনুরও কানে গেছে বোধ হয়, কেমন যেন মনমরা হয়ে আছে। বেশী বড় ক’রে রাখলেই এই সব আপদ্ জোটে। আমাদের হিন্দু গেরস্ত ঘরে বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন ছোটমোট থাকতে থাকতে দিয়ে দেওয়া ভাল। তখন বোঝেও না কিছু, মা বাপে যেখানে ধ’রে দেয় সেখানেই হাসতে হাসতে যায়।”

মল্লিক-মহাশয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “কেন, মনমরা কেন? এখানে বিয়ে হয় এ কি তার ইচ্ছে নয়? তা হলে ত মুস্কিল। বড় হয়েছে, নিতান্ত অনিচ্ছায় বিয়ে দিলে ত সুখী হবে না।

আমি সেটা মোটেই চাই না। কিসে বুঝলে যে মনমরা হয়ে আছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "কিসে আবার বুঝব, তার ধরণেই বুঝেছি। ও কি আর আমায় মুখ ফুটে কিছু বলবে? তেমন মেয়েই নয়। কিন্তু আমার হাতে মানুষ, আমি বুঝি সব। এখন বিয়েতেও ওর মত নেই, আর পঞ্চাননকেও বোধহয় দেখতে পারে না।"

মল্লিক-মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন গো, ছেলে ত মন্দ নয়? সুস্থ, সবল, স্বভাবচরিত্রও ভাল। দেখতে অবশ্য খুব সুপুরুষ নয়, তা আমাদের মেয়েও ত তেমন ডাক্‌সাইটে সুন্দরী কিছু নয়।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও যেমন! চেহারার জন্যে মোটেই নয়। পঞ্চানন শহুরেপানা সাহেবিয়ানা দেখতে পারে না, তাই নিয়ে শক্ত শক্ত কথা বলে, তাইতে মিনির রাগ। পাড়াগাঁয়ে বিয়ে দিতে হলে, তেমন ভাবে মানুষ করতে হয় বাপু। তোমরা মেয়েকে একেবারে সাহেবী শিক্ষা দিচ্ছ, অথচ বিয়ে দিতে চাও একেবারে গোঁড়া হিন্দুর ঘরে, কাজেই মেয়ের মনে খট্‌কা বাধে, পছন্দ হয় না। এত বড়টি করাই অন্যায় হয়েছে, তা গরীবের কথা বাসি না হলে ত মিষ্টি লাগে না? বোঝ এখন।"

কর্ত্তা চিন্তিত মুখে নীরবে খাইতে লাগিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "এখনই অত ভেবে কি হবে? আগে সম্বন্ধই ঠিক হোক, তারপর ও সব ভাবনা। বুড়ো কি বললে শুনি?"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "সে ত বলে দুবছরের পড়ার খরচ দিতে, না হয় এক হাজার টাকা পণ থোকে ধ'রে দিতে। আমাদের সম্বল সব কুড়োলে বাড়ালে হাজার বারো শ' বড় জোর হবে; সবই যদি পণ দিতে

যায় তা বাকী খরচ কোথা থেকে আসবে ? মেয়েকেও শুধু শাঁখাশাড়ী দিয়ে বিদায় করতে পারব না।"

গৃহিণী বলিলেন, "হুঃ, হাজার টাকা পণ! মিন্সে নিজের বড় ছেলের বিয়েতে কত হাজার টাকা পেয়েছিল ? ন' গাঁয়ের রায়েদের মুরোদ কত তা আর আমি জানি না ? তাদের মেয়ে ত ? হাতে দুগাছা রুলী আর গলায় সরু বিছে হার পরিয়ে মেয়ে পার করেছে। পণ চার শ' টাকা দিয়েছে, তাও বছর ঘুরতে। আমি আর জানি না ? আমার স্বামীর বাপের বাড়ী ঐ গাঁয়ে।"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে কথারও উল্লেখ একটুখানি করেছিলাম, তোমার কাছে শুনেছি কিনা ? তাতে বললে, মেয়ে অতি সুন্দরী, অমন একটি এ গাঁয়ে নেই, তাই দে'খে গিন্নী জেদ ধরাতে এ বিয়ে হয়েছে,না হ'লে শীতলের জন্যে নাকি অনেক ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল, দুহাজার অবধি দর উঠেছিল।"

গৃহিণীর খাওয়াই বন্ধ হইয়া গেল। বাঁ হাতখানা গালে রাখিয়া বলিলেন, "মা, মা, মা, কোথায় যাব ? ঐ মেয়ে হল গাঁয়ের সেরা সুন্দরী ? আমি আর ওকে দেখিনি ? এই একরত্তি থেকে দেখছি। ও যদি সুন্দরী, তা হ'লে আমি পদ্মিনী।"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "আমার চোখে ত বটেই। তা বাপের বয়লী বুড়োকে সে কথা আর বলি কি ক'রে ?"

গৃহিণী বলিলেন, "না গো না, ঠাট্টার কথা না। কথায় বলে, যার রান্না খাইনি সে বড় রাঁধুনী, আর যাকে চোখে দেখিনি, সে বড় রূপসী; তা এ যে চোখে দেখা মেয়ে। এই মাঠ কপাল, কুৎকুতে চোখ, চুলও নেই মোটে। রূপের মধ্যে গায়ের চামড়াটা একটু শাদা, এই আমাদের টিনির মত হবে। মিনুর তার চেয়ে ঢের ছিরি আছে, যে

যাই বলুক। চুল খুললে ত হাঁটুর নীচে পড়ে। বলব ত আমি বুড়ীকে!"

কর্ত্তা বলিলেন, "থাক, এখনই কিছু বলতে যেয়ো না। আমিই আগে একটু কথাবার্ত্তা ভাল ক'রে কয়ে দেখি, তার পর দেখা যাবে।"

খাওয়া দুজনেরই চুকিয়া গেল। কর্ত্তা উঠিয়া গেলেন, গৃহিণী বাসন উঠাইয়া জায়গা নিকাইয়া তবে রান্নাঘর ছাড়িয়া বাহির হইলেন। শুইবার ঘরে গিয়া দেখিলেন মৃণাল তখনও অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিজের মনে বলিলেন, "এর চেয়ে নাকি কুসমী ছুঁড়ী দেখতে সুন্দর! কি বা কথার ছিরি। একে সাজিয়ে দাঁড় করালে রাজবাড়ীতে বিয়ে দেওয়া যায় না?"

মৃণাল উঠিয়া দেখিল, বেলা একেবারে গড়াইয়া গিয়াছে। চিনি, টিনি উঠিয়া গিয়াছে কখন। বাহিরে তাদের হুড়াহুড়ির শব্দে আর মিহি গলার চীৎকারে দিক্ কাঁপিয়া উঠিতেছে। রান্নাঘরের কাজও বিধিমত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মৃণাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখে মুখে জল দিয়া রান্নাঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "বেশ মামীমা, আমাকে ডাকতে হয় না? এতখানি বেলা গড়িয়ে গেল, আজ সকাল থেকে আমার পড়াশুনা কিছু যদি হল।"

মামীমা বলিলেন, "শুয়ে ঘুমোচ্ছিস্ দে'খে আর ডাকলাম না। কোনো দিন ত দুপুরে ঘুমোস্ না, ভাবলাম শরীর হয় ত ভাল নেই। তা দুদিন বাদে ত বোর্ডিঙে গিয়ে উঠবি, তখন খুব ঠেসে পড়িস্।"

মৃণাল বলিল, "যাব ত দুদিন পরে, কিন্তু কার সঙ্গে যাব তা কিছু মামাবাবু ঠিক করলেন? একলা ত আর তোমরা আমায় যেতে দেবে না? যদিও তা যে না পারি তা নয়, ক'ঘণ্টারই বা পথ?"

মামীমা ডালে কাঠি দিতে দিতে বলিলেন, "তা আর পার না,

তোমরা না পার কি? খালি সব চেয়ে সোজা জিনিষগুলোই তোমাদের গলায় বেধে যায়। যাক্ গে, একলা তোমায় যেতে হবে না, অনেক লোক শনিবারে গাঁ থেকে যাচ্ছে। সকলেরই ইস্কুল-কলেজ ঐ সময়েই খুলবে ত? সেই সঙ্গে যাবি এখন। কিছু খেতে দেব তোকে? সেই কোনকালে খেয়েছিস্।”

মৃণাল বলিল, “না, এখন আর আমি কিছু খাব না, কেমন যেন মাথাটা ভার ভার ঠেকছে।”

মামীমা বলিলেন, “ভিজে চুলে শুলি যেমন! ঐ এক কাঁড়ি চুল শুকোবে কখন? একটু চা ক'রে খা না, মাথাটা হালকা লাগবে।”

মৃণাল চায়ের মোটেই পক্ষপাতী নয়। কিন্তু আজ শরীরটা সত্যই ম্যাজ ম্যাজ করিতেছিল, হয় ত চা খাইলে কিছু উপকার হইতে পারে। বলিল, “আচ্ছা, দাও একটু গরম জল ক'রে, চা-ই খাই এক পেয়ালা।”

এ বাড়ীতে চা তৈয়ারিও এক মহাপর্ব্ব। চায়ের সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নাই। পাথরের একটা চুম্‌কি ঘটিতে গরম জলে চা ভিজাইয়া মৃণাল বাটি চাপা দিয়া রাখিল।

চিনি, টিনি ও খোকার মাথার টনক অমনি কেমন করিয়া নড়িয়া উঠিল, তিনটি মূর্ত্তিই অবিলম্বে রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া উপস্থিত। অগত্যা সকলকেই চা দিতে হইল। কেহ পাথরবাটি, কেহ বা পানের ডিবার খোল, কেহ বা গেলাস লইয়া বসিয়া গেল। চা মৃণালের ভাগ্যে অল্পই জুটিল। ছেলেমেয়েদের পেটেও যে বেশী গেল তাহা নয়। মেঝের উপর ঢেউ খেলিতে লাগিল বেশীর ভাগ। সবাইকে নড়া ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া গৃহিণী বক্‌বক্ করিতে করিতে ঘর পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

মৃণাল ট্রেনের অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছে। ষ্টেশনে একটা ওয়েটিংরুম্ আছে অবশ্য, কিন্তু সেখানে বসিতে মৃণালের ভাল লাগে না, তাহার উপর আজ সে ঘরখানিও স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকায় ভরিয়া উঠিয়াছে। পল্লীগ্রামটিকে মৃণাল যতই ভালবাসুক, পল্লী-বাসিনীদের সঙ্গ সব সময় ভালবাসে না। তাহারা এক কথা বই কথা জানে না, আর সেই কথাটি শুনিতেই এখন মৃণালের সবচেয়ে আপত্তি। বিবাহের নামে এখন তাহার গায়ে জ্বর আসে।

বিবাহ ব্যাপারটার প্রতিই যে তাহার কোনও বিতৃষ্ণা ছিল তাহা নয়, থাকিবার কথাও নয়। স্বাভাবিক মনোবৃত্তি লইয়াই সে জন্মিয়াছিল, স্বাভাবিক ভাবেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং বিবাহের কথা, প্রেমের কথা সে ভাবিয়াছে বই কি? খুবই ভাবিয়াছে। তাহার তরুণ জীবনে অধীশ্বররূপে যে মানুষটি দেখা দিবে তাহার মূর্ত্তি স্বপ্নে জাগরণে কত রকম করিয়া দেখিয়াছে, কল্পনায় কত ভাবে তাহাকে বরণ করিয়াছে। কিন্তু এখন এ সব কথা ভাবিতে গেলেই তাহার হৃৎকম্প হয়। পঞ্চাননের বৃহৎ চক্রাকার মুখ, আর খোঁচা খোঁচা চুল যেন তাহার চোখের সম্মুখে জগৎসংসারকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। এই বিবাহটা দিবার জন্য মল্লিক মহাশয় যেন আদাজল খাইয়া লাগিয়া গিয়াছেন। কত কথা হইতেছে তাহার ঠিকানা নাই, দর-কষাকষির বিরাম নাই। ব্যাপারটা এমন কুৎসিত যে ভাবিতেই মৃণালের বুকের ভিতরটা ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া উঠে।

আজ লোক চলিয়াছে বিস্তর, বেশীর ভাগই কলিকাতার যাত্রী, ট্রেনে জায়গা পাইবে কি না সেও এক ভাবনা। সারাপথ হয়ত

দাঁড়াইয়াই যাইতে হইবে। দাঁড়াইতেও আপত্তি নাই, কিন্তু পুরুষদের গাড়ীতে যাইতে হইলেই সর্ব্বনাশ, কারণ দেখা যাইতেছে যে স্বয়ং পঞ্চাননও চলিয়াছে এই ট্রেনে। কাজেই মৃণালের মনে ভারের উপর আরও ভার চাপিয়া উঠিয়াছে।

মল্লিক মহাশয় একবার ভাগ্নীর কাছে আসিয়া বলিলেন, "এই রোদে আর কত দাঁড়াবি? ঘরে বসবি চল্ না। আজ আবার ট্রেন কিছু লেট্ হয়েছে শুনছি।"

মৃণাল বলিল, "না মামাবাবু, আমি এইখানেই থাকি। ঘরে ঢুকলে বক্‌বক্ ক'রে সবাই আমার মাথা ধরিয়ে দেবে।"

তাহার মামাবাবু বলিলেন, "তা হ'লে এই ছাতাটা নে। যা ভীড়, গাড়ীতে উঠতে পারলে হয়। অনেক লোক যাচ্ছে, এই গাঁ থেকেই, পরে আরও কত উঠবে কে জানে? বীরু আবার তেমন চট্‌পটে মানুষ না, জায়গা-টায়গা ক'রে দিতে পারবে কি না কে জানে। নেহাৎ জায়গা না পাস্ ত বিছানাটার উপরেই বসিস্।"

মৃণাল গ্রামেরই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে চলিয়াছে, তাঁহার নাম বীরেন্দ্র ভৌমিক। ভদ্রলোক বৃদ্ধা মাতাকে গঙ্গাস্নান করাইতে লইয়া চলিয়াছেন।

মৃণাল বলিল, "দেখি কি করতে পারি, আগে ট্রেনে উঠি ত?"

ট্রেন লেট্ হইল বটে, তবে খুব বেশী নয়, মিনিট পনেরো মাত্র। থামিবার আগেই দেখা গেল, ট্রেনের প্রত্যেকটি কামরা যাত্রীতে ভর্ত্তি। মাত্র এক মিনিট ট্রেন থামে, অত দেখিয়া শুনিয়া উঠিবার সময় কোথায়? সুতরাং বাক্স-বিছানা লইয়া যাত্রীর দল প্রথম যে গাড়ী পাইল, তাহাতেই উঠিয়া পড়িবার জন্য পাগলের মত ঠেলাঠেলি

করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের ভয়াকুল চীৎকারে, শিশুর কান্না জায়গাটা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

মৃণালকে মল্লিক-মহাশয় একরকম কোলে করিয়াই গাড়ীর ভিতর ঠেলিয়া দিলেন। তাহার সহযাত্রী ভদ্রলোক তখন বৃদ্ধা মাতা আর তাঁহার অসংখ্য পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি লইয়াই ব্যস্ত, মৃণালের তদারক করিবার তাঁহার সময় নাই।

কামরাটি যাত্রীতে এবং তাহাদের লটবহরে একেবারে মাল গাড়ীর রূপ ধারণ করিয়াছে। বসিবার জায়গা ত নাইই, ভাল করিয়া দাঁড়াইবারও স্থান নাই। এ উহার গায়ে ধাক্কা দিতেছে, মানুষের গায়ে বাক্স পেঁট্‌রা উল্টাইয়া পড়িতেছে, এবং তাহা লইয়া তুমুল কলহ বাধিয়া যাইতেছে।

মৃণালের বাক্স বিছানা জান্‌লা গলাইয়া কোন মতে ঢুকাইয়া দিয়া তাহার মামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, বসবার জায়গা একটু হবে না?"

মৃণাল কিছু বলিবার আগেই বীরেন্দ্র বলিলেন, "তা ত হবেই না। আমরা না-হয় দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু বুড়ীকে নিয়ে কি করি?"

মৃণাল এককোণে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ীতে যাত্রী অবশ্য অসংখ্য এবং জিনিষপত্রও তদধিক, কিন্তু সবাই যদি নিজের নিজের জিনিষ যথাসাধ্য গুছাইয়া রাখে এবং অন্য লোকগুলির সুবিধা-অসুবিধার কথা একটু ভাবে, তাহা হইলে ইহারই মধ্যে একটু ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু সে শিক্ষা ত পল্লীবাসী বাঙালী কোনও দিন পায় নাই, মেয়েরাই যেন আরও বিশেষ করিয়া পায় নাই। বসিতে পাইলেই তাহারা শুইতে চায়, কোনও মতে নিজের এবং নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের জন্য বেশী জায়গা দখল করিতে পারাই যেন তাহাদের

জীবনের এখন একমাত্র ব্রত। নিজের স্বজাতীয়াদের ব্যবহার দেখিয়া মৃণালের হাড়ে হাড়ে জ্বালা করিতে লাগিল।

অবশ্য, বাঙালী পুরুষগুলিও যে খুব চমৎকার কিছু ব্যবহার করিতে-ছিলেন, তাহা নহে। যে যেখানে পারিয়াছে গায়ের জোরে নিজে আগে চাপিয়া বসিয়াছে, সঙ্গের স্ত্রী-কন্যা দাঁড়াইয়া আছে কি না সে দিকেও দৃষ্টি নাই। দৃষ্টি থাকিবেই বা কেন? গৃহে যাহারা চিরকাল দাসীর ব্যবহার পাইয়া সন্তুষ্ট, বাহিরে তাহারা সম্মানের আশা রাখিবে কি করিয়া? ভয়ে সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া, যে যেখানে পারে দাঁড়াইয়া আছে।

গাড়ী ছাড়িতে মৃণাল নিজে বাক্সের উপর বিছানাটা চাপাইয়া দিয়া সঙ্গের বৃদ্ধাকে বলিল, "আপনি এখানে বসুন।"

তিনি ত বসিতে পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন অবশ্য, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত পথ কি ক'রে দাঁড়িয়ে যাবে মা?"

মৃণাল বলিল, "লোকজন নামবেও ত মাঝে মাঝে, তখন জায়গা ক'রে নেব।" অবশ্য লোক যে নামিবে কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল।

পঞ্চানন এই গাড়ীতেই উঠিয়াছে, এবং একটা বেঞ্চে বেশ গদিয়ান হইয়া বসিয়া আছে। মৃণালের ইচ্ছা করিতেছিল তাহার টিকিটা ধরিয়া তাহাকে টানিয়া দাঁড় করাইয়া দেয়। ভগবান্, এই মানুষটা যেন তাহার জীবনে ধূমকেতুর মত উদিত না হয়।

পঞ্চানন বসিয়া বসিয়া মৃণালকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেছিল। সে আদর্শ সনাতনপন্থী, বিবাহের আগে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরকে চোখে দেখাকেও অনাচার বলিয়া প্রচার করে। তাই বলিয়া ভাবী বধূ যদি সামনে দৈবগতিকে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে দোষ

কি? দেখিতে ত বেশ ভালই লাগে। গায়ের রং শ্যামবর্ণ, ইহা ভিন্ন মেয়েটির চেহারার বিশেষ কোনো খুঁৎ নাই। তরুণ লাবণ্যমণ্ডিত মুখখানি নয়নাভিরাম, শরীরের গঠন চমৎকার, গ্রীবার উপর বিপুল কবরী এলাইয়া পড়িয়াছে, খুবই সুকেশী হইবে। ইহার সহিত বিবাহটা ঘটিয়া গেলে পঞ্চানন নিজেকে হতভাগ্য মনে করিবে না।

কিন্তু মেয়েটি বোধ হয় অতিরিক্ত স্বাধীনতা-প্রিয়, ধরণ-ধারণ কেমন যেন উগ্র। ইহার ভিতর স্ত্রীসুলভ লজ্জা, নম্রতা বোধ হয় কমই। তাহা হইলে উহাকে পথে আনিতে পঞ্চাননকে বেগ পাইতে হইবে। তা নিজের ক্ষমতার উপর পঞ্চাননের আস্থা আছে। বিরক্তির ভাবটা মেয়েটির মুখে মানাইয়াছে মন্দ নয়, কিন্তু হিন্দু কুলনারীর বিরক্ত হওয়াও উচিত নয়, ইহাই ছিল পঞ্চাননের মত। তাহারা সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত সকল অবস্থাতেই শান্ত থাকিবে। যদিও মৃণাল এখনও তাহার পত্নী হয় নাই, তবু পঞ্চাননের মনে তাহাকে হিন্দুনারীর আদর্শ সম্বন্ধে একটা উপদেশ দিবার ইচ্ছা ক্রমেই মাথা তুলিতে লাগিল।

পরের ষ্টেশনটায় কপালগুণে সত্যই তিন-চার জন মানুষ নামিয়া গেল, কিন্তু উঠিয়াও পড়িল আরও চার-পাঁচ জন। কাজেই বসিবার জায়গা পাওয়ার আশা মৃণালের মনে উদিত হইয়াই মিলাইয়া গেল। যাহারা উঠিল তাহারা সব কয়জনই পুরুষ, কাজেই ঠেলাঠেলি করিয়া তাহাদের মধ্যে বসিয়া পড়াও সম্ভব নয়।

মৃণাল যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল তাহারই পাশের বেঞ্চে দুইজন যুবক আসিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু একজন চারিদিকে চাহিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মৃণালের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আপনি বসুন।"

মৃণাল বসিল, বসিতে পাইয়া বাঁচিয়াই গেল। যে যুবকটি নিজে

উঠিয়া তাহার বসিবার জায়গা করিয়া দিল, তাহার দিকে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল। মানুষটা বেশ সুশ্রী, রং ফরশা, লম্বা একহারা চেহারা। মুখের ভাব বেশ মার্জ্জিত, সপ্রতিভ। কলিকাতাবাসী মানুষ বোধ হয় পাড়াগাঁয়ে বেড়াইতে আসিয়া থাকিবে। সহযাত্রিণীদের সম্বন্ধে অত্যুগ্র কৌতূহল নাই, আবার তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অচেতনও নয়।

উল্টাদিকের বেঞ্চ হইতে পঞ্চানন হঠাৎ হাঁক দিয়া উঠিল, "বিম্‌লে, এদিকে আয়।"

ছেলেটি ভীড় ঠেলিতে ঠেলিতে পঞ্চাননের কাছে অগ্রসর হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব্যাপার? বসবার জায়গা আছে?"

পঞ্চানন মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "হাঁ, জায়গা ত কাঁদছে। জায়গা পেয়েও ত গাধার মত ছেড়ে দিলি।"

কথাগুলা অবশ্য সে নীচুগলাতেই বলিল, কিন্তু এতটা নীচু নয় যে গাড়ীর অন্য লোকে শুনিতে পাইল না। মৃণাল মনে মনে বলিল, "গাধা ও ত নয়, গাধা তুমি।"

বিমল নামক ছেলেটি বলিল, "তা কি করব, অতগুলি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

পঞ্চানন বলিল, "তা থাক্‌ না দাঁড়িয়ে। আমাদের দেশের মেয়েরা ত মেমসাহেব নয় বা মোমের পুতুলও নয়। পাঁচ মিনিট দাঁড়ালেই মুচ্ছো যাবে না।"

বিমল বলিল, "না, তা কি যায়? তুমি থাক না ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে, কেমন আরাম লাগে দেখি।"

পঞ্চানন বলিল, "খুব পারি, তোমাদের মত শহুরে 'গ্যালাণ্ট্‌' নই। নিজেও গ'লে যাই না, অন্যের গ'লে যাবার ভয়ও রাখি না।"

বিমল বলিল, "তা বেশ কর। এখন ঐ ঢাকাই জালাটি বাক্সটার উপর থেকে নামাও দেখি, আমি ওটার উপরে বসি। এক জালা ভর্ত্তি ক'রে কি নিয়ে যাচ্ছ? গঙ্গাজল নিশ্চয়ই নয়, সে ত কলকাতাতেই পাওয়া যায়।"

পঞ্চানন বলিল, "এই পাঁচ সেরি হাঁড়িটা হল ঢাকাই জালা? তুমি একেবারে মূর্ত্তিমান্ চাঁদের আলো-খেকো ক্যাল্‌কেশিয়ান্ কবি। ওতে ঘি আছে হে শ্রীমান্, বাড়ীর তৈরী গাওয়া ঘি।"

বিমল বলিল, "সাধে এই বয়সে অত ভুঁড়ি তোর। এই পাঁচ সের ঘি একলা গিলবি?"

মেয়েদের যতই অবজ্ঞা করুক, তাহাদের সামনে নিজের দৈহিক সমালোচনাটা পঞ্চাননের ভাল লাগিল না। মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "খাবার লোক ঢের আছে হে। গত বারে যে গুড় এনেছিলাম গ্রাম থেকে, তাতে তুমিও ভাগ বসিয়েছিলে।"

বিমল বলিল, "তা বসাব বই কি? বয়সে না-হয় তুই এক বছরের মাত্র বড়, তাই ব'লে সম্পর্কে যে মামা তা ভুলব কেন? যা আনবি তা আগে ভাগ্নেকে দিবি, তারপর নিজে গিলবি। এত বড় আর্য্যবংশাবতংস হয়ে এটা জানিস্ না?"

গাড়ীর ভিতরের যাত্রীর দল নিজেদের সুবিধা-অসুবিধার চিন্তায় ব্যস্ত। কেহ কাহারও কথার দিকে বড় একটা মন দিতেছে না। মৃণালের কানে কিন্তু পঞ্চানন এবং বিমলের সব কয়টি কথাই আসিয়া পৌঁছিতেছে। অত মন দিয়া তাহাদের কথা শুনিবার তাহার যে বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল তাহা নয়, তবু কেমন যেন শুনিতে ইচ্ছা করিতেছে। ঐ ছেলেটি সত্যই পঞ্চাননের ভাগ্নে নাকি, না শুধু গ্রাম সম্পর্কেই মামা বলিয়া ডাকে? চেহারা বা চালচলনে কোথাও ত বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই?

ট্রেনটা বিশেষ জোরে চলে না, সারা মাটি মাড়াইয়া চলিয়াছে যেন। পনেরো মিনিট, কুড়ি মিনিট পরে পরে এক-একটি ছোট ষ্টেশন, কোথাও বা এক মিনিট দাঁড়ায়, কোথাও বা দুই মিনিট, কিন্তু ইহারই ভিতরে যাত্রী উঠানামার হুড়াহুড়ি অবিশ্রাম চলিতেছে। দেশশুদ্ধর যেন এই ট্রেনে কলিকাতায় গিয়া না পৌছিলেই নয়।

মৃণালের সহযাত্রী বীরেন্দ্রবাবু ঘণ্টা দুই দাঁড়াইয়া থাকিয়া এতক্ষণে পঞ্চাননের বেঞ্চেই একটু বসিবার জায়গা করিয়া লইলেন। তাহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, তোমাদের ভরসাতেই আমাদের বেরনো। গেঁয়ো মানুষ আমি, তোমাদের কলকাতার হালচালও জানি না, রাস্তাঘাটও চিনি না। আমাকে একটা হিন্দু হোটেল টোটেল দে'খে উঠিয়ে দিও, আর এই মল্লিক মশায়ের ভাগ্নীটিকে তার বোর্ডিঙে পৌছে দিও।"

পঞ্চাননের অত পরোপকার করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সোজাসুজি অস্বীকারই বা করে কি করিয়া? তাহার উপর মৃণালকে বোর্ডিঙে পৌছাইয়া দিবার প্রস্তাবটা তাহার কাছে মন্দ লাগিল না। বলিল, "আচ্ছা, তা আমি আছি, বিমল আছে, ভাগাভাগি ক'রে হয়ে যাবে এখন।"

মৃণাল মনে মনে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহাকে বোর্ডিঙে প্ৰৌছাইয়া দিবার ভারটা যদি পঞ্চানন গ্রহণ করিতে চায়, তাহা হইলেই হইয়াছে আর কি? যে যাহাই মনে করুক, সে বীরেনবাবুদের সঙ্গ ছাড়িতেছে না। বিমল ফিশ্ ফিশ্ করিয়া বলিল—"Lucky dog."

পঞ্চানন গম্ভীর হইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, "যা যা, জ্যাঠামি করতে হবে না।"

মৃণাল দেখিয়া শুনিয়া আরো হাড়ে হাড়ে জলিয়া গেল।

যাহা হউক, গড়াইতে গড়াইতে ট্রেন অবশেষে গিয়া কলিকাতায় পৌঁছিল। লোকের ভীড়, আর কুলীর চীৎকারে চক্ষু কর্ণ ব্যথিত হইয়া উঠে। যাত্রীদের জিনিষপত্রের উপর যেন ডাকাত পড়িল। একেবারে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড।

বীরেন্দ্র ভীতকণ্ঠে বলিলেন, "দেখো বাপু, শেষ রক্ষা কোরো। আমি ত এই বুড়ো মানুষকে সামলাব, না জিনিষপত্র দেখব, কিছু ঠিক পাচ্ছি না।"

পঞ্চানন তখন নিজের ঘিয়ের হাঁড়ি লইয়াই ব্যস্ত। অজাত কুজাতকে তাহা ছুঁইতে দিবার তাহার ইচ্ছা নাই, কিন্তু অত বড় হাঁড়ি সামলাইয়া আর কিছু করাও শক্ত। সে হাঁকিয়া বলিল, "ওরে বিম্‌লে, তোর সঙ্গে ত কিছু জিনিষপত্র নেই, তুই এদিকে একটু দেখ্ না।"

বিমল অগ্রসর হইয়া আসিল। বলিল, "আপনাদের জিনিষ কোন্‌গুলো আমায় একটু দেখিয়ে দিন। ওঃ, এই ক'টা মাত্র? আচ্ছা, আপনারা নেমে পড়ুন, কিছু ভাবতে হবে না। আমি সব গুছিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। দেখবেন, সাবধান!"

অতিকায় এক ট্রাঙ্ক মাথায় করিয়া একটা মুটে মৃণালের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। বিমল ব্যস্ত হইয়া তাহাকে টানিয়া সরাইয়া না দিলে মাথায় মৃণালের নিদারুণ আঘাত লাগিত। ভয়ে সঙ্কোচে তাহার বুকের ভিতরটা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

বীরেন্দ্র আঁৎকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি সব্বনেশে জায়গা রে বাবা, প্রাণ নিয়ে বেরতে পারলে যে বাঁচি।"

তাঁহার বৃদ্ধা মাতা প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিলেন, "এ কোথায় নিয়ে এলি রে বাবা! বেঘোরে প্রাণটা যাবে নাকি?"

তাঁহার ছেলে চটিয়া গিয়া বলিলেন, "গেলেই ত ভাল। মা গঙ্গার কোলে হাড় ক'খানা রেখে যেতে বড় যে সাধ হয়েছিল, বোঝো এখন ঠেলা।"

বিমল বলিল, "না, না, কোনো ভয় নেই, এখনই ভীড় ক'মে যাবে। একটু এ পাশে স'রে দাঁড়ান। এ রকম ভীড় এখানে বারো মাসই হচ্ছে, কখনও কাউকে মারা যেতে ত দেখিনি। একটু লোকের ঠেলা কমুক, তারপর বেরিয়ে গিয়ে গাড়ী করা যাবে।"

পঞ্চানন ঘিয়ের হাঁড়ি দুই হাতে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "এদিকে, এদিকে। এইখান দিয়ে বেরিয়ে এস।"

বিমল বলিল, "আমরা ঠিক বেরচ্ছি, তুমি তোমার ঘিয়ের জালা সামলাও।"

লোকের ভীড় পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যে অনেকখানিই কমিয়া গেল। বিমল সকলকে লইয়া অগ্রসর হইল, বৃদ্ধাকে অভয় দিয়া বলিল, "আর কোনো ভয় নেই, এবার ক্রমে রাস্তা পরিষ্কার হতে থাকবে।"

পঞ্চানন তখন প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। বীরেন-বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "একখানা গাড়ীতেই হয়ে যাবে বোধ হয়? হিন্দু হোটেল শিয়ালদ'র দিকে অনেকগুলি আছে, আমিও সেই পাড়ায় থাকি।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "আগে মিনুকে পৌঁছে দি, তারপর আমরা যেদিকে হয় যাব। তোমার বোর্ডিং কোন্ দিকে মা?"

মৃণাল বলিল, "কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীটে।"

বিমল বলিল, "তা হলে অনেকখানি এগিয়ে যেতে হবে। যাই হোক্, গাড়ী ত করি আগে।"

অনেক হাঁকাহাঁকি দরাদরির পর গাড়ী একখানা ঠিক হইল, জিনিষপত্র সমেত সকলকে তাহাতে উঠাইয়া দিয়া বিমল বলিল, "আমি আর অনর্থক এতে ঠাশাঠাশি ক'রে উঠি কেন? এরপর পঞ্চানন মামাই সামলাতে পারবে।"

পঞ্চাননের এ প্রস্তাবে বেশ সম্মতিই ছিল, কারণ ঠেলাঠেলি টানা-হিঁচড়ার কাজ ত হইয়া গিয়াছে, আর এখন বিমলকে দরকার কি? কিন্তু বীরেনবাবু আবার বাদ সাধিলেন, বলিলেন, "তোমরা দুজনেই চল হে, মাকে নিয়ে একজন হোটেলে নেমে যেও, আর একজন আমার সঙ্গে মিনুর বোর্ডিংএ চল। বুড়ো মানুষ, তাঁকে আর ঘোরাব না, বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।"

গাড়ী চলিল। সার্কুলার রোডে অনেকগুলিই হিন্দু হোটেল দেখা গেল। বিমল একটির ম্যানেজারকে চেনে বলিল, সুতরাং বীরেনবাবুর মা এবং তাঁহাদের লটবহর লইয়া তাহাকেই সেখানে নামিতে হইল। অনেকখানি হাল্কা হইয়া গাড়ী এবার মোড় ঘুরিয়া মৃণালের বোর্ডিংএর পথে চলিল।

১৩

পঞ্চাননের সামনাসামনি বসিয়া থাকিতে মৃণালের অসোয়াস্তির সীমা ছিল না। কিন্তু কিই বা করা যায়? এইটুকু পথ এই উৎপাত সহ্যই করিতে হইবে।

পঞ্চানন সারাপথ বক্‌বক্ করিতে করিতে চলিয়াছে। প্রৌঢ় স্বগ্রামবাসী বীরেনবাবুকে পাইয়াই যে তাহার এত দিল্ খুলিয়া গিয়াছে তাহা নয়, মৃণালকে কথাগুলি শোনানোই যে তাহার আসল উদ্দেশ্য তাহা বুঝিতে মৃণালের বাকী নাই।

পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিল, "এই আপনার প্রথম এখানে পদার্পণ নাকি, বীরেন-কাকা?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "না বাবা, আরও বার-দুই এসেছি বই কি। তবে তোমাদের যা আজব সহর, যখনই দেখি মনে হয় নূতন।"

পঞ্চানন বলিল, "তা বটে, দেখলে চোখে ধাঁধাঁ লাগে। এই-সব মোহে প'ড়েই না সব মানুষ গ্রাম ছেড়ে এখানে এসে জোটে? এসে তারপর মরে আর কি? এ ত আমাদের দেশের জিনিষ নয়, একেবারে পশ্চিমের আমদানী ব্যাপার। এখানে ধর্ম্ম রক্ষা ক'রে চলতে পারে ক'টা মানুষ?"

বীরেনবাবু ভালমানুষ, তিনি বলিলেন, "সে ত ঠিক কথাই। এখানে সারাক্ষণ ছত্রিশ জাতের সঙ্গে মেশামেশি, খাবার জিনিষে সব ভেজাল।"

পঞ্চানন বলিল, "আহা, ওগুলো ত হ'ল ছোট কথা। খাবার-দাবারে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলা সহজেই যায়, কিন্তু আদত মানুষের মনটাই যে যায় কলুষিত হয়ে! তাদের ভাবনাচিন্তা সব বিলাতী ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায়। আমাদের দেশের আদর্শ দেখতে দেখতে তাদের মন থেকে মুছে যায়।"

মৃণাল ভাবিল, 'আচ্ছা এক গোভূতের পাল্লায় পড়া গেছে। এখন শিক্ষিতা মেয়েদের সমালোচনা না জুড়লেই বাঁচি।'

পঞ্চাননের সেই ইচ্ছাটাই বোধ হয় ছিল। তাহার মনে নারীত্বের কি উজ্জ্বল আদর্শ যে বিরাজ করিতেছে তাহা মৃণালকে জানাইয়া দেওয়া দরকার। হয়ত অদূর-ভবিষ্যতে এই মেয়েই তাহার গৃহলক্ষ্মী হইয়া বিরাজ করিবে।

কিন্তু বীরেনবাবু তখন পঞ্চাননের বক্তৃতা শুনিতে ব্যস্ত ছিলেন না।

তিনি সারাপথ যাহা দেখেন তাহারই পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া পঞ্চাননকে বারবার বাধা দিতে লাগিলেন, কাজেই তাহার বক্তৃতা বিশেষ জমিল না। দেখিতে দেখিতে গাড়ীও মৃণালের বোর্ডিঙে আসিয়া দাঁড়াইল।

জিনিষপত্র সমেত তাহাকে নামাইয়া দিয়া বীরেনবাবু বলিলেন, "আমরা এখন ট্রামে ফিরতে পারি না? আবার হোটেল অবধি গাড়ী ক'রে গেলে অনেক ভাড়া লাগবে।"

পঞ্চানন বলিল, "তা বাসে যেতে পারি। ট্রামে ত আবার জিনিষ নিতে দেবে না। কিন্তু বাসে ত মুচি-মুদ্দফরাস সবাই উঠছে, কাউকে না বলবার জো নেই, ঘিটা সঙ্গে রয়েছে কিনা? তার চেয়ে চলুন একখানা রিক্শ ভাড়া করা যাক, ওতে বেশী খরচ পড়বে না।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "যা ভাল বোঝ তাই কর, বাবা।"

দুইজনে রিক্শ করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। বীরেনবাবুকে তাঁহার হোটেলে নামাইয়া দিয়া পঞ্চানন এক মুটের মাথায় নিজের জিনিষপত্র চাপাইয়া, ঘিয়ের হাঁড়িটা হাতে করিয়া নিজের মেসের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

বিমল এতক্ষণ বৃদ্ধাকে আগলাইয়া বসিয়াছিল। বীরেনবাবু ফিরিয়া আসাতে সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বৃদ্ধা এতক্ষণ বসিয়া তাহার সঙ্গে অনর্গল কথা বলিয়াছেন এবং গোটা তিন আত্মীয়তার সূত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন।

বিমল বলিল, "এখন তবে আসি।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "আসি বললে চলবে না বাপু, খোঁজখবর রাখতে হবে। তোমাদের ভরসাতেই আসা। মায়ের গঙ্গাস্নান, কালীঘাট দেখানো, এ সব ক'রে দিতে হবে।"

বিমল বলিল, “আমার আবার পরীক্ষার বছর। আচ্ছা দেখি, কাল আসব একবার। পঞ্চুমামা আসবে না?”

বৃদ্ধা বলিলেন, “পঞ্চা? ওকে দিয়ে কখনও কারও উপকার হবে না। তুমি দাদা দয়া ক’রে আমার গঙ্গাচানটি করিয়ে দাও। নয়ত আমার বোনঝির শ্বশুরবাড়ী এখানে, তাদের বাসাটি যদি খুঁজে দাও তাহলে সেখানেই যাই। এ হোটেলে-মোটেলে আমাদের পোষায় না। কে যাচ্ছে কে আসছে তার ঠিক নেই।”

বিমল বলিল, “ঠিকানা বললে এখনই বাসা খুঁজে দিতে পারি।”

বৃদ্ধা বলিলেন, “ঠিকানা ত জানি না দাদা। তবে জামাইয়ের নাম কিশোরীমোহন রায়, খুব বড় সরকারী কাজ করে, তাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে ট্রাম যায়।”

বিমল ভাবিল, হইয়াছে আর কি? এ যে গ্রামোফোনের সেই রেকর্ডের অবস্থা! যাহা হউক, বলিল, “আচ্ছা খুঁজে দেখব। আমি আসি তবে। ম্যানেজারকে ব’লে গেলাম ভাল ক’রে আপনাদের দেখাশোনা করবে।”

বিমল বাহির হইয়া নিজের মেসের দিকে চলিল। বীরেনবাবুর মায়ের পাল্লায় পড়িয়া অনেক রাত হইয়া গেল। অবশ্য, তাঁহার সাদাসিধা গ্রাম্য কথাবার্ত্তা বিমলের খুব যে খারাপ লাগিতেছিল তাহা নয়। কলিকাতাবাসীদের অতিআধুনিক কথাবার্ত্তা মাঝে মাঝে তাহার কাছে বড় নিরস ও বিস্বাদ লাগিত, মধ্যে মধ্যে নিজের ছোট গ্রামখানির জন্য মন কেমন করিত। বীরেনবাবু তাহাকে যেমন ধরিয়া পড়িয়াছেন তাহাতে বিমলকে রোজই অন্ততঃ একবার তাঁহাদের খোঁজ করিতে যাইতে হইবে। কিশোরীমোহন রায়ের বাড়ীটা বাহির করিতে পারিলে মন্দ হইত না। ঐ হোটেলে বসিয়া বৃদ্ধার মনে ত

একতিলও শান্তি থাকিবে না। গঙ্গাস্নানের পুণ্যও বুঝি বা মাঠে মারা যায়। পঞ্চুমামা হয়ত উক্ত ভদ্রলোকের ঠিকানা জানিলেও জানিতে পারে। কাল সকালে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে স্থির করিয়া বিমল নিজের মেসে ঢুকিয়া পড়িল।

বিমল সত্যই পঞ্চাননের ভাগ্নে হয়, যদিও সম্পর্কটা খুব নিকট নয়। তবে দুইজনেরই জন্মভূমি গ্রাম দুটি কাছাকাছি, এবং সম্প্রতি দু-জনেই কলিকাতায় থাকিয়া পড়িতেছে বলিয়া দেখাশোনা সর্ব্বদাই হয়। বিমল বাল্যে পিতৃহীন, মা এখনও বাঁচিয়া আছেন। তিনি গ্রামের বাড়ীতেই থাকেন। জমিজমা অতি সামান্য আছে, তাহাতে কায়ক্লেশে তাঁহার একটা মানুষের পেট চলে। বিমলকে নিজের খরচ বেশীর ভাগ ট্যুশনি করিয়া চালাইতে হয়, এক কাকা গোটা-দশ টাকা সাহায্য করেন।

সে সামনের বৎসর বি-এ পরীক্ষা দিবে। পাস যদি করে তাহা হইলে যে কি করিবে, তাহা এখনও স্থির করে নাই। স্কলারশিপ পাইলে আবার পড়িতে পারে, কিন্তু তাহা পাওয়া না-পাওয়ার কোনও স্থিরতা নাই। হয়ত চাকরির চেষ্টা করিতে হইবে, কিন্তু চাকরির বাজারের অবস্থা দেখিয়া কোনও ভরসা হয় না। যাহা হউক, পাঁচ ছয়-মাস পরে এ-ভাবনা ভাবিলে চলিবে, সম্প্রতি পাস করার ভাবনাটাই ভাবা দরকার।

পঞ্চানন বয়সে তাহার চেয়ে এক বৎসরের বড়, কিন্তু পড়ে অনেক নীচে। তাহার কারণ বহু বৎসর পর্য্যন্ত সে নবদ্বীপের টোলে পড়িয়া পণ্ডিত হওয়ার চেষ্টায় ছিল। তাহাদের সাংসারিক অবস্থাও সচ্ছল, চাকরি কখনও করিবে না ইহাই স্থির ছিল। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি তাহার বিন্দুমাত্রও আস্থা নাই, সুতরাং সে-সব দিকে

যাইবার সে কখনও চেষ্টা করে নাই। হঠাৎ একটা মোকদ্দমায় হারিয়া গিয়া তাহাদের সবচেয়ে ভাল ও বড় তালুকখানি বেহাত হইয়া গেল। অগত্যা তখন তাহাকে অর্থকরী বিদ্যার দিকে মন দিতে হইল। বয়স তাহার প্রায় চব্বিশ, এবার সে আই-এ দিবে। ইতিমধ্যেই ভাল পণ সহযোগে বিবাহ করিয়া নষ্ট তালুক ফিরাইবার চেষ্টাও চলিতেছে। হাজার-খানিক টাকা হইলেই হয়। দুঃখের বিষয়, যে, পল্লীগ্রামে এমন শাঁসাল শ্বশুর পাওয়া খুবই শক্ত। নগদ টাকা কাহারও বেশী থাকে না। আর পাড়াগাঁ ভিন্ন শহরে পঞ্চাননের মহিমা বুঝিবে কে যে কন্যাদান করিবে? সে নিজেও অবশ্য কলিকাতার মেয়ে বিবাহ করার বিন্দুমাত্রও পক্ষপাতী নয়।

বিমল যে-মেসে থাকে তাহাতে খরচ খুবই কম। পঞ্চাননকেও সে সেই মেসে থাকিতে বলিয়াছিল, কিন্তু জাত যাইবার ভয়ে সে এখানে থাকে নাই। নিজে সে বাসা করিয়া থাকে, স্বপাকে রাঁধিয়া খায়। চেনাশোনা এক ভদ্রলোকের বাড়ীর চিলা কোঠায় একটি ঘর ভাড়া করিয়া সে সংসার পাতিয়াছে। তাহারই পাশে টিন দিয়া ঘিরিয়া তাহার রান্নাঘর। ছাদের উপরেই বিশুদ্ধ গঙ্গাজলের ট্যাঙ্কটা থাকাতে পঞ্চাননের খুব সুবিধা হইয়াছে। অনেকে তাহাকে ভয় দেখায় বটে, কিন্তু ভয় সে পায় না।

বিমল ক্লান্ত হইয়াই পড়িয়াছিল। সুটকেশটা খাটের তলায় ঠেলিয়া দিয়া, বিছানাটা খুলিয়া পাতিয়া সে সোজাসুজি ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার রুমমেট দুইজন আসিয়া প্রচুর চেঁচামেচি করিয়া তাহার ঘুম না ভাঙাইয়া দিলে রাতটা তাহার অনাহারেই কাটিয়া যাইত।

সকালে উঠিয়া চা খাইয়া সে ভাবিতে লাগিল একবার বাহির

হইবে, না পড়িতে বসিবে। অবশেষে বাহিরই হইল। সোজা পঞ্চাননের বাড়ী গিয়া অনেক ধাক্কাধাক্কি করিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল, বলিল, "এই বুঝি আর্য্য-পুঙ্গবের আচার রক্ষা? তোমাদের না ভোর তিনটেয় ওঠা নিয়ম?"

পঞ্চানন হাই তুলিতে তুলিতে বলিল, "তাই উঠি ত সচরাচর, কাল ক্লান্ত হয়ে পড়ায় বেশী ঘুমিয়েছি। তা বোস্, আমার এখানে চা-টা নেই কিন্তু।"

বিমল বলিল, "ভাবনা নেই, চা খেয়ে এসেছি। তুমি কি খাবে, গঙ্গাজল?"

পঞ্চানন খড়ম পায়ে দিতে দিতে বলিল, "না, দুধ খাই সকালে।"

বিমল বলিল, "সাধে কি আর এই বয়সে এমন বিশাল ভুঁড়ি? মামী এসে চ'টে যাবে কিন্তু। আজকালকার মেয়েরা অমন নধর দেহ পছন্দ করে না।"

পঞ্চানন গরম হইয়া উঠিল। বলিল, "মামী যিনি আসবেন, তিনি বেশী আধুনিকা না হন তা আমি দে'খে নেব।"

বিমল বলিল, "কই আর দেখছ? ভাবী মামী কে যে হবেন, তা ত এক রকম আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে। গ্রামে থাকতে মায়ের কাছে শুনেছিলাম, কাল ত চোখেই দেখলাম। তিনি বেশ পুরোমাত্রায় আধুনিকা হবেন, তোমার ভাবনা নেই, এবং প্রথম নম্বরেই তোমার ভুঁড়ি এবং টিকি সংশোধন ক'রে দেবেন।"

পঞ্চানন বলিল, "যা যাঃ, ঝড়ের আগে কুটি নাচে। কোথায় কি তার ঠিক নেই। এখনও কিছু আসলেই ঠিক হয় নি।" কিন্তু বিমলের কথায় খুব যে সে রাগিয়াছে তাহা মনে হইল না। মোটের উপর মৃণালের সহিত তাহার বিবাহ হইবে ভাবিতে তাহার ভালই লাগে।

বিমল বলিল, "কি আসলে ঠিক হয় নি? কত টাকা মারবে তাই না? ওসব ঠিক হয়ে যাবে এখন। মেয়ে পছন্দ করেছ ত?"

পঞ্চাননের শাস্ত্র অনুযায়ী নিজে মেয়ে পছন্দ করা অন্যায়, কাজেই সে বলিল, "জ্যাঠামশায় জ্যাঠাইমা ওঁরা পছন্দই করেছেন।"

বিমল বলিল, "তাই নাকি? তোমার নিজের কেমন লাগল?"

পঞ্চানন বলিল, "অত খবরে তোর কাজ কি? আমি যাকে বিয়ে করব সে হবে তোর গুরুজন, তার সম্বন্ধে অত ছ্যাবলামি ভাল না।"

বিমল বলিল, "ঢের হয়েছে, থাম ত বৎস। যেমন গুরুজন তুমি, তোমার স্ত্রী হবে তেমন। যাই হোক, আমি নেমন্তন্ন খেতে পেলেই খুশী। আচ্ছা কিশোরীমোহন রায়ের বাড়ী কোথায় বলতে পার? বীরেনবাবুর মাসতুতো ভগ্নীপতি। বৃদ্ধা ভার দিয়েছেন আমায় তাঁর বাড়ী খুঁজে দিতে।"

পঞ্চানন বলিল, "ঠিক বলতে পারি না, তবে সুকিয়া ষ্ট্রীটে থাকেন তিনি। কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীটের মোড়টার কাছাকাছি।"

বিমল বলিল, "আচ্ছা, খুঁজে নেব। তবে তুমি এখন দুদু খাও, আমি উঠি।"

পঞ্চাননের বাড়ী হইয়া সে চলিল সুকিয়া ষ্ট্রীটের দিকে। একেবারে জামাইয়ের খোঁজখবর সহ উপস্থিত হইতে পারিলে বৃদ্ধা খুশী হইবেন। তাঁহাদের স্কন্ধে একবার মাতাপুত্রকে তুলিয়া দিতে পারিলে বিমলও দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। পঞ্চুমামা যে পরোপকার করিতে এক পাও বাড়াইবে, এমন ত কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

অনেক ঘোরাঘুরি করিয়া তবে সে ভদ্রলোকের বাড়ী আবিষ্কার করিল। আগমনের কারণ শুনিয়া কর্ত্তা তাহাকে খাতির করিয়া

বসাইলেন। এধার-ওধার তাকাইয়া পরিবারটিকে বিমলের সম্পন্নই বোধ হইল। মাসীমাকে পুত্রসহ দিন-কয়েক স্থান দিতে ইঁহারা কাতর হইবেন না বোধ হয়। অবশ্য যদি সে রকম ইচ্ছা থাকে।

মাসীমার আগমন-সংবাদে অন্দরমহলে একটু চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে বুঝা গেল। দুই-তিনটি ছেলেমেয়ে আসিয়া তাহাকে উঁকি মারিয়া দেখিয়া গেল। তাহাকে চা খাইতেও একবার অনুরোধ করা হইল, সে সেটা সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করিল। অবশেষে কর্তা ভিতর বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন যে গৃহিণী গাড়ী করিয়া এখনই গিয়া মাসীমাকে লইয়া আসিতে চান। বিমল যদি অনুগ্রহ করিয়া কর্ণধারের কাজটা সারিয়া দেন ত ভাল, কারণ তাঁহার আবার আপিসের বেলা হইয়া যাইবে।

বিমলের আপত্তি ছিল না। তবে আরও মিনিট কুড়ি তাহাকে বসিতে হইল। এর কমে বাংলা দেশের স্ত্রীলোক বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন না। গৃহিণী তবু মধ্যবয়স্কা, তাঁহার সঙ্গে ছোট দুটি মেয়ে চলিল, তাহাদের চুলের ফিতা বাঁধা ও মুখে পাউডার মাখার ঘটাতেই দেরিটা বেশী করিয়া হইল।

অবশেষে সকলে বাহির হইয়া পড়িলেন। ইঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচয় না থাকাতে বিমল আর গাড়ীর ভিতরে বসিল না, উপরে কোচম্যানের পাশেই বসিল।

হোটেলে পৌঁছিতে বেশী দেরি হইল না। বৃদ্ধা ত বোনঝিকে দেখিয়া বর্ত্তাইয়া গেলেন। পুণ্য করিতে আসিয়া এমন অদ্ভুত জায়গায় উঠিয়া তাঁহার আর অস্বস্তির সীমা ছিল না। বিশেষ করিয়া এখানকার ঝি, চাকর, ঠাকুর প্রভৃতিকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছিলেন।

ইহারা যে সকলেই মুচি বা মুদ্দফরাস, জাত ভাঁড়াইয়া কাজ করিতেছে, এই মহাভয় তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

বোনঝির চিবুকে হাত দিয়া বারবার হস্তচুম্বন করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, "ভাগ্যিস্ এলি মা, বাঁচলাম। এখানে জলটুকু খেতে সুদ্ধ ভরসা হচ্ছিল না।"

তাঁহার বোনঝি বলিলেন, "মাসীমা, গুছিয়ে নাও, এখনি বেরিয়ে পড়ি। ওঁর অফিসের গাড়ী, বেশীক্ষণ ত বসতে পারব না?"

গুছাইবার জিনিষ বড় বেশী কিছু ছিল না, ঘটিবাটি আর খান-কয়েক কাপড়। তাহাই পুঁটলি বাঁধিয়া, হোটেলের বিল চুকাইয়া দিয়া তাঁহারা নামিয়া আসিলেন। বিমল তাঁহাদের সঙ্গে নামিয়া আসিয়া বলিল, "আমি তাহ'লে আসি এখন?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "একেবারে পালালে চলবে না, বাবা। দেখা করতে হবে রোজ। আমি এখানকার কিছু জানি না, চিনি না।"

বিমল বলিল, "নিশ্চয়, দেখা করব বই কি?"

বীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ঠিকানাটা কি, বাবা?"

বিমল ঠিকানা বলিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল। তাহার ট্রাম আসিয়া পড়িয়াছে। পড়াশুনা তাহার ভাল হইতেছে না, স্কলারশিপের আশা রাখিলে আরও ভাল করিয়া পড়া উচিত। কিন্তু নানা দিকের নানা ঝঞ্চাট আসিয়া জুটে, সে কিছুই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না।

সমস্ত সকালটা ত কাটিয়া গেল পরোপকার করিতে। এক মাসের মধ্যে তাহার টেষ্ট পরীক্ষা। কলেজেও হাজিরা দিতে হয়, না হইলে তাহার পার্সেণ্টেজ থাকে না।

স্নানাহার করিয়া কলেজ-যাত্রী ট্রামে সে উঠিয়া বসিল। বিগত আটচল্লিশ ঘণ্টার নানা ছবি বারবার তাহার মনে উঁকি দিয়া যাইতে লাগিল।

কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া চা খাইয়া সে পড়িতে বসিল। কিন্তু একটানা বেশীক্ষণ পড়া তাহার অদৃষ্টে ছিল না। বিকাল একটু গড়াইতে-না-গড়াইতে আবার ডাক আসিয়া পৌঁছিল। বৃদ্ধা পরশু ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন, আজ হইতে যোগাড় না করিলে কি করিয়া হইবে? সব ভার বোনঝির উপর ছাড়িয়া দিলে সে কি মনে করিবে? তাঁহাদেরও যথাসাধ্য করা উচিত।

বিমল প্রথমে একটু বিরক্ত হইল। এই রকম কাজে-অকাজে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে তাহার পড়াশুনা হইবে কি প্রকারে? তাহার পর আবার কি মনে করিয়া চিঠি লিখিয়া জানাইল যে সে রাত্রে গিয়া দেখা করিবে। কয়েকজন ব্রাহ্মণ এবং বাড়ীর গোটাবারো-তেরো লোক খাওয়াইবার জন্য একদিনের আয়োজনই যথেষ্ট, তাহার বেশী সময়ের দরকার নাই।

১৪

বীরেনবাবুর মা বোনঝির বাড়ী আসিয়া খানিকটা নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু এখানেও তাঁহার মনে পূরাপূরি স্বস্তি আসিল না। শহরে বাস করিয়া ইহারাও যেন কি রকম হইয়া গিয়াছে। বোনঝি সুরবালা ততটা কিছু বদলাইয়া যান নাই, কিন্তু জামাই, ছেলেমেয়ে সবাই যেন একটু কেমন কেমন। সকালে টেবিলে বসিয়া সবাই চা খায়। রান্নাঘরে পৈতাপরা ঠাকুর আছে বটে, কিন্তু যে চাকরটা গরম জল

প্রভৃতি লইয়া আসে, সে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ নয়। টেবিলও ত অশুদ্ধ, শুধু জল দিয়া মুছিলেই কি আর পরিষ্কার হয়? ছোট মেয়ে দুইটা ত সারাদিন জুতা পায়ে দিয়া হট্‌ হট্‌ করিয়া বেড়ায়, গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যায়, আর হি হি করিয়া হাসে। মোটের উপর বৃদ্ধার এ পরিবারটাকে বিশেষ পছন্দ হইল না। তবে যাহা করিতে আসিয়াছেন তাহা ত করিয়া যাইতে হইবে।

সন্ধ্যার পর বিমল আসিতেই তিনি তাহাকে ধরিয়া পড়িলেন। কাল বাজার করিয়া দিতে হইবে এবং মৃণালকে আনিয়া দিতে হইবে। মৃণালের সাহায্য পাইলে রান্না তিনিই সব করিতে পারিবেন, ক'জনই বা মানুষের ব্যাপার? ইহার জন্য আবার ঠাকুর কেন? দেশে কত বড় বড় ব্যাপারে তাঁহারা দুই জায়ে রাঁধিয়া দিয়াছেন তাহার অনেকগুলি ইতিহাস তিনি বিমলকে শুনাইয়া দিলেন। সুরবালাও কিছু সাহায্য অবশ্যই করিবেন, তবে তাঁহার শরীর ভাল নয়, তাই মাসীমা তাঁহার উপুর বেশী চাপ দিতে চান না। পরিবেষণের ভার যদি পঞ্চানন আর বিমল নেয় তাহা হইলে ব্যাপারটা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হয়।

বিমলের এমন ভাবে দুইটা দিন আগাগোড়া মাটি করার অবস্থা নয়, অথচ ইঁহাকে তাহা বুঝানোও ত যায় না? পরীক্ষা যে কি পদার্থ, তাহার জন্য কতখানি আদা জল খাইয়া পরিশ্রম করিতে হয়, কিছুই ত ইঁহার জানা নাই? সে অসম্মতি জানাইলে তিনি ধরিয়া লইবেন যে কাজ করিতেই ছেলেটার আপত্তি। অগত্যা তাহাকে রাজী হইতেই হইল।

বীরেনবাবু বলিলেন, "অমনি যাবার মুখে আমাদের পঞ্চুকেও খবর দিয়ে যেও, সেও যেন কাল একবার আসে।"

বিমল মুখে বলিল, "আচ্ছা।" মনে মনে বলিল, 'সে ত অমনি এল ব'লে। তোমাদের জন্যে ত তার ঘুম হচ্ছে না। তবে বোর্ডিঙের দূতের কাজটা তাকে দিলে এলেও আসতে পারে।'

ফিরিবার পথে সে পঞ্চাননকে ডাক দিয়া গেল, কিন্তু তাহার দেখা পাইল না। অগত্যা একটা চিঠি রাখিয়া দিয়া গেল যে সে যেন কাল গিয়া বীরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে। কি প্রয়োজন সেটার আর কিছু উল্লেখ করিল না।

পরদিন সকালে চা খাইয়া সে সোজাসুজি সুকিয়া ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইল। বীরেনবাবু বাহির হইয়া আসিতেই জিজ্ঞাসা করিল, "পঞ্চুমামা আসেন নি?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "কই, এখন অবধি ত এসে পৌছায় নি।"

বিমল বলিল, "আসবে এখন খানিকক্ষণের মধ্যেই। সকালে তার নানা হাঙ্গাম, পূজোপালি ঢের করতে হয়, সব শেষ না ক'রে ত বেরতে পারে না? তা বাজারটা কি এখনই ক'রে দেব, না বিকেলে হ'লে চলবে?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "দেখি মাকে জিজ্ঞেস ক'রে তিনি কি বলেন।"

তাঁহার মা বলিলেন, "বাজার বিকেলের মধ্যেই হ'লে চলবে, আমরা রাত্রে তরকারিগুলো কুটে রাখব এখন। তবে গিন্নুকে এখন নিয়ে এলে হয়। চাল, ডাল, মশলা সব বাছতে হবে, আরও কাজ আছে, খানিক ক'রে রাখত, আমিও একটা কথা কইবার লোক পেতাম।"

বিমল বলিল, "তাহ'লে আপনি আমার সঙ্গে চলুন, আমি একলা গেলে ত হবে না?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "তা চল। এখান থেকে গাড়ী ক'রে যাব? খরচের ত আর শেষ নেই।"

বিমল বলিল, "এখান থেকে ট্রামেই যাই। ওখানে গিয়ে গাড়ীও করা যেতে পারে, আর উনি যদি ট্রামে আসতে আপত্তি না করেন, তাহ'লে ট্রামেই ফেরা যেতে পারে।"

বীরেনবাবুর মা বলিলেন, "কাপড়চোপড় নিয়ে আসে যেন, দুদিন থাকতে হবে ত?"

বিমল আর বীরেনবাবু বাহির হইয়া পড়িলেন। বোর্ডিঙে পৌঁছিয়া শুনা গেল আজ দেখা করিবার দিন নয়, প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর অনুমতি ছাড়া দেখা করা যাইবে না।

বীরেনবাবু হতাশ হইয়া বলিলেন, "তাহলে কি করা যাবে, বাবা?"

বিমল বলিল, "একখানা চিঠি লিখুন না লেডী প্রিন্সিপ্যালের নামে। লিখুন যে বিশেষ প্রয়োজনে আমরা দেখা করতে এসেছি।"

শিক্ষিতা এম্-এ পাস মহিলাকে চিঠি লেখা বীরেনবাবুর চৌদ্দ পুরুষে অভ্যাস নাই। তিনি বলিলেন, "তুমি লিখে দাও, বাবা। আমি না হয় নামটা সই ক'রে দিচ্ছি। আমি পাড়াগেঁয়ে মানুষ, কি লিখতে কি লিখব।"

অগত্যা বিমলই চিঠি লিখিয়া দারোয়ানের হাতে ভিতরে পাঠাইয়া দিল।

মৃণাল তখন সবে স্নান সারিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় ছোট একটি মেয়ে আসিয়া বলিল, "তোমার ডাক পড়েছে মিনুদি, বিভাদির ঘরে।"

এখন যে কি কারণে তাহার ডাক পড়িতে পারে তাহা আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে মৃণাল বিভাদির ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্লেটখানা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া মৃণালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁদের তুমি চেন ?"

মৃণাল বিমলের নাম দেখিয়া অত্যন্ত অবাক্ হইয়া গেল। বিমল কি কারণে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চায় ? মনের ভিতর তাহার একটা মৃদু পুলকশিহরণ খেলিয়া গেল।

শিক্ষয়িত্রীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "হ্যাঁ, চিনি বই কি ? এঁদের সঙ্গেই আমি এবার কলকাতায় এসেছি।"

বিভাদি বলিলেন, "ও, আচ্ছা, তা হ'লে তুমি দেখা করতে পার।" মৃণালের ভিজিটার্স লিষ্ট বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না, তাহার মামা বলিয়া দিয়াছিলেন যে সে নিজের গ্রামের যে কোনও লোকের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিবে তাহারই সঙ্গে যেন তাহাকে দেখা করিতে দেওয়া হয়।

দেখা করিতে যাইবার আগে মৃণাল একবার ড্রেসিংরুমে ঘুরিয়া গেল। চুলটা ভাল করিয়া আঁচড়াইয়া লইল। ভিজা চুল বাঁধিবার উপায় নাই, কাজেই খোলাই রহিল। আধ ময়লা, নিতান্ত বাজে একটা মিলের শাড়ী তাহার পরনে, এইটা পরিয়া বিমলের সামনে বাহির হইতে তাহার ইচ্ছা করিল না। একখানা টক্‌টকে লাল পাড়ের তাঁতের শাড়ী পরিয়া, চুলটা আর একবার একটু ঠিক করিয়া লইয়া সে ভিজিটার্স রুমের দিকে চলিল।

ঘরের ভিতর তাহার দুই দর্শনপ্রার্থী বসিয়া। বীরেনবাবুকে ত প্রণাম করিল, কিন্তু বিমল সম্বন্ধে কি করা যায় তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। সত্য বটে ট্রেনে এক সঙ্গে আসিয়াছে, কিন্তু কথাবার্ত্তা কিছুই সে বিমলের সঙ্গে বলে নাই। তাহাকে ঠিক পরিচিত লোকের মত গ্রহণ করা যায় না, অথচ অপরিচিতও ত সে নয় ? কলিকাতার

মেয়েরা এ-অবস্থায় কি করিত তাহা মৃণাল আন্দাজে বোঝে, কিন্তু মৃণালের মনটা এখনও মামামামীর সনাতনপন্থী প্রভাবটা সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। সে যদি বিমলের সঙ্গে এখন পরিচিতের মত কথা বলে তাহা হইলে মামীমা বলিবেন, মৃণালের মনে শহুরে বেহায়াপনার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। আবার একেবারে যদি বিমলকে না-দেখিবার ভান করে তাহা হইলে বিমল কি তাহাকে অভদ্র ভাবিবে না? ভাবিলে অন্যায়ও হইবে না।

যাহা হউক, বিমলই তাহাকে বাঁচাইয়া দিল। মৃণাল ঘরে ঢুকিতেই সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বীরেনবাবুকে প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই মৃণালকে সে নমস্কার করিয়া বলিল, "অসময়ে এসে আমরা হয়ত উৎপাত ঘটালাম, কিন্তু ঠাকুরমা কিছুতেই ছাড়লেন না।"

মৃণাল কি উত্তর দিবে বুঝিতে না পারিয়া একটু হাসিল মাত্র। বীরেনবাবু বলিলেন, "তোমার হয়ত পড়াশোনার অসুবিধে হবে, কিন্তু মা বুড়ো মানুষ, ও সব ত বোঝেন না? তাঁর ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যাপারে তোমাকে চাইই। এখানকার চাকরবাকরের কোনও কাজ তাঁর পছন্দও হয় না, আবার একলা ত সব ক'রে ওঠা সম্ভব নয়! তাই তোমাকে নিতে এলাম। কাল রাত্রির মধ্যেই তোমাকে আবার পৌঁছে দিয়ে যাব। এতে কি তোমার বোর্ডিঙের এঁরা আপত্তি করবেন?"

মৃণাল বলিল, "দেখি ব'লে। আমার আবার কদিন পরেই টেষ্ট পরীক্ষা কিনা, সময় নষ্ট না করাই উচিত। কিন্তু ঠাকুরমা বলছেন যখন, দেখি ওঁদের জিজ্ঞেস ক'রে," বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। আসল কথা, এখনও মৃণালের মন দেশের জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে,

বোর্ডিঙে মন বসে নাই। দু-এক দিন বাহিরে কাটাইয়া আসিতে পারিলে মন্দ কি? পড়ার ক্ষতি একটু হইবে, তা না-হয় হইলই।

মৃণালের কপাল ভাল ছিল। বিভাদির এক জাঠতুতো বোনের বিয়ে শীঘ্রই। কাপড়চোপড় কেনা, গহনাগাঁটি করানো পূরাদমে চলিতেছে। অনেকটা কাজই তাঁহার হাতে। কাজেই বোর্ডিঙের কোন্ মেয়ে কত পড়ার কামাই করিতেছে তাহার ভাবনা অত ভাবিবার তাঁহার সময় ছিল না। মৃণাল কবে ফিরিবে এবং কোথায় থাকিবে, এই বিষয় দু-একটা প্রশ্ন করিয়াই তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

খবরের কাগজে খান-কয়েক কাপড় জামা জড়াইয়া মৃণাল ফিরিয়া আসিল। বীরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিছানা নিতে হবে কি? শীতকালের দিন।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "না, একটা রাতের জন্যে আবার বিছানা কেন? যেমন ক'রে হয় কেটে যাবে। মায়ের সঙ্গেই ত শুতে পারবে।"

বিমল জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী ডাকব কি? না ট্রামেই যেতে পারবেন?"

এবার উত্তর না দিলেই নয়। কাজেই মৃণালকে বলিতে হইল, "না, গাড়ীর দরকার নেই। আমি ট্রামেই যেতে পারব।"

তিনজনে বাহির হইয়া পড়িল। মৃণাল ভিজা চুলটা হাতখোঁপা করিয়া জড়াইয়া লইল, মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল। পল্লীগ্রামে অবিবাহিতা মেয়েদের মাথায় কাপড় দিবার নিয়ম নাই, কিন্তু এখানে ত এই নিয়ম। বীরেনবাবু একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না।

বিমল বলিল, "ওটা আমার হাতে দিন," বলিয়া মৃণালের হাত হইতে কাপড়ের বাণ্ডিলটা টানিয়া লইল। নিজের মনেই ভাবিল, "পঞ্চুমামা দেখলে চ'টে খুন হয়ে যেত।"

তিনজনে গিয়া ট্রামে উঠিয়া বসিল। কয়েক মিনিটেই স্থকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছিয়া তাহারা ট্রাম হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিল। বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সদর দরজায় পা দিলেই হয়, এমন সময় উল্টাদিক্ হইতে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল পঞ্চানন। মৃণালকে এইভাবে রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া আসিতে দেখিয়াই তাহার মুখ ভীষণ গম্ভীর হইয়া গেল। তাও আবার সঙ্গে বিম্‌লে হতভাগা!

মৃণাল তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া হন হন করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। বিমল ছুটিয়া গিয়া তাহার কাপড়ের পুঁটলিটা তাহার হাতে দিয়া আসিল।

আবার বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, পঞ্চানন পেঁচার মত মুখ করিয়া বৈঠকখানার ঘরে একলা বসিয়া আছে। বীরেনবাবু কোথাও কাজে বাহির হইয়াছেন, নয় ভিতরে ঢুকিয়াছেন।

বিমলকে দেখিয়াই পঞ্চানন বলিল, "কি হে ভাগ্নে, সকালবেলাই কোথায় চরতে বেরিয়েছিলে?"

বিমল বলিল, "কোথায় আর চরব, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি। তা তোমার মুখ দে'খে ত মনে হচ্ছে না যে নিজেও না চ'রে এসেছে, এত দেরি কেন?"

পঞ্চানন মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "সকালে আমার অনেক কাজ থাকে জানই ত। 'গ্যালান্ট্রি' করবার লোভে ত খাওয়াদাওয়া পুজো-আচ্চা ছেড়ে ভোরবেলাই ছুটে বেরিয়ে পড়তে পারি না?"

বিমল ভাবিল, 'আহা, বাছার আমার গাছে না-উঠতেই এককাঁদি, দিতে হয় থ্যাবড়া নাকে কিল বসিয়ে।' মুখে বলিল, "তা গ্যাল্যান্ট্রি জিনিষটা জগতে যখন আছে তখন কেউ না করলে চলবে কেন? এতে তোমার মত ধার্ম্মিকরা ব'সে ব'সে পূজো করবার কত অবসর পায় দেখ না?"

পঞ্চানন খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কলকাতা শহরে কি গাড়ীর অভাব পড়েছিল?"

বিমল বুঝিতেই পারিয়াছিল, পঞ্চাননের রাগের আসল কারণ কোন্খানে। একে ট্রাম, তাহাতে সঙ্গে বিমল। মৃণাল যেন ইহারই মধ্যে তাহার সহধর্ম্মিণী হইয়া উঠিয়াছে, এমনই তাহার ধরণ।

সে বলিল, "গাড়ী থাকবে না কেন? কিন্তু ট্রামে উঠলেই বা ক্ষতি কি? গায়ে একটু বাইরের হাওয়া লাগলেই কি কেউ ক্ষয়ে যায়?"

পঞ্চানন বলিল, "ক্ষয়ে যায় কি ম'রে যায় সে কথা তোমার মত মূর্খকে বোঝাব কি ক'রে? আমার মতে কাজটা অন্যায় হয়েছে।"

বিমল বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমার মতে বিন্দুমাত্র অন্যায় হয়নি। আর যিনি এসেছেন, এবং যিনি তাঁকে নিয়ে এসেছেন, দুজনের একজনেরও যখন ট্রাম সম্বন্ধে কোনও আপত্তি নেই, তখন তোমার অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যখন অধিকার হবে তখন খাটিও, এখন এগুলো অনধিকারচর্চ্চা।"

ইহার কোনও সদুত্তর ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া পঞ্চানন চুপ করিয়া থাকিত না। কিন্তু বীরেনবাবু আবার এই সময় বাহির হইয়া আসায় তাহাকে চুপ করিয়া যাইতে হইল। তিনি আসিয়া বলিলেন, "বাবা পঞ্চু, মা তোমাকে দশটি সদ্‌ব্রাহ্মণের নাম করতে বলছেন,

তাঁদের এখনই নেমন্তন্ন ক'রে আসতে হবে। আর বিমল বাবা, তুমি যদি খাওয়া দাওয়া সেরে একবার এস, তাহলে তখন বাজারটা সেরে আসা যায়।"

পঞ্চানন বলিল, "আচ্ছা, দেখছি।" বলিয়া পকেট হইতে কাগজ পেন্সিল বাহির করিয়া ফর্দ করিতে লাগিয়া গেল।

"আচ্ছা, আমি তাহলে নাওয়া-খাওয়া সেরে আসব" বলিয়া বিমল বাহির হইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে মনের বিরক্তিটা খানিক তাহার কাটিয়া গেল। মেয়েটি সত্যই দেখিতে মনোরম, স্বভাবটিও কোমল ও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। কলিকাতার অত্যুগ্র আধুনিকতা তাহার মধ্যে নাই, আবার পাড়াগাঁয়ের জড়ভরত ভাবটাও নাই। পঞ্চুমামার বোধ হয় মেয়েটিকে খুবই ভাল লাগিয়াছে, না হইলে এখন হইতেই তাহার সম্বন্ধে এমন উগ্র সচেতনতা কেন? যা মানাইবে, যেন মর্কটের গলায় মুক্তার হার। বেচারী মৃণাল! মল্লিকমহাশয় কি আর জগতে পাত্র খুঁজিয়া পান নাই? কিন্তু জগতে যোগ্যের সহিত অযোগ্যের মিলন ঢের হয়, বিমল তাহার জন্য হাহুতাশ করিয়া কিছুই করিতে পারিবে না। তবে মেয়েটি কোমল-স্বভাব হইলেও একেবারে মাটির মানুষ নয়, তেজ আছে খানিকটা ভিতরে। পঞ্চুমামার অদৃষ্টে কিঞ্চিৎ ঘোল খাওয়া আছে।

মেসের কাছে আসিয়া বিমল ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল। একটু হাসিয়া নিজের মনকে মৃদু তিরস্কার করিল। সারাটা পথই সে মৃণালের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে। পঞ্চানন জানিলে তাহাকে আস্ত গিলিয়া খাইবে। তাহার মতে মৃণাল এখই বিমলের 'গুরুজন' স্থানীয়া, সেই মত চলা উচিত বিমলের। তা আর কি করা যায়? মনের উপর ত মানুষের হাত নাই?

১৫

এই বাড়ীতে আসিয়া মৃণাল যেন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বোর্ডিং জিনিষটা তাহার ধাতে একেবারে সহ্য হয় না, এতকাল বাস করিয়াও সহিয়া যায় নাই। ভগবান্ জন্মের পরই তাহার ঘর ভাঙিয়া দিয়াছিলেন, তাই যেন ঘরের প্রতি তাহার এমন অদম্য টান। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াও সে একটা সুন্দর পল্লীনীড় ছাড়া কিছুই দেখিতে পায় না, অথচ সেই ঘর বাঁধার সঙ্গীরূপে সে কাহাকে পাইবে, সে জানে না, বেশী ভাবিতে গেলেই তাহার বুক কাঁপিয়া উঠে, অজানা ভয়, অজানা পুলকের দোলায় তাহার মন দুলিতে থাকে।

বীরেনবাবুর মায়ের কাজ করার চেয়ে গল্প করার দিকে ঝোঁক ছিল বেশী। তবে গৃহিণী সুরবালার তাড়ায় কাজও কিছু কিছু হইতে লাগিল। তাঁহার বাড়ীতে দশটা মানুষ খাইতে আসিবে, কিছু ত্রুটি হইলে লজ্জা তাঁহারই হইবে, মাসীমাকে ত আর কেহ চেনে না? কাজেই চাল ডাল বাছা, মশলা বাছা, সুপারি কাটা, ইত্যাদি, গল্পের ফাঁকে ফাঁকে চলিতে লাগিল। বিকালের দিকে বিমল আর পঞ্চানন দুজনেই আসিয়া পৌঁছিল, এবং ফর্দ্দ লইয়া বাজার করিতে যাত্রা করিল। কোথায় কোথায় শুদ্ধ জিনিষপত্র পাওয়া যায়, তাহা দেখাইয়া দিবার ভার লইল পঞ্চানন, দরদস্তুর করিয়া কিনিতে হইল বিমলকে। বীরেনবাবু শুধু পয়সা গুনিয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলেন।

ঝাঁকা মুটের মাথায় জিনিষপত্র চাপাইয়া সন্ধ্যার পর তিনজন ফিরিয়া আসিল। মাছ সকালে কিনিতে হইবে, কাজেই বিমলের আর একবার আসা অনিবার্য্য। পঞ্চানন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "সাড়ে ন'টা দশটার আগে আমি আসতে পারব না।"

বীরেনবাবু কাতরভাবে বলিলেন, "তাই এস অগত্যা। বিমল বাবা, মাছটা তা হলে তুমিই একটু দে'খে কিনে দিও।"

রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত জাগিয়া মেয়েরা তরকারি কুটিল আর পান সাজিল। ছোট দুই মেয়ে রেবা আর সেবা কাজ যত করুক বা নাই করুক, কাজের অজুহাতে পরের দিন স্কুল কামাই করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিল। তাহারাও সমানে রাত জাগিতে প্রস্তুত ছিল, তবে দশটার পর সুরবালা তাড়া দিয়া তাহাদের শুইতে পাঠাইয়া দিলেন। মৃণাল বৃদ্ধার সঙ্গে এক বিছানায় শুইয়া রাতটা কোনো মতে কাটাইয়া দিল।

ভোর হইতে না হইতে সকলকে উঠিতে হইল। স্নান না করিয়া আজ রান্নাঘরে যাইবার উপায় নাই। মৃণালের জন্য সুরবালা তাড়াতাড়ি গরম জলের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, বৃদ্ধা অবশ্য তাহার জন্য অপেক্ষা করিলেন না। স্নানের পর রান্নাঘরে গিয়া খানিকক্ষণ আলোচনা চলিল কে আমিষ রাঁধিবে, আর কে নিরামিষ রাঁধিবে। শেষে মৃণাল লইল আমিষের ভার, বীরেনবাবুর মা ও সুরবালা মিলিয়া বাকি সব করিবেন স্থির হইল।

মাছও দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল। মুটের সঙ্গে সঙ্গে বিমলও ভিতরবাড়ীতে ঢুকিয়া আসিল। বীরেনবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মা, মাছ খুব খাসা পাওয়া গেছে।"

বাড়ীর সব মেয়ে এক জোটে মাছ দেখিতে বাহির হইয়া আসিল। মৃণালও পিছনে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, সত্যই বেশ ভাল মাছ, একেবারে টাট্‌কা।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল, "মাছ দে'খে খুসী হয়েছেন ত ঠাকুমা ?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তা আর হব না ভাই, সুন্দর জিনিষ এনেছ।"

বিমল বলিল, "আচ্ছা, মুড়োটা যেন আমার পাতে পড়ে, আমিই মাছটা খুঁজে বার করেছি। মাছ আপনিই রাঁধবেন ত?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "না, মিনুর উপর মাছের ভার, আমি নিরামিষ রাঁধছি।"

বিমল আর কিছু না বলিয়া মুটেকে পয়সা চুকাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

মৃণাল একটু ভয়ে ভয়েই কাজে নামিল। রান্না করার অভ্যাস যে তাহার নাই তাহা নহে, তবে বাহিরের পাঁচজন লোক খাইবে, রান্না ভাল না হইলে লজ্জার বিষয়। মামীমা সঙ্গে থাকিলে তাহার ভাবনা ছিল না, কিন্তু এখানে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সঙ্কোচ হয়। যাহা হউক এগারোটার মধ্যে সে নিজের কাজ সারিয়া ফেলিল, চোখের দৃষ্টিতে ত রান্না তাহার ভালই বোধ হইল, এখন খাইতে লোকের মুখে কেমন লাগিবে তা কে জানে?

বারোটার মধ্যে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের দল আসিয়া পৌঁছিলেন। পঞ্চানন আসিল তাহাদের দশ পনেরো মিনিট আগে। তাহার পূর্ব্বে সে সকালের কাজ সারিতে পারে নাই।

বাহিরের ঘরে খাইবার জায়গা হইতে লাগিল। বাড়ীর দুইজন চাকর বীরেনবাবু ও বিমলের তত্ত্বাবধানে কাজ করিতে লাগিল এবং পঞ্চানন তদারক করিতে লাগিল বিমলকে।

সবাইকে বসাইয়া বিমল পঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করিল, "পঞ্চুমামা কি এখন বসবে, না পরিবেষণ করবে?"

পঞ্চানন বলিল, "যাতে তোমাদের সুবিধে, বসতেও আপত্তি নেই, পরিবেষণ করতেও আপত্তি নেই।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "পঞ্চু ব'সেই যাক্, বেলা হয়ে যাচ্ছে, এই ক'জন ত লোক, আমি আর তুমিই দিতে পারব।"

বিমল বলিল, "নিশ্চয়, তা হ'লে ব'সে যাও পঞ্চুমামা।"

বাড়ীর মেয়েরা ঘরের দরজা পর্য্যন্ত জিনিষ অগ্রসর করিয়া দিতে লাগিল, এবং বিমলই পরিবেষণ করিতে লাগিল। পঞ্চানন অন্দরের দরজার দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া খাইতে লাগিল। মৃণাল তরকারি, মাছ, দই, মিষ্টি সবই বহন করিয়া আনিতেছিল, কারণ ঠাকুরমা ছোট মেয়েদের হাতে কিছু দিতে চান না। মুখে বলেন, "ছেলে মানুষ, ফে'লে দেবে," কিন্তু আসলে তাহাদের কাপড়-চোপড়ের শুদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ যায় না। কাজেই মৃণালই একে একে সব জিনিষ আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল। পঞ্চাননের মুখে বিরক্তির ভাবটা ক্রমে ভাল করিয়াই ফুটিয়া উঠিল, বিমলের সঙ্গে এ-মেয়ের এত কথা বলা কেন? ইহার শিক্ষা ত ভাল হইতেছে না!

আসলে কথা যা বলিতেছিল বিমলই, মৃণাল শুধু হাসিয়া বা হাঁ-না করিয়াই তাহার উত্তর দিতেছিল। কিন্তু ইহাও পঞ্চাননের চোখে খোঁচা দিয়া তাহাকে বিরক্তিতে ভরপূর করিয়া তুলিল। খাইতেও সে বেশ ভালবাসে, রান্নাও হইয়াছে নানা রকম, কিন্তু সে দিকে সে মন দিতে পারিতেছে কই?

বিমল একবার ভিতরের দরজার দিকে গিয়া বলিল, "মাছ রান্না খুব ভাল হয়েছে, সবাই চেয়ে চেয়ে খাচ্ছে।"

মৃণাল একটু হাসিয়া বলিল, "বাঙালীরা নিরামিষের চেয়ে মাছ এমনিতেই পছন্দ করে বেশী।"

পঞ্চানন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মনে মনে বলিল, "এই ত সেদিন ট্রেনে

দেখা, এরই মধ্যে গল্পের ঘটা দেখ না? এ-মেয়েকে নিয়ে বেগ পেতে হবে।”

খাওয়া চুকিয়া গেল। অতিথিদের দক্ষিণা দেওয়া হইল, পঞ্চানন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইল না। বেশ গম্ভীর ভাবে ট্যাঁকে টাকা গুঁজিতেছে, এমন সময় মৃণাল আবার পান হাতে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চানন আরও গম্ভীর হইয়া সরিয়া গেল। এ-ব্যাপারটা মৃণালের চোখে না পড়িলেই ভাল ছিল, যা সাহেবী মেজাজের মেয়ে।

ইহার পর বাড়ীর ভিতরে ছেলেমেয়ে সকলে খাইতে বসিল, ইহাদের পরিবেষণ করিলেন বীরেনবাবুর মা আর সুরবালা। ইঁহারা সকলকে না-খাওয়াইয়া খাইবেন না। বৃদ্ধা বলিলেন, “বীরুও এই সঙ্গে বসুক না, সে আর একলা খাবে কেন বাইরে?”

গৃহিণী বলিলেন, “হ্যাঁ, ঢের বেলা গেছে, দাদার আর দেরি ক’রে কাজ নেই। ঐ বিমল ছেলেটিকেও ডেকে আন, ও ত ঘরেরই ছেলের মত।”

বিমলকেও ডাকিয়া আনা হইল। এক লাইনে বসিলেন বীরেন-বাবু, বিমল ও বাড়ীর আর একটি ছেলে। অন্য লাইনে বসিল মেয়ের দল। বাড়ীর কর্ত্তা কাজ কামাই করিতে পারেন না, তিনি দশটার মধ্যেই যাহা রান্না হইয়াছিল খাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।

বিমল খায় সাধারণ কলিকাতা-বাসী ছেলেদের মতই। বৃদ্ধা কেবলই অনুযোগ করিতে লাগিলেন, “তুমি ত কিছুই খাচ্ছ না ভাই, তোমাকে শুধু খাটিয়েই মারলাম।”

বিমল বলিল, “আজকালকার ছেলেরা এর চেয়ে বেশী খেতে পারে না, ঠাকুরমা।”

বীরেনবাবু বলিলেন, "কেন, এই যে আমাদের পঞ্চু, সেও ত আজকালকারই ছেলে, বেশ ত খেতে পারে।"

বিমল হাসিয়া বলিল, "ওরে বাপ রে, পঞ্চুমামার সঙ্গে কার তুলনা? আমাদের সাধ্যিও নেই ওর সঙ্গে পাল্লা দেবার।"

মৃণাল মনে মনে বলিল, "না হ'লে আর অমন চমৎকার চেহারা হয়!"

খাওয়া দাওয়া চুকিয়া গেল, বিমল আবার বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা ছিল অতঃপর মেসে ফিরিবার, কিন্তু বীরেনবাবু তাহাকে ছাড়িতে নারাজ। বলিলেন, "দিনটা ত মাটিই হয়েছে বাবা, তবে ক'ঘণ্টার জন্যে কেন? সব চুকিয়ে রাত্রে দুটো ভাতে ভাত খেয়ে একেবারে মেসে গিয়ে ঘুমিয়ে থেকো।"

বিমল বলিল, "আজকের মত ঢের হয়েছে, আর ভাতে-ভাত খাবারও জায়গা নেই। আর কি-ই বা বাকী আছে?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "মিনুকে তার বোর্ডিঙে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে না? আমার ত বাপু এ আজব শহরের রাস্তায় পা দিলেই মাথা ঘুরে যায়। এই কাজটুকু ক'রে দিতেই হবে।"

বিমল আর আপত্তি না করিয়া থাকিয়া গেল।

সন্ধ্যার মুখে মৃণাল চুল বাঁধিয়া কাপড়চোপড় বদ্‌লাইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বৃদ্ধা রাতটা থাকিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আর বেশী সময় নষ্ট করিবার সাহস মৃণালের হইল না।

রাস্তায় পা দিয়া বিমল বলিল, "এবার না-হয় একখানা গাড়ী করা যাক।"

মৃণাল বলিল, "কি দরকার? ট্রামে এসেছি, ট্রামেই যাব।"

বিমল একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "বাড়ীর ওঁরা যদি কিছু মনে করেন?"

বীরেনবাবু একটু কৃপণ মানুষ, যেখানে চার আনায় সারা যায়, সেখানে বারো আনা খরচের সম্ভাবনা তাঁহার মনে বড় আঘাত দেয়। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আরে না, না, মল্লিকদাদা আমাদের সেরকমের মানুষই নয়, অত গোঁড়ামি ওঁর নেই।"

মৃণাল আন্দাজে বুঝিল, বিমল কেন আপত্তি করিতেছে। মনটা তাহার আরও বিগড়াইয়া গেল, এখনই কি তাহাকে পঞ্চাননের কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হইবে? সে বলিল, "মামা কিছুই মনে করবেন না, আমি ট্রামেই যাব।"

ট্রামেই চড়িয়া বসিল তিনজনে। মৃণালকে বোর্ডিঙে পৌছাইয়া দিয়া বিমল সোজা নিজের মেসে চলিয়া গেল। বীরেনবাবু বার দুই-তিন যাতায়াত করিয়া রাস্তাটা চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন, তিনি আর পয়সা না খরচ করিয়া হাঁটিয়াই বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

দুপুরে ঠাসিয়া খাওয়ার ফলে পঞ্চাননকে বাড়ী গিয়া খানিক বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। বিকাল হইতেই সে হাত-মুখ ধুইয়া বাহির হইয়া পড়িল। একটু হাঁটাচলা করিলে শরীরটা ভাল বোধ হইবে, আর বীরেনবাবুদেরও একবার খবর লওয়া দরকার। শুধু খাইয়া বিদায় হইয়া গেলে তাঁহারা ভাবিবেন কি? আত্মীয় না হইলেও, এক গ্রামের লোক ত বটে? তাহারই বেশী করিয়া উঁহাদের সাহায্য করা উচিত ছিল, কিন্তু বিমলে হতভাগা যে "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।"

তাহার জ্বালায় কাহারও কিছু করিবার জো থাকিলে ত! ছেলের মতলব যে ভাল নয়, তাহা বুঝাই যাইতেছে। তবে সুখের বিষয়,

অমন চালচুলাহীন ছেলেকে কেহই পঞ্চাননের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গ্রহণ করিতে সাহস করিবে না। স্বয়ম্বরার যুগ বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে।

দুঃখের বিষয় সুকিয়া ষ্ট্রীটে পৌছিয়া সে বাড়ীতে পুরুষ মানুষ একজনও দেখিতে পাইল না। বৃদ্ধা বাহিরে আসিয়া তাহাকে খবর দিলেন যে জামাই এখনও ফিরেন নাই, ছেলে বিমলকে লইয়া মিনুকে বোর্ডিঙে পৌছাইয়া দিতে গিয়াছে এবং বাড়ীর অন্য ছেলেরা খেলিতে চলিয়া গিয়াছে।

পঞ্চাননের গা জ্বলিয়া গেল। কোনোমতে আর দুই-চারিটা কথা বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিতে তখনই ইচ্ছা করিল না। দুপুর বেলা যা গুরুভোজন গিয়াছে, রাত্রে আর রান্না-খাওয়ার হাঙ্গাম করিবে না সে স্থিরই করিয়াছিল। ফলাহার করিলেই হইবে, যদি ক্ষুধা পায়। তাহার জোগাড় বাড়ীতে সর্ব্বদাই থাকে।

হেদুয়ার ধারে বেঞ্চিতে বসিয়া সে অনেক ভাবনাই ভাবিয়া লইল। বিবাহ করিবার বয়স তাহার হইয়াছে। ইচ্ছারও কিছুমাত্র অভাব নাই। পারিবারিক অবস্থার উন্নতি যদি এই সূত্রে খানিকটা হইয়া যায় ত সোনায় সোহাগা। মেয়ের বংশ এবং শিক্ষাদীক্ষাই যে একমাত্র দেখিবার জিনিষ তাহা সে জোর গলায় প্রচার করে বটে, তাই বলিয়া মেয়ে সুন্দরী বা ধনবতী হইলে যে কিছু আপত্তির কারণ আছে তাহা নয়। সকল দিক্ দিয়াই মৃণালকে সুপাত্রী বলা চলে। জ্যাঠাইমার মতে মেয়ের বয়স অত্যন্ত বেশী, তা পঞ্চাননের ইহাতে বাস্তবিক আপত্তি কিছুই নাই, বরং খুকী মানুষ করার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। দাদার বউ দাদাকে যে রকম জ্বালাতন করিয়াছিল, সেই রকম করিলে

ত পঞ্চাননের মত বদমেজাজী মানুষের ঘরে টেঁকাই দায় হইবে। তাহার চেয়ে বয়স্থা বধূই ভাল। একটু চাপ দিলে মল্লিক মহাশয় হাজার টাকা পণ যে না দিতে পারেন, তাহা পঞ্চাননের মনে হয় না। সব চেয়ে বড় কথা যে মৃণালকে তাহার পছন্দ হইয়াছে। নিজের কাছে স্বীকার করিতে ত আপত্তি নাই? ইতিপূর্ব্বে তাহার যে কয়টি বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছে একটিতেও মেয়ে বিশেষ পছন্দ মত নয়। এইখানে বিবাহ হইলে পঞ্চানন খুশী হয়, কিন্তু মেয়েটিকে আর মেমসাহেবী করিতে দিলে পরে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু গৃহস্থের ঘরে তাহার মানাইয়া চলা শক্ত হইবে। কিন্তু মল্লিক-মহাশয়কে এ বিষয়ে কি ভাবে সাবধান করা যায়? জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা সেকেলে মানুষ, তাঁহাদের জানাইলে তাঁহারা হয়ত হাঁউমাঁউ করিয়া বিবাহই ভাঙিয়া দিবেন। মল্লিক মহাশয়কে সে নিজে লিখিতে পারে না, সেটা শিষ্টাচার-বহির্ভূত হইবে। মৃণালকে জানানো ত অসম্ভব। কি তাহা হইলে করা যায়? বিমলকে কিছু বলিতে গেলে ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়া ব্যাপারটা বিশ্রী না হইয়া দাঁড়ায়। দাদার বৌটার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু কম, কিন্তু উপায় না দেখিলে তাহারই সাহায্য লইতে হইবে।

ঠাণ্ডা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া পঞ্চানন গায়ে র‍্যাপার জড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বোর্ডিঙের দোতলাটা এখান হইতে দেখা যায়, সেদিকে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল। কিন্তু মানুষ চেনা ত যায় না?

পঞ্চানন আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। রাত্রেও খানিকক্ষণ ভাবিয়া অবশেষে কাগজ কলম লইয়া বাড়ীতে চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠিখানা লেখা হইল বৌদিদিকে। সে যেন সময়মত

সুযোগ বুঝিয়া মল্লিক-গৃহিণীকে একটু জানাইয়া দেয় যে খুব বেশী আধুনিক ও শিক্ষিতা মেয়ে পঞ্চাননের পছন্দ হয় না। এমনিতে মৃণালকে যে তাহার মনে ধরিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত করিতে আপত্তি নাই।

১৬

শীতের খট্‌খটে রোদ, এমন সময় ঘরে ঢুকিতে বড় ইচ্ছা হয় না। রোদে পিঠ পাতিয়া বসিয়া থাকিতে বড় আরাম। কিন্তু মল্লিক-গৃহিণী কাজের মানুষ, আরাম করিবার সময় তাঁহার বড় কম। বাড়ীর সব কাজ একা হাতে করিতে হয়। রাধী আগে শুধু বাসন মাজিত, এখন ছেলেমেয়ে সামলানোর কাজও তাহাকে কিছু কিছু করিতে হয়, না হইলে উপায় নাই। খোকা অসম্ভব দামাল, তাহাকে একজন না ধরিলে রান্নাবান্না কিছুই করা যায় না। টিনি, চিনি কাজে বাগড়া দিতে দিব্য পারে, মায়ের কাজে সাহায্য করিবার যোগ্যতা এখনও তাহাদের হয় নাই।

কাজেই চিনি, টিনি এখন রাধীর সঙ্গে পুকুরে স্নান করিতে যায়। স্নান তাহারা নিজেরাই করে, রাধী তাহাদের গা হাত রগ্‌ড়াইয়া দেয়, চুল মুছাইয়া দেয়, কাপড় গামছা কাচিয়া আনে। মল্লিক-গৃহিণী ততক্ষণ খোকাকে কোলে করিয়াই কোনোমতে রান্না সারিয়া ফেলেন। বড় ছেলে ইহার মধ্যে খাইয়া স্কুলেও চলিয়া যায়। তাহার পর টিনি, চিনি ফিরিয়া আসিলে তাহাদের ভাত বাড়িয়া খাইতে বসাইয়া দিয়া, খোকাকে রাধীর কোলে দিয়া তিনি স্নান করিতে যান। টিনি, চিনি ডাল ভাত ছড়াইয়া, ঝগড়া মারামারি করিতে করিতে খাইতে

থাকে। রাখী দাওয়ার নীচে ছায়ায় বসিয়া খোকাকে ঘুম পাড়ায়। গৃহিণী ফিরিয়া আসিলে ঘুমন্ত খোকাকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া সে বাড়ী চলিয়া যায়। আবার বেলা গড়াইলে বাসন মাজিতে আসে।

আজ টিনি, চিনি বেলা এগারোটা নাগাদ স্নান করিতে চলিয়াছে। এতক্ষণে রোদটা বেশ খট্‌খটে হইয়া উঠিয়াছে, নীল আকাশের উপর স্বচ্ছ কুয়াসার আবরণটা আর দেখা যায় না। মেয়েরা এতক্ষণ দোলাই মুড়ি দিয়া উঠানে বসিয়াছিল, এখন সে সব খুলিয়া ফেলিয়া স্নান করিতে চলিয়াছে। চুল খোলা, তেলে জব্‌ জব্‌ করিতেছে, নাক কপাল ঘাড় বাহিয়া তেল গড়াইয়া পড়িতেছে। মল্লিক-গৃহিণী সনাতনপন্থী মানুষ, নারিকেল তেল, সরিষার তেল, দুইয়েরই খরচ তাঁহার ঘরে খুব বেশী। শীতগ্রীষ্ম-নির্ব্বিশেষে মাথায় গায়ে বেশ করিয়া তেল মাখা বাড়ীর সকলেরই অভ্যাস। মৃণাল বাড়ী আসিলে মামীমা তাহাকে অনুযোগ দেন, "কি সব বিবিয়ানাই শিখেছিস্ বাছা তোরা, অমন যে কাগের ডানার মত কালো একরাশ চুল, তাও তেল না মেখে মেখে কটা ক'রে ফেলেছিস্।"

টিনি, চিনির পিছন পিছন রাখী চলিয়াছে, হাতে তাহার দুখানা ডুরে শাড়ী, লাল চৌখুপী একখানা গামছা, আর ছোট ছোট দুটি র‍্যাপার। স্নানে পর বড় শীত করে, তখন র‍্যাপার গায়ে না জড়াইলে চলে না।

ঘাটে তখন সবে মহিলা সমাগম আরম্ভ হইয়াছে। এত সকালে স্নান করিতে আসিবার অবসর বড় কাহারও হয় না, তবে ছোট ছেলে-মেয়েরা এই সময় হইতে ভীড় করে, সঙ্গে একজন করিয়া বয়স্কা কেহ আসেন।

টিনি, চিনি মল বাজাইতে বাজাইতে, নাচিতে নাচিতে ঘাটের সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। রাধী পৈঠার উপর এক ধারে বসিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া তাহাদের খবরদারি করিতে লাগিল।

সবচেয়ে নীচের ধাপে বসিয়া একটি বউ একটা ছোট মেয়ের পিঠে কষিয়া গামছা ঘষিতেছিল। টিনিকে দেখিয়া ঘোমটাটা একটু ঠেলিয়া খাটো করিয়া দিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বয়স বেশী নয়, ষোল সতেরো বছরের হইবে। চোখ দুইটা ছোট, নাকটাও বিশেষ উঁচু নয়, তবে রংটা ফরসা বলা চলে। বউ বলিল, "আমাদের টিনিরাণী যে গো! মা কখন আসবে চান্ করতে?"

চিনি বলিয়া উঠিল, "মা আসবে সে-ই বারোটার সময়।"

টিনি বলিল, "আমরা গিয়ে ভাত খাব, খোকন ঘুমবে, তবে ত?"

বউ বলিল, "আজ একটু তাড়াতাড়ি আসতে বলিস্, বলবি যে চক্কোত্তিদের বউ সকাল সকাল আসতে বলেছে, একটা কথা আছে।"

"বলব গো," বলিয়া ঝপাৎ করিয়া দুই বোনে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ইহারা সাঁতার কাটে মাছের মত, জল পাইলে তাহাদের আর শীত গ্রীষ্ম জ্ঞান থাকে না।

খানিক বাদে রাধীর চীৎকারে তাহাদের আবার ঘাটে আসিয়া ভিড়িতে হইল। তখন রাধী বেশ করিয়া গামছা দিয়া তাহাদের গা হাত পা রগড়াইয়া দিল। অতঃপর গোটা দুই ডুব দিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, তাহারা ফিরিয়া চলিল। রাধী তাহাদের গায়ে তাড়াতাড়ি র‍্যাপার জড়াইয়া দিল।

টিনি, চিনি গিয়াই মাকে সংবাদ দিল, "মাগো, চক্কোত্তিদের বড় বউ তোমাকে শীগ্‌গির নাইতে যেতে বলেছে।"

মা তাহাদের খাইবার জায়গা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন লা ? কুসমী আবার আমাকে যেতে তাগাদা দেয় কেন ?"

চিনি বলিল, "তার যে একটা কথা আছে।"

টিনি বলিল, "তুমি না গেলে সে মোটে যাবেই না ঘাট থেকে।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, তোরা এখন খেতে বোস দেখি। নে বাছা রাধী, তুই খোকাকে ধর্।"

খোকাকে রাধীর কোলে দিয়া, তিনি হেঁসেল গুছাইয়া, নিজের শাড়ী, গামছা ও তেলের বাটি লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। দিনের ভিতর মাত্র এই সময়টুকু তাঁহার অবসর, ঘাট হইতে আসিতে একটু দেরিই হইয়া যায়। মানুষজনের সঙ্গে দেখা করিবার, কথা কহিবারও এই সময়। তবে তিনি খুব বেশী গল্পের ভক্ত নন, এই যা রক্ষা। না হইলেও এক এক বাড়ীর বউ-ঝি স্নান করিতে আসে বেলা বারোটায় এবং বেলা একেবারে গড়াইয়া যাওয়ার আগে বাড়ী ফিরিবার নাম করে না। নিতান্ত দজ্জাল শাশুড়ী ঘরে থাকিলে দুই-একজন ফিরিয়া যায়। শীত-গ্রীষ্ম নির্ব্বিচারে পুকুর ঘাটের মাধ্যাহ্নিক "ক্লব্" সমান জোরে চলিতে থাকে।

মল্লিক-গৃহিণী ঘাটে পৌছিয়া দেখিলেন, মহিলা-সমাগম ইহারই ভিতর মন্দ হয় নাই। পঞ্চাননের জ্যাঠাইমাও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, একধারে বসিয়া পূজার বাসন মাজিতেছেন। ইঁহার মেজাজের গরিমায় কেহ বড় ইঁহার কাছে ঘেঁষে না। প্রৌঢ়ার আচার-নিষ্ঠা ও সমালোচনা-প্রিয়তার জন্য পল্লীবধূদের কাছে তিনি একটি মূর্ত্তিমতী বিভীষিকা।

তাঁহার বউ কুসুম তখন ঘোমটা টানিয়া মন দিয়া নিজের শাড়ী কাচিতেছে। পাড়াগাঁয়ে ধোপার পয়সা যথাসম্ভব বাঁচাইয়া চলাই নিয়ম। ময়লা কাপড় পরিলে কাহারও চোখে বড় সেটা লাগে না,

ফরসা কাপড় পরিলেই সমালোচনা বেশী হয়। কুসুমের একটু সাজসজ্জার দিকে ঝোঁক বেশী, কাজেই রোজই প্রায় তাহাকে সাবান-জলে সিদ্ধ করিয়া, শাড়ী, সেমিজ, মেয়ের জামা, সব কাচিতে হয়।

মল্লিক-গৃহিণী সিঁড়ির উপরের বাঁধানো চাতালে বসিয়া চুল খুলিয়া তেল মাখিতে বসিলেন। পাশে বসিয়া একটি মহিলা দাঁত মাজিতে-ছিলেন, তিনি বলিলেন, "চুল উঠে যাচ্ছে যে গো।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "বয়স ত হচ্ছে, চুলের আর দোষ কি? এখনও যে মাথা হাতের তেলোর মত শাদা হয়ে যায় নি সেই ঢের।"

মহিলাটি বলিলেন, "আহা, কিবা কথার ছিরি। তোমার আবার বয়স কি? আমাদের লতি বেঁচে থাকলে তোমার মতই হত, কতই বা বয়স তা হলে? এখনও ত তবু বউ-জামাইয়ের মুখ দেখ নি।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "এইবার দেখবো গো। তাই আগে ভাগে নেঁড়ামুড়ো হয়ে শাশুড়ীর চেহারা ধরছি।"

ঘাটের নীচের ধাপ হইতে কুসুম-বউ ঘোমটা উঁচু করিয়া হাতছানি দিয়া মল্লিক-গৃহিণীকে কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিতে লাগিল।

মল্লিক-গৃহিণী নীচে নামিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লা কুসুমি, ডাকিস্ কেন? খবরটা কি?"

বউ ফিশ্ ফিশ্ করিয়া বলিল, "ব'স না, বলছি। এখান থেকে চেঁচালে ঠাকরুণ শুনতে পাবেন যে?"

মল্লিক-গৃহিণী তাহার কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া বলিলেন, "কি কথা শুনি?"

কুসুম নীচু গলায় বলিল, "ঠাকুরপো চিঠি দিয়েছে।"

মৃণালের মামীমা কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লিখেছে? তোকে লিখেছে না জ্যাঠাকে?"

কুসুম বলিল, "জ্যাঠাকে নয় গো, আমাকে। ও সব কথা কি গুরুজনের কাছে লেখা যায় ?"

মল্লিক-গৃহিণী একটু গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এমন কথাটা ?"

বউ ফিশ্ ফিশ্ করিয়া বলিল, "তোমাদের মিনিকে তার খুব পছন্দ হয়েছে গো। হবেই বা না কেন ? দিব্যি সোমত্ত মেয়ে, দিব্যি গড়ন পেটন, চোখে ত ধরবেই।"

মল্লিক-গৃহিণী চেষ্টা করিয়া আর একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এই খবর ? আমি বলি আর কিছু।"

বউ বলিল, "শুধু এই নয়, আরো কথা আছে গো। মিনিকে কোলকাতায় কোথায় কোথায় যেন দেখেছে, বড় নাকি সাহেবী চালচলন, হট্ হট্ ক'রে রাস্তায় জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটে, টেরামে চাপে, এই সব আমাদের ছেলের পছন্দ নয়। আমাদের ঘরের রকম ত জান দিদি, সেই রকমই শিক্ষা না হলে পরে কষ্ট পাবে।"

মল্লিক-গৃহিণী তেলমাখা শেষ করিয়া বলিলেন, "সর্ দেখি, দুটো ডুব দিয়ে নি।"

তাঁহার মুখ বড় বেশী গম্ভীর দেখিয়া কুসুম-বউ আর কথা বাড়াইল না। মৃণাল যে নিঃসম্পর্কিত যুবকের সঙ্গে গল্প করে, সেটার আভাস দিতেও পঞ্চানন ত্রুটি করে নাই, কিন্তু সেটা আর বলা হইয়া উঠিল না।

মল্লিক-গৃহিণী স্নান সারিয়া, ভিজা কাপড় কৌশলে পরিবর্ত্তন করিয়া, শাড়ী গামছা কাচিয়া বাড়ী ফিরিয়া চলিলেন। কাহারও সঙ্গে গল্প করিতে আর ইচ্ছা করিল না, পঞ্চাননের চিঠির কথা শুনিয়া মনটা তাঁহার বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। মেয়েটাও বোকা, যতই কলিকাতায় থাক, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে ত, বিবাহও হইবে পাড়াগাঁয়ে,

তাহার অত বিবিয়ানা করিতে যাওয়া কেন? তাও আবার পঞ্চাননের সামনে। নিন্দা ত হইবেই। পাড়াগাঁয়ের লোক, একটা কথা পাইলে কি কখনও ছাড়ে? তাও আবার মেয়েমানুষের নামে। পঞ্চাননেরও বাড়াবাড়ি। বিবাহ হইবে কিনা তাহার কিছুরই ঠিকানা নাই। ইহারই মধ্যে পরের মেয়ের জন্য অত মাথাব্যথা কেন? তাহারই না হয় মেয়ে পছন্দ হইয়াছে, তাহার জ্যাঠার ত পণের টাকা পছন্দ হয় নাই? আর কুসুমিও বজ্জাৎ কম নয়। কি বা কথার ছিরি! "সোমত্ত মেয়ে, দিব্যি গড়ন পেটন," আ মর্ ঝাঁটা মার মুখে

রাগে গজ্ গজ্ করিতে করিতে গৃহিণী গিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিলেন। চিনি, টিনি তখনও চারিদিকে ভাত ছড়াইতেছে, আর পরস্পরকে মিষ্ট সম্ভাষণে অভিষিক্ত করিতেছে। তাহাদের মা ঘরে ঢুকিয়াই নড়া ধরিয়া তাহাদিগকে উঠাইয়া দিলেন। রাধী বলিল, "খোকাকে ধর গো।"

গৃহিণী বলিলেন, "রোস্ ধরছি, আগে এ আঁস্তাকুড় ঝেঁটিয়ে নিক্কিয়ে দিই।"

এঁটো বাসন বাহির করিয়া, খাবার জায়গা গোবর ন্যাতা দিয়া নিকাইয়া, তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। ঘুমন্ত খোকাকে রাধীর কোল হইতে তুলিয়া লইয়া ঘরে শোওয়াইয়া দিলেন, কাপড় গামছাও উঠানে মেলিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে মল্লিক মহাশয়ও বাহিরের কাজ সারিয়া স্নান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। গৃহিণী খাবার জায়গা করিতে করিতে বলিলেন, "মিনির বিয়ের কথাটা ঠিক্ ক'রে ফেল বাপু।"

কর্ত্তা বলিলেন, "হঠাৎ সে কথা মনে হল কেন?"

গৃহিণী বলিলেন, "মস্ত ডাগর মেয়ে হল, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে, শুনতে ভাল লাগে না। আর বেশী লিখিপড়িতে কাজ নেই, এর পর ঘর-সংসার করুক।"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "বিয়ের কথা ত এক রকম হয়ে রয়েছে, টাকাটার জোগাড় হলেই হয়। বড যে খাই ওদের, হাজার টাকার কমে রাজী হবে ব'লে মনে হয় না।"

গৃহিণী ভাত বাড়িয়া আনিয়া পিঁড়ির সামনে নামাইয়া রাখিলেন। স্বামীর জন্য থালা বাটি, গেলাশ, কিছুরই কম্‌তি নাই, নিজের ভাত বাড়িয়াছেন একখানা কানা উঁচু বড় কাঁশিতে, ডাল তরকারি তাহারই উপর ঢালিয়া দিয়াছেন, মাছের ঝোল কড়া সুদ্ধ টানিয়া আনিয়া কাঁশির ধারে রাখিয়াছেন, দরকার মত ঢালিয়া লইবেন। মল্লিক মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তোমার কি হাঁড়িকুড়ি নিয়ে খেতে বসা এ জন্মে ঘুচবে না? ঘরে দুই সিন্দুক ভর্ত্তি যে পিতল কাঁসার বাসন, সে কার জন্যে জিইয়ে রাখছ?"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "ভাত জুড়চ্ছে, খাও এখন, আমার থালা ঘটির ভাবনা ভাবতে হবে না। ও আমার দিব্যি অভ্যেস হয়ে গেছে, ঐরকম ক'রে খেতেই ভাল লাগে। সে কথা যাক্ গে। আজ কুসমির কাছে ঘাটে কতকগুলো কথা শুনে এলাম, শুনে অবধি হাড় জ্ব'লে যাচ্ছে। মিনির আমাদের মনটা খুব ভাল, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি বেশী নেই।"

মল্লিক মহাশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুসমি আবার মিনির কথা কি তোমাকে বললে? সে জানেই বা কি?"

গৃহিণী তখন চক্রবর্ত্তীদের বধূর কাছে কি কি সব শুনিয়া আসিয়াছেন, খুলিয়া বলিলেন। মল্লিক মহাশয় খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে

খাইয়া চলিলেন, তাহার পর বলিলেন, "দোষটা আসলে বীরেনের, মিন্নুর নয়। মিন্নুকে নিয়ে আসবে যাবে তাতে আমি মত দিয়েছিলাম, কিন্তু সে অত ক'রে পঞ্চাননের চোখে না পড়ে সেটা বীরেনের দেখা উচিত ছিল। ওখানে যে বিয়ের কথা হচ্ছে তা ত ও জানতই।"

"পরের মেয়ের ভাল-মন্দের ভাবনা কে অত ক'রে ভাবছে বল?" বলিয়া গৃহিণী খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। "নিজেদের কাজ উদ্ধার হলেই হল। সে যা হোক গে বাপু, আর গড়িমসি কোরো না। ঐখানেই বিয়ে দেওয়া যদি ঠিক কর, তা হলে পাকাপাকি কথাবার্ত্তা কয়ে নাও, হাজার টাকাটা ব'লে কয়ে সাত-শ, আট-শতে রফা কর। মিনির গহনা আছে ছ-সাত-শ টাকার, গহনা আর গড়াতে হবে না। ওর বাপ পাঁচ-শ দিয়েছে, তুমি কিছু দাও, বড় ঠাকুরঝির স্বামী এখন ভাল আছে, তার বড় ছেলেও চাক্‌রীতে ঢুকেছে, ওদের ধ'রে বেঁধে আমি শ-দুই টাকা আদায় ক'রে নেব। এর মধ্যে যেমন ক'রে হোক বিয়েটা তুমি দিয়ে দাও। না-হয় ধুমধাম নাই হবে। আত্মীয়-কুটুম ক'জনকে ডেকেই কাজ সেরে নেওয়া যাবে। মৃগাঙ্ক ছেলেপিলে বউ নিয়ে আসবে, বড় ঠাকুরঝি আসবে, ওতেই হবে এখন। আর নিতান্ত হাজার টাকা পণ না হলে যদি না হয় ত অন্য জায়গায় চেষ্টা দেখ। মোট কথা, এই বৈশাখ মাসে বিয়ে দিতেই হবে। মিনির পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই তাকে নিয়ে আসব, আর ওমুখো হতে দিচ্ছি না।"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "দেখি, আজ বিকেলে আর একবার বুড়োর কাছে গিয়ে। ছেলে যখন মেয়েকে অতটা পছন্দ করেছে, তখন দু-একশ কমলেও কমতে পারে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তাই কর। আমিও বড় ঠাকুরঝিকে একখানা চিঠি লিখি বুঝিয়ে পড়িয়ে। মা-মরা মেয়ে, পাঁচজনে না সাহায্য

করলে চলবে কেন? আমার যদি ক্ষমতা থাকত তাহ'লে কি আর কাউকে বলতাম? পেটে ধরিনি, কিন্তু ও ত আমারই মেয়ে। টিনি-চিনির চেয়ে কি ওকে কম ভালবাসি?"

মল্লিক-মহাশয় উঠিয়া মুখ ধুইতে ধুইতে বলিলেন, "ক'দিন আগে মৃগাঙ্কের একখানা চিঠি পেয়েছিলাম। তার শরীর নাকি খুবই ভেঙ্গে পড়েছে। ভালয় ভালয় মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে ভাল। সংসারে কখন কার কি ভাল মন্দ ঘটে বলা ত যায় না?"

কর্ত্তা উঠিয়া নিজের ঘরে গেলেন। দুপুরে ঘণ্টা-খানিক বিশ্রাম করিয়া তিনি আবার কাজে বাহির হইয়া যান। গৃহিণী রান্নাঘরের পাট সারিয়া কোনও দিন গড়াইয়া লন, কোনও দিন সেলাই করেন, কোনও দিন বা চিঠিপত্র লেখেন। আজ বড় ঠাকুরঝিকে চিঠি লিখিতে হইবে, তাই রান্নাঘরে শিকল তুলিয়া দিয়া তিনি ঘরে গিয়া কাগজ কলমের সন্ধান করিতে লাগিলেন। ছেলে মেয়ের উৎপাতে কিছু কি খুঁজিয়া পাইবার জো আছে? শেষে আবার স্বামীর ঘরেই তাঁহাকে গিয়া হাজির হইতে হইল।

১৭

মল্লিক-গৃহিণীর চিঠি লেখার খরচ সম্প্রতি বাড়িয়া গিয়াছে। আগে আগে বাপের বাড়ীতে মাসে খান-দুই, এবং মিন্থুর কাছে সপ্তাহে একখানা, এই ছিল তাঁহার চিঠি লেখার সীমানা। এখন বড় ননদ গিরিজার কাছে, মৃগাঙ্কমোহনের কাছে অনেকবার চিঠি লেখা হইতেছে। মৃণাল লিখিয়াছিল, টেষ্ট পরীক্ষা দিবার পরেই তাঙ্গা

লাগিয়া তাহার জ্বর হইয়াছিল, সুতরাং তাহার খবরও এখন সপ্তাহে তিন-চার বার লইতে হয়।

গিরিজা মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের গৃহিণী, ছেলেমেয়ে অনেকগুলি, কুপোষ্যও দু-চারটি আছে, সুতরাং সংসারটি মস্ত বড়। তবে বিষয়-সম্পত্তি কিছু আছে, এবং স্বামীও মাঝারিগোছের উপার্জ্জন করিতেন, কাজেই পাড়াগাঁয়ের মানুষের কাছে তাঁহারা সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তবে মাঝে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার স্বামী কিছুকালের মত ছুটি লইতে বাধ্য হন, ইহাতে সংসারে একটু টানাটানি পড়ে। এই সময় মৃণালের বিবাহের সম্পর্কে অর্থসাহায্য চাওয়ায় গিরিজা বিপন্ন হইয়া ভাইকে জানাইলেন যে সম্প্রতি কিছুই তিনি করিতে পারিবেন না। রুগ্ন স্বামী টাকার নাম শুনিলেই এখন চটিয়া উঠেন, এক্ষেত্রে নিজের বোনঝির জন্য টাকা চাহিতে গিরিজা কোন্ সাহসে অগ্রসর হইবেন?

কিন্তু তাহার পর আবার সুদিন আসিয়াছে। গিরিজার স্বামী আবার কাজে যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের বড় ছেলেটিও চাকরিতে ঢুকিয়াছে। এ-সকল খবর মল্লিক-গৃহিণী রাখেন। বাপের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ী দুই-পক্ষের যত আত্মীয়-কুটুম্ব আছে, সকলেরই তিনি মোটামুটি সংবাদ রাখেন। তাই এবার চিঠি লেখার ভার স্বামীর উপর না ছাড়িয়া দিয়া নিজে গ্রহণ করিয়াছেন। সংসারের কথা মেয়েরা যেমন গুছাইয়া লিখিবে পুরুষমানুষ কি তাহা পারে? তাঁহার নিজের স্বামী গ্রামের মধ্যে কর্ম্মিষ্ঠ মানুষ বলিয়া বিখ্যাত হইলেও, তাঁহার সাংসারিক বুদ্ধির উপর মল্লিক-গৃহিণীর খুব বেশী আস্থা নাই। গিরিজা মা-মরা বোনঝিটিকে খুবই স্নেহ করেন। এমন কি মৃণালের মা মারা যাইবার পর তিনিই তাহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিতে

চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মল্লিক-গৃহিণীর আগ্রহে মৃণাল তাঁহার ঘরেই রহিয়া গেল। এবার ভাজের প্রথম চিঠি পাইয়া গিরিজা জানাইলেন, মৃণালের বিবাহে সাহায্য তিনি করিতে ত খুবই ইচ্ছুক, তবে নগদ্ টাকা ত এখন হাতে কিছুই নাই। আচ্ছা, কথাবার্ত্তা চলিতে থাকুক, তিনিও ইতিমধ্যে চেষ্টায় থাকিবেন। মল্লিক-গৃহিণী এ-রকম জবাবে সন্তুষ্ট থাকিবার পাত্রী নহেন, তিনি চিঠির উপর চিঠি ছাড়িয়া চলিলেন। মা-মরা মেয়ে, সবাই মিলিয়া না-সাহায্য করিলে চলে কখনও? তাঁহার নিজের মেয়ে হইলে কি আর তিনি বড় ঠাকুরঝিকে এমন ভাবে বিরক্ত করিতেন? তাহার বাপের যেমন ক্ষমতা সেইমত বিবাহ হইত। কিন্তু মাতৃহীনা মৃণাল অর্থাভাবে একটা কুপাত্রে না পড়ে সেটা ত দেখিতে হইবে? নগদ টাকা না হোক, অন্য ভাবে ত সাহায্য করা যায়?

গিরিজা ভাজের মনোগত ইচ্ছা বুঝিলেন। ঐ চিঠিখানি পাইবার দিন-তিন পরে ইন্‌শিওর্ড পার্সেলে মল্লিক-গৃহিণী বেশ ভারী একখানা গহনা পাইলেন। মল্লিক মহাশয় কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পাঠালে গিরিজা?"

তাঁহার পত্নী বলিলেন, "এই দেখ না?" তিনি পাকা সোনার একটি মোটা হাঁসুলি তুলিয়া দেখাইলেন। এখনও সোনার রং কি! যেন আলো ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। বলিলেন, "এ বোধ হয় তার দিদি-শাশুড়ীর আমলের। অনেক পুরনো গহনা বড় ঠাকুরঝি পেয়েছিলেন যে, বাড়ীর প্রথম নাতবৌ ব'লে। তা কোন্ ছ-সাত ভরি না হবে ওজনে?"

মল্লিক মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তুমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বেশ দামী জিনিষ আদায় ক'রে নিলে যে? এখন কিছু মনে না করলে হয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "মনে আবার কি করবে? এ কি আমি নিজে খাবার পরবার জন্যে নিচ্ছি? বড় ঠাকুরঝির গহনার অভাব কি? বাক্স বোঝাই হয়ে আছে, দিলেই বা একখানা মা-মরা বোনঝিকে?"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "মৃগাঙ্ক চিঠির জবাব দেয় নি?"

গৃহিণী বলিলেন, "কালই ত তার পোষ্টকার্ড এল, দেখ নি? তার শরীর ভারি কাহিল লিখেছে। কাছারি থেকে ছুটি নিয়েছে মাস দুয়ের জন্যে। এমনি ভাবে চললে নাকি আর উঠতে হবে না। এখন ভালয় ভালয় মেয়েটার বিয়েটা হয়ে গেলে বাঁচি বাপু। মানুষের জীবনের কথা বলা ত যায় না?"

তাঁহার স্বামী বলিলেন, "তা ত ঠিক। মানুষের শরীরের ভালমন্দ হতে কতক্ষণ? মস্তবড় মেয়ে, আরও যে দু-দশ বছর বসিয়ে রাখব তার জো নেই। এতদিন পড়লেই যখন তখন পরীক্ষাটা দিয়ে নিক, এই জন্যে না দেরি করা? না হ'লে আর একদিনও দেরি করার আমার ইচ্ছে নেই। যেমন হোক একটা পাত্রেরও যখন সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুড়োর কাছে গিয়েছিলে আর? কথাবার্ত্তা কিছু এগোল?"

কর্ত্তা বলিলেন, "কাল বিকেলে গিয়েছিলাম একবার, তখন বুড়ো বাড়ী ছিল না। আজ আবার যাব।"

গৃহিণী বলিলেন, "আরও দু-একটা জায়গা দেখ, শুধু এক জায়গায় নজর রেখে ব'সে থেক না। ওখানে সুবিধে নাও ত হ'তে পারে?"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "এ-গাঁয়ে এখন ত চলনসই মত পাত্রও আর একটাও দেখি না। আশেপাশে ঘুরলে চোখে পড়তে পারে। আজ গিয়ে দেখি চক্রবর্ত্তী-বুড়ো কি বলে, তার পর না-হয় দু-চার জায়গায় চিঠি লিখব।"

গৃহিণী গহনাখানা নিজের বড় ট্রাঙ্কে তুলিয়া রাখিতে রাখিতে বলিলেন, "গেল বছর ঐ রায়দের নিবারণের বিয়ে হয়ে গেল। বেশ ছেলেটি, তখন যে মৃগাঙ্কও গা করল না, তুমিও কিছু বললে না। ওরা বেশী টাকার দাবীও করে নি, মেয়ের বাপের কাছে শ-পাঁচেক টাকা বিয়ের খরচ ব'লে খালি নিয়েছিল।"

কর্ত্তা বলিলেন, "সে ত যা হবার হয়ে গেছে, এখন ও-কথা ভেবে আর কি হবে? মিমুর চিঠি পেলে আর?"

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "কই না, মেয়েটা কেমন আছে কে জানে? পড়া তার এক বাতিক, এখন আনতে চাইলেও আসবে না, না হ'লে নিয়ে আসতাম। তার ধারণা, এখানে এলেই পড়াশুনো কিছু তার হবে না, সে পরীক্ষায় ফেল হয়ে যাবে।"

তাঁহার স্বামী বলিলেন, "যাক্ গে, একেবারেই আসবে এখন পরীক্ষা দিয়ে। ক'দিনের জন্যে আর কেন টানাটানি? বীরেনের আর দু-চার দিনের মধ্যে ফিরবার কথা, সে নিশ্চয়ই মিমুকে দে'খে আসবে, তারই কাছে খবর পাওয়া যাবে।"

গৃহিণী নিজের কাজে চলিয়া গেলেন, তাঁহার উনানের আঁচ বহিয়া যাইতেছিল, টিনি, চিনি স্নান করিতে গিয়াছিল, খোকা কি জানি কি মনে করিয়া অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মল্লিক মহাশয়ও কাজে বাহির হইয়া গেলেন। বাড়ী ফিরিয়া স্নানাহার করিবেন, খানিক বিশ্রাম করিবেন, তাহার পর যাইবেন চক্রবর্ত্তী-বুড়ার সহিত কথা কহিতে। মৃগাঙ্কমোহনের অসুখের সংবাদে তাঁহার চিন্তা বাড়িয়া গিয়াছে, মৃণালের বিবাহ অবিলম্বে দিয়া ফেলিতে তিনি ব্যস্ত।

পঞ্চাননদের বসতবাড়ীটি দালান নয়, মাটির ঘরই, খড়ের চাল। তবে ভাঙাচোরা নয়, বছর বছর খড় বদলানো হয়, দেওয়ালে গোবর-মাটির প্রলেপ পড়ে। ঘর সংখ্যায় পাঁচ-ছয়খানা, কারণ সংসারে মানুষ অনেকগুলি। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান আছে, তবে নগদ টাকার অভাবে মাঝে মাঝে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। পঞ্চানন কলেজে পড়ে, তাহার জেঠার এক ছেলেও কলেজে পড়ে, সে হোষ্টেলে থাকে। কাজেই খরচ আছে বই কি? বড় ছেলে শঙ্করের ফরশা বউ আনিবার জেদে তিনি পাওনাগণ্ডার দিকে বেশী নজর দিতে পারেন নাই। আশা আছে পঞ্চানন এবং কমললোচনের বিবাহে সে-ত্রুটি ভাল মতে সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। বধূরা মসীনিন্দিতবর্ণা হইলেও এবার আপত্তি নাই। গৃহিণীও ফরশা বউয়ের দেমাকে বেশী খুশী হন নাই, তিনিও এবার গায়ের রং লইয়া কিছু জেদাজেদি করিবেন না।

শীতকালের বেলা শীঘ্র শীঘ্র গড়াইয়া আসিতেছে। বাহিরের ঘরে তক্তপোষের উপর দোলাই গায়ে বসিয়া বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী তামাক টানিতেছিলেন। চেহারাটি বেশ মোটাসোটা, মাথায় বড় একটি টিকি, তাহা ছাড়া চুল বড় বেশী নাই। রং শ্যামবর্ণ, তৈলচিক্কণ। ঘরের আর এক কোণে বছর দশের একটি ছেলে ভাঙ্গা বেঞ্চির উপর বসিয়া ব্যাকরণ মুখস্থ করার ভান করিতেছে। এটি তাঁহার মাতৃহীন দৌহিত্র সুবল।

মল্লিক মহাশয় বাহির হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঘরে নাকি?"

সুবল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "দাদু এই যে এখানেই ব'সে আছেন।"

চক্রবর্ত্তীর চোখ দুটি আরামে প্রায় বুজিয়া আসিয়াছিল। তিনিও চমকিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "এস ভায়া, ভিতরে এস।"

সুবল এই সুযোগে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। দাদুর এখন তাহার পড়াশুনা তদারক করিবার সময় নিশ্চয়ই হইবে না।

মল্লিক মহাশয় তক্তপোষের এক কোণে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীরগতিক ভাল ত?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "এই যেমন দেখছ। শীতকালটায় বাতের ব্যথা বড় বেড়ে যায়, নইলে অমনিতে ত ভাল আছি। তবে সংসারী মানুষের হাঙ্গামের অন্ত নেই, জানই ত?"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "সে ত রয়েইছে। তা পঞ্চাননের বিয়ের কথাটা ভেবে দেখেছেন কি?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "এ আর ভাবাভাবি কি? ছেলের বিয়ের বয়স হয়েছে, এখন যত শীগগির বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় ততই লাভ। তোমার ভাগ্নীটি সকল দিক দিয়েই পাত্রী হিসাবে ভাল। গিন্নী বলছিলেন বয়স একটু বেশী, তা তাতে আটকাবে না। আর তোমাকে জন্মকাল থেকে দেখছি, তোমার সঙ্গে একটা কুটুম্বিতা হলে কত আনন্দের বিষয় হবে। তবে কি জান, দেশাচার যা তা ত মেনে চলতে হবে? বরপণ যখন চলন আছে, তখন সেটা ছাড়া যায় না। এটা যদি না থাকত, তাহলে সব ছেলের দর এক হয়ে যেত। তাহলে কুলশীলেরও মর্য্যাদা থাকত না, ছেলের রূপগুণ বিদ্যেরও মান থাকত না। যার যেমন যোগ্যতা, তার তেমন পাওনা হওয়া উচিত বই কি?"

মল্লিক মহাশয় এই অপূর্ব্ব যুক্তির কোনও উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আমার সাধ্য কতটুকু তা ত সেবার বলেইছি। মৃণালের বাপও বড় পীড়িত এখন, তার উপর জোর করা চলে না। মেয়েটিকে আমরাই

পালন করেছি, তাকে যথাসাধ্য আমরা দেব, এ আর আপনাকে ব'লে বোঝাতে হবে না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "হ্যাঁ তা বটেই ত, তবে কি না এই হাজার টাকাটা এখন আমার একান্ত দরকার। বিয়ের খরচটরচ আছে, তা ছাড়া এধার-ওধার কিছু টাকা আমাকে এ বছরের মধ্যে দিতেই হবে। তা অন্য দিকে তোমরা ধুমধাম কিছু না কর তাতে আমি কিছু বলব না। তবে খালি গায়ে ত কন্যা-সম্প্রদান করা চলে না, ভরি কুড়ির সোনার গহনা দিতে হবে বই কি, আর ছেলেরও বরাভরণ চাই।"

মল্লিক মহাশয় ভাবিয়াই পাইলেন না, সবই যদি চাই তাহা হইলে ধুমধামটা কোন্ দিক্ দিয়া কম হইবে। একটু ভাবিয়া বলিলেন, "বিশ ভরির গহনা দিলে শ-পাঁচের বেশী পণ যে দিতে পারব তা ত মনে হয় না, আপনি যদি দয়া ক'রে এতেই রাজী হন, তা হ'লে আমি নিষ্কৃতি পাই।"

চক্রবর্ত্তী ঠোঁট দুইটি কুঞ্চিত করিয়া কয়েক মিনিট ভাবিয়া লইলেন, তাহার পর বলিলেন, "দেখি ভেবে, বাড়ীর ওরা আবার গহনাগাঁঠির ভারি ভক্তি কি না, এর কমে রাজী হবে ব'লে বোধ হয় না। আচ্ছা, ব'লে দেখি।"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "আজ তবে উঠি, দিন চার পরে আবার খোঁজ নেব।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, এস তবে। আমি ওদের ভাল ক'রে বুঝিয়েই বলব, এখন তারা বুঝলেই হয়।"

মল্লিক মহাশয় বাহির হইয়া যাইতে যাইতে মনে মনে বলিলেন, "তুমি যা বোঝাবে তা ত দেখাই যাচ্ছে।"

বাহিরে আরও দু-একটা কাজ ছিল, সব সারিয়া সন্ধ্যার মুখে তিনি বাড়ী গিয়া পৌঁছিলেন। ঘরে তখন সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া গিয়াছে, তাঁহার বড় ছেলে বারাণ্ডায় হারিকেন জ্বালাইয়া পড়িতে বসিয়াছে। ছোট খোকার সাড়া পাওয়া গেল না, সে ইহার ভিতর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বোধ হয়। চিনি, টিনি রান্নাঘরের দরজার ধারে বসিয়া নাকে কাঁদিতেছে, তাহাদের বুঝি ঘুম পায় না, ক্ষুধা পায় না? মায়ের শাসন বড় কড়া, না হইলে ঘরে ঢুকিয়া ভাতের হাঁড়ি ধরিয়া টান দিতেও তাহাদের আপত্তি ছিল না।

গৃহিণী বোধ হয় আজকার কথাবার্ত্তার ফলাফল জানিতে একটু বেশী ব্যস্তই ছিলেন। উনানের উপর হইতে কড়াটা দুম্ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া তিনি দরজার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিয়েছিলে বুড়োর ওখানে?"

মল্লিক মহাশয় তাঁহার সামনের ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া পা ধুইতে ধুইতে বলিলেন, "গিয়ে ত ছিলাম। কাজ সেরে এস, ত বলছি।"

"আমার কাজ হয়ে গেছে। মেয়ে দুটোকে ভাত বেড়ে দিয়ে আসছি," বলিয়া গৃহিণী কড়া হইতে ঝোল কাঁসিতে ঢালিয়া ফেলিলেন। চিনি, টিনিকে এ বেলা রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া খাইতে হয়, দুপুরে অবশ্য ঠিক স্নানের পরে খায় বলিয়া তাহাদের রান্নাঘরে ঢুকিতে দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর এত ঘুম পায় যে তেজও তাহাদের কমিয়া আসে। মারামারি গালাগালি না করিয়া নীরবে যাহা পারে তাহা খাইয়া তাহারা উঠিয়া পড়ে। কনকনে ঠাণ্ডা জলে হাত পা মুখ ধোয়াইয়া, কাপড় ছাড়াইয়া মা তাহাদের অবিলম্বে বিছানায় চালান করিয়া দেন।

দুইজনকে ভাত বাড়িয়া দিয়া আর সামনে পিতলের পিলসুজে প্রদীপ রাখিয়া দিয়া মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "দেখ্, গোলমাল না ক'রে খেয়ে নিবি। তোদের কাচা কাপড় এই পিঁড়ির উপর রইল, হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে গিয়ে চুপ ক'রে শুবি। খোকাকে খবরদার জাগাবি না, তাহলে আর আস্ত রাখব না।"

টিনি, চিনি ঢুলিতে ঢুলিতে বলিল, "হুঁ।" তাহার পর ঝোল দিয়া ভাত মাখিয়া বড় বড় গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল।

মল্লিক-গৃহিণী স্বামীর কাছে গিয়া তক্তপোষের এক পাশে বসিয়া বলিলেন, "কি বললে বুড়ো ?"

মল্লিক মহাশয় হাতের হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "দর ত কিছুতেই কমে না। হাজার টাকা পণ ত চাই-ই, তার উপর বিশ ভরির সোনার গহনা।"

গৃহিণী বলিলেন, "এত খাঁই কেন বাপু ? হাজার টাকা তাঁদের ছেলে সারাজন্মে রোজগার করলে বাঁচি। এইবার পরীক্ষা দিয়ে পাস হোক ফেল হোক, আর পড়বে না শুনছি। এই বিদ্যে নিয়ে কি এমন জজ-ম্যাজিষ্টেরি জুটবে তাও ত জানি না। ঘরে ধান-চাল আছে বটে, তা খাবার মুখ ত ক্রমে বাড়ছে, তাতে আর কতদিন চলবে ? নিজদের যে-সব মেয়ের বিয়ে দিয়েছে তাতে কত ক'রে পণ দিয়েছে হাড়কিপ্পণ মিন্‌ষে ?"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "তারা যেমন বিয়ে দিয়েছে অমন বিয়ের আমাদের মেয়ের কাজ নেই। পয়সা বাঁচিয়েছে বটে, মেয়েগুলিকে ত বাঁচাতে পারে নি ?"

গৃহিণী বলিলেন, "তা বটে, বড়টা ত ম'রে বাঁচল, মেজোটা এখন লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরছে। তা অত আমরা কোথায় পাব বাপু ?

তুমি না-হয় অন্য ছেলে দেখ। এখানে হলে অবিশ্যি খুবই ভাল হত, আমাদের চোখের উপর থাকত। তা অসম্ভব দর হাঁকলে পারব কি ক'রে ?"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "দেখি, দিন চার পরে আর একবার যাব শেষ চেষ্টা করতে, তখনও যদি দর না কমে তাহলে অন্য ব্যবস্থাই, করতে হবে। বীরেন আসবে কাল. তার সঙ্গেও কথা ব'লে দেখব। তার একটি ভাগ্নের নাকি বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে।"

১৮

বীরেনবাবু কলিকাতায় আসিয়াছিলেন নানা উদ্দেশ্যে। মায়ের তীর্থদর্শন, গঙ্গাস্নান, ব্রত উদ্‌যাপন, নিজের কলিকাতা দেখা, এবং উভয়েরই রোগের চিকিৎসা করা। সব কাজ সারিতে মাস দেড়েক তাঁহার কাটিয়া গেল। আর কতদিনই বা মাসতুতো বোনের বাড়ী বসিয়া থাকা যায় ? তাঁহারা সকলেই অবশ্য আদর যত্ন যথাসাধ্য করিতেছেন, তবু নিজেদেরও ত কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত ?

তাই এই সপ্তাহের শেষেই মাতা ও পুত্র দেশে ফিরিবেন স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। বৃদ্ধার কলিকাতা যে খুব ভাল লাগিতেছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি নিজের পল্লীমাতার কোলে ফিরিতে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহুদিন পরে বোনঝির সঙ্গে দেখা, সে আবার আদর-আপ্যায়নও খুব করিল এবার, তাহাকে বারবার নিমন্ত্রণ করিতেছিলেন, "চল্ না মা, ক'টা দিন আমার কাছে থেকে আসবি, দেশ-গাঁ যে তোরা একেবারে ছেড়ে দিলি ?"

সুরবালা হাসিয়া বলিলেন, "দেখছ ত মাসীমা, একলার সংসার। আর শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে ছোট-খাটোও নয়। কার হাতে এসব ফে'লে যাব? ছেলেমেয়েরা পড়ছে, ওঁর আপিস, নিয়ে যাবারও উপায় নেই।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তোমাদের এক কথা মা, ঘরকন্না কে না করছে বল? তাই ব'লে কি একবার বাপের ঘরও যাবে না?"

সুরবালা বলিলেন, "এই আসছে গরমের বন্ধে দেশে একবার যেতেই হবে, উনিও ছুটি নেবেন। তখন গিয়ে তোমার ওখানে দিন কতক নিশ্চয় থেকে আসব।"

বীরেনবাবু নিকটে বসিয়া চা খাইতে খাইতে মাসী-বোনঝির কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "তাই যেও, সবাই তোমায় দে'খে কত খুশী হবে। সেই কোন্ ছেলেবেলায় গিয়েছ। তা মা, আজ মিনুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ ত বিকেলে? আমি বিমলকে আসতে ব'লে দিয়েছি।"

তাঁহার মা বলিলেন, "যাব বই কি? না হলে ওর মামা-মামী বলবে কি? তা বিমলকে আবার কেন? ও ভাববে, খালি আমার সময় নষ্ট করাচ্ছে এরা পরীক্ষার বছর। তুই ত ক'বার গেলি, রাস্তা চিনিস্ না?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "রাস্তা চিনলে কি হবে বাপু, ওদের সব বোর্ডিঙের নিয়মকানুন আমি কিছু বুঝি না। এদিকে যাও, ওদিকে যেও না, আজ এস ত কাল এস না। বিমল শহুরে ছেলে, ও সব ঠিকঠাক ক'রে দেয়।"

সুরবালা বলিলেন, "বেশ ছেলেটি। তোমাদের মিনুর সঙ্গে মানায় ভাল।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "বেশ ছেলে হলে কি হবে? ঘরে যে ধানচালও নেই, পরের উপর নির্ভর ক'রে পড়ছে। আজকাল যা চাকরির বাজার, ত্রিশটা টাকা আনতে পারলেই সব বি-এ পাস বাবুরা বর্তে যায়। মল্লিক-দাদা আবার এসব দিকে বড় কড়া। বাপের টাকা উড়িয়ে কলকাতায় থেকে ছেলেরা সব পাস দেন, চা-সিগারেট খেতে শেখেন, তার পর দুটো পয়সা আনতে সব জিব বের ক'রে ব'সে পড়েন। তার চেয়ে পাড়াগাঁয়ের ছেলে তিনি পছন্দ করেন, যদি ধান-চাল থাকে, ঘরবাড়ী থাকে। এই জন্যেই ত পঞ্চাননের সঙ্গে সম্বন্ধ এনেছেন।"

সুরবালার মেয়ে রেবা নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "ম্যাগো্যঃ, বিচ্ছিরি মোট্‌কা, মাথায় একটা দেড় হাত টিকি!"

গৃহিণী ধমক দিয়া বলিলেন, "দূর হ, মেয়ের কথার ছিরি দেখ। যা, পড়া করগে যা।"

বীরেনবাবু চায়ের পেয়ালা খালি করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। অন্যরাও যে-যার কাজে চলিয়া গেল।

বিমলের টেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। ফল আশানুরূপ ভাল হয় নাই। তাই সে এখন উদয়াস্ত খাটিয়া 'ফাইন্যাল' পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বীরেনবাবুকে আজকাল সে আর বড় ধরা-ছোঁওয়া দেয় না, দশ বার ডাকিলে একবার যায়। তবে আজ বিকালে সে আসিতে রাজী হইয়াছিল, কারণ তাহাকে যে বোর্ডিং-যাত্রার গাইড হইতে হইবে তাহা সে আন্দাজেই বুঝিয়াছিল। যেখানে নিজেরও মনের টান আছে সেখানে যাওয়ার জন্য ঘণ্টা দুই সময় নষ্ট করিতে তাহার মন বিশেষ বাধা দিল না।

বিকালবেলা সে যথাসময়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা ট্রামে

চড়িতে নারাজ, ও গাড়ীতে কি মেয়েমানুষ চড়ে? উঠিতে-না-উঠিতে ছাড়িয়া দেয়, ধাক্কাধাক্কির ব্যাপার, মুচী-মুদ্দফরাশ যাহার খুশি উঠিতেছে নামিতেছে। অগত্যা পয়সার মায়া ত্যাগ করিয়া বীরেনবাবুকে একখানা গাড়ী ভাড়া করিতে হইল।

বোর্ডিঙে পৌছিয়া আবার সেই চিঠি লেখালেখির ব্যাপার, আজও দেখা করিবার দিন নয়। চিঠিটা এবারেও বিমলকে লিখিতে হইল, এবং খানিক পরে তাহারা প্রবেশাধিকার পাইল।

বৃদ্ধা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "বাবা, কি কাণ্ড! নিজেদের মেয়ের সঙ্গে দেখা করব, তাও চিঠি লেখ রে, এত্তালা দাও রে, কত কারখানা। আমাদের দেশে এসব নেই বাপু।"

মৃণাল আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "কি দেশে নেই ঠাকুরমা?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "এই সব তোদের বোর্ডিঙের নিয়ম-কানুন বাছা। আমাদের গাঁয়ে যখন যার বাড়ী খুশি চ'লে যাব, কেউ রসি বামনিকে 'না' বলবে না।"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "যেখানকার যা নিয়ম ঠাকুরমা। দেশে থাকলে আমার কাছে আসতেই কি আর তোমাকে এত হাঙ্গাম পোয়াতে হত? তা তোমরা এবার নিতান্তই চললে বুঝি?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "হ্যাঁ, পরশু যাব সকালের গাড়ীতে। বাবা, মানে-মানে দেশে পৌঁছলে বাঁচি। যা ক'রে এসেছি, বুড়ো হাড়ে আর এসব পোষায় না।"

মৃণাল বলিল, "আমার ত যেতে এখনও ছমাসের ওপর। তোমরা ছিলে, তবু মাঝে মাঝে দেশের খবর পাচ্ছিলাম।"

বীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, চিঠিপত্র পাও না?"

মৃণাল বলিল, "হ্যাঁ, মামীমা প্রায়ই চিঠি লেখেন, তা চিঠিতে ক'টা কথাই বা থাকে ?"

বিমল এতক্ষণে কথা বলিল, "আপনার কলকাতা ভাল লাগে না বুঝি ?"

মৃণাল বলিল, "না, আমি পাড়াগাঁয়ের মানুষ. আমার পাড়াগাঁই ভাল লাগে।"

মৃণাল জ্বরে ভুগিয়া, পরীক্ষার পড়ার চাপে আরও যেন রোগা হইয়া গিয়াছে। বিমলের চোখে তাহার মুখখানি আরও যেন করুণ আর সুন্দর দেখাইতেছিল। সে আবার বলিল, "এখানে যত ছেলেমেয়ে পড়ে তার অনেকেই ত পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কিন্তু শহরে এসে তারা বনিয়াদী শহুরে হয়ে যায়, কখনও যে কলকাতা ছাড়া আর কিছু চোখে দেখেছে তা মনেই হয় না।"

বৃদ্ধা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "পঙ্কু আমাদের কিন্তু তেমন ছেলে নয়। নিজের ধর্ম্ম কেমন বজায় রেখেছে।"

মৃণালের মুখ লাল হইয়া উঠিল বিরক্তিতে এবং লজ্জায়। হঠাৎ পঙ্কুর কথা তুলিবার প্রয়োজন ছিল কি ?

বিমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধর্ম্ম মনের জিনিষ, সেটা হয়ত অনেকেই রেখেছে, যদিও সকলের মাথায় টিকি নেই।"

বৃদ্ধা চটিয়া বলিলেন, "তোমাদের বাপু সবতাতে ঠাট্টা, টিকি-পৈতে এসব হ'ল বামুনের লক্ষণ, এসব না থাকলে লোকে মানবে কেন ?"

মৃণাল তাড়াতাড়ি কথাটা ফিরাইয়া দিল। বলিল, "মামীমাকে ব'লো, আমি এখন বেশ ভালই আছি। মাঝে জ্বর হয়েছিল ব'লে তিনি বারবার ব্যস্ত হয়ে চিঠি লিখছেন। নিয়ে যেতেও চান, তা আবার ক'দিনের জন্যে যাওয়া কেন ? একেবারে পরীক্ষার পরে যাব।"

বিমল বলিল, "পড়াশুনা কেমন হ'ল ?"

মৃণাল বলিল, "নেহাৎ মন্দ হয় নি। আপনি খুব পড়ছেন বুঝি ?"

বিমল বলিল, "খুব না পড়লে আর চলে কই ? আগে আগে ত খালি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়েছি।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "তবে উঠি মা এখন। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হলেই তোমাদের কলকাতার গাড়োয়ানদের মেজাজ বিগড়ে যায়, তাঁরা পয়সা পয়সা ক'রে হাড় জ্বালিয়ে তোলেন। এঁর সঙ্গে কথা আছে যে আধঘণ্টা দাঁড়াবেন, তা আধঘণ্টা হয়ে এল ব'লে।"

আরও দু'চার কথার পর তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিমল সোজা নিজের মেসে চলিয়া গেল। ট্রামে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, পঞ্চাননের নাম হইবামাত্র মৃণাল অমন মুখ লাল করিল কেন ? লজ্জা, না বিরক্তি, না অন্য কিছু ?

বীরেনবাবুর মা পরদিন হইতেই বাক্স ডেক্স গুছাইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন দেশে বিস্তর, সকলের জন্যই উপহারস্বরূপ তিনি কিছু-না-কিছু জিনিষ সংগ্রহ করিয়াছেন। কাজেই আসিবার সময় লটবহর যাহা ছিল, এখন তাহার দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে।

বীরেনবাবু দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "মা, করেছ কি ? এত সব নিয়ে গাড়ীতে উঠতে পারবে ? অর্দ্ধেক হয়ত ষ্টেশনে প'ড়ে খোওয়া যাবে।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তা বললে কি হয় বাছা ? গিয়ে দাঁড়াতেই সব চারধার থেকে ছেঁকে ধরবে না ? তখন কি খালি হাত নেড়ে দেখাব যে কারও জন্যে কিছু আনি নি ? সে আমার কম্ম নয় বাপু।"

বীরেনবাবু গজ গজ করিতে লাগিলেন, "সেবার তবু ছোকরা দুটো সঙ্গে ছিল, খানিক সাহায্যি হয়েছে। এবার এই পাহাড় প্রমাণ মাল নিয়ে আমি ভরাডুবি হই আর কি?"

বৃদ্ধা পরম নিশ্চিন্ত, বলিলেন, "তা ওদের ডেকে পাঠালেই হবে, ইষ্টিশানে তুলে দেবে এখন।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "হ্যাঃ, ওরা তোমার মাইনে করা চাকর কি না, তু করে ডাকলেই এসে হাজির হবে। যত সব কাণ্ড!" বলিয়া তিনি চটিয়া একেবারে বাহিরের ঘরে চলিয়া গেলেন।

কার্য্যকালে দেখা গেল কিন্তু যে বৃদ্ধাই মানবচরিত্র বোঝেন বেশী। না ডাকিতেই পঞ্চানন এবং বিমল দুজনেই ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জিনিষপত্র সত্যসত্যই তাহারা বেশ গুছাইয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল, বীরেনবাবুকে কিছু বেগ পাইতে হইল না। তিনি ভীতু মানুষ, কাজেই যথাসময়ের অনেকটা আগেই ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াও দেখা গেল তখনও ট্রেন ছাড়িতে প্রায় কুড়ি মিনিট সময় বাকী আছে।

বিমল বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "তবে আসি ঠাকুরমা, একেবারে ভুলে যাবেন না যেন।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "ভুলব কেন ভাই? পাশের গাঁয়েই ত ঘর? নাতবৌ আসবার সময় খবর দিলেই গিয়ে হাজির হব। আমি না গান গাইলে তোমার বাসর জমবে কেন?"

বিমল একটু লজ্জিত ভাবে হাসিয়া বলিল, "তা হ'লেই হয়েছে ঠাকুরমা। এ জন্মে তা হ'লে আর দেখা হবে না।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "বালাই যাট্, দেখা হবে না কেন? এই পাসটা দিয়ে নাও, দেখো এখন তখন কেমন কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায়।"

বিমল বলিল, "অত কপাল নিয়ে আমি জন্মাই নি ঠাকুরমা। আমাকে সবাই ডাণ্ডা মেরে হাঁকিয়ে দেবে। কাড়াকাড়ি পড়বে এই পঞ্চুমামার মত রাজপুত্তুরদের নিয়ে।"

পঞ্চানন অল্প একটু দূরে দাঁড়াইয়া বীরেনবাবুর সঙ্গে কথা বলিতেছিল। বিমলের কথাটা বোধ হয় তাহার কানে গেল। মুখটা তাহার বিনা চেষ্টায়ই বেশ স্মিত হাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "বিম্‌লের মতলব কাউকে খেতে না দেওয়া। তাই অত বিনয় করছে।"

বীরেনবাবু এই সময় আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। কাজেই যুবকদের রসিকতা এইখানেই থামিয়া গেল। আরও দুই-চারটা কথার পর ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

বিকাল হইতে-না-হইতে তাঁহারা গ্রামে পৌঁছিয়া গেলেন। তাঁহাদের বাড়ী ষ্টেশনের বেশ কাছে, কাজেই আধঘণ্টার মধ্যেই তাঁহারা হাত-মুখ ধুইয়া বিশ্রাম করিতে বসিয়া গেলেন। বৃদ্ধা অবশ্য হাত-মুখ ধুইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না, স্নানের চেষ্টায় গামছা লইয়া পুকুরে চলিলেন। বীরেনবাবু ক্ষুধায় কাতর ছিলেন, তিনি গুড় দিয়া হাতগড়া রুটি খাইতে বসিলেন।

তাঁহার ছোট ছেলে আসিয়া খবর দিল, "বাবা, বাইরে মল্লিক-জ্যাঠা ব'সে আছেন।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "এই যে আসি। ততক্ষণ তামাক খেতে বল্ না। তোর মাকে বল্ আমায় আর একখানা রুটি দিতে।"

পেট ঠাণ্ডা করিয়া তিনি ধীরেসুস্থে বৈঠকখানা ঘরে গিয়া হাজির হইলেন। মল্লিক মহাশয় বসিয়াছিলেন, তবে তামাক খান নাই। বীরেনকে দেখিয়া বলিলেন, "কি হে, ভাল ছিলে ত?"

বীরেনবাবু মল্লিক মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভাল আর তেমন কই? টাকা ত ঢের খরচ ক'রে এলাম, কিন্তু দাদা, ডাক্তারে ওষুধে কি আর পরমায়ু দিতে পারে? জলহাওয়া মোটে ভাল না, এত ক'টি ভাত খেয়েছি কি যন্ত্রণার শেষ নাই, কিছুতে হজম হবে না। তাই ব্যবস্থাপত্র নিয়ে যেখানকার মানুষ মানে-মানে সেখানে ফিরে এলাম।"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "সে ত ঠিকই, শহরে কি আর স্বাস্থ্য টেঁকে? তা আমাদের মিনিকে আসবার সময় দে'খে এসেছ ত? কেমন আছে সে? মাঝে সর্দ্দিজ্বর হয়েছিল শুনে তার মামী বড় ব্যস্ত হয়েছে।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "দেখে এসেছি বই কি? প্রায়ই দেখা হ'ত। একদিন বাড়ীতে নিয়েও এসেছিলাম মায়ের ব্রত উদ্‌যাপনের সময়। তার রান্না খেয়ে সবাই কত সুখ্যাত করলে। জ্বর হয়েছিল বটে। তা এখন ভাল আছে। পাসের পড়া পড়ছে খুব, তাতেই একটু কাহিল হয়ে পড়েছে। মেয়েছেলেদের ওসব সয় না।"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "সয় না ত কারোই, তবে বেটাছেলেদের ত উপায় নেই, ক'রে খেতে হবে ত? মেয়েদের অবশ্য বিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। মিনুকেও আর পড়ানো আমাদের কারও মত নয়। পরীক্ষা হয়ে গেলেই বাড়ী নিয়ে আসব। পাত্রও দেখছি। তবে জান ত ভায়া কন্যাদায় কি জিনিষ? এক কাঁড়ি টাকা বার করতে না পারলে নিষ্কৃতি পাওয়াই শক্ত।"

বীরেনবাবুর বড় মেয়ের বিবাহ দিতে জমিজমা অনেক বন্ধক পড়িয়াছিল। এখনও তাহার জের মিটে নাই। তিনি বলিলেন, "জানি আবার না। ও কাঁটা একবার যার গলায় ফুটেছে, তাকে আর

কোনও দিন ভুলতে হবে না। তা তোমার ত আবার উড়ো খইনের নিজের মেয়েও নয়। মৃগাঙ্ক খরচটা দেবে না?"

মল্লিক মহাশয় একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সবটা দিতে আর পারছে কই, কিছু দিয়েছে। শরীর নাকি তার একেবারে ভেঙে পড়েছে, সেইজন্যে আমার চিন্তা আরও বেশী। সে থাকতে থাকতে হয়ে যায় ত ভাল, চক্রবর্ত্তীর কাছে ঘোরাঘুরি ত খুব করছি, কিন্তু দর হাঁকছে বড় বেশী। হাজার টাকা পণ, বিশ ভরি সোনা চায়।"

বীরেনবাবু বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তবেই ত ঠেকালে! নিজের মেয়ে নয় যে ভিটেমাটি বেচে বিয়ে দেবে। তুমিও ত ছা-পোষা মানুষ। একেবারে এই শেষ কথা নাকি? ছেলে অবিশ্যি মন্দ নয়, স্বাস্থ্য বেশ, স্বভাবচরিত্তির ভাল, খেতে পরতেও এক রকম দিতে পারবে। তবে হ্যাঁ, দালানকোঠা দিতে পারবে না, গাড়ীঘোড়া হাঁকাবে না। তা সে আর গাঁয়ে ব'সে পাচ্ছে কে? দেখ ব'লে কয়ে দু-চার শ যদি কমাতে পার।"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "কাল আবার যাব। কিন্তু ধর যদি দরে শেষ অবধি না-ই বনে, তা হ'লে অন্য পাত্র দেখতে হবে ত? মেয়ের বিয়ে এই বৈশাখ মাসে দিতেই হবে। তোমার একটি ভাগ্নে বিবাহযোগ্য হয়েছে না?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "হয়েছে বটে, তবে ছেলে মাত্র ম্যাট্রিক পাস। তোমাদের মেয়ের পাশে তেমন মানাবে না। অবস্থাও চক্রবর্ত্তীদের মত তত ভাল নয়।"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, "তবু দেখা ভাল একবার। তুমি তাদের একখানা চিঠি লেখ দিকি, পাওনা-থোওনা কিরকম আশা করে একটু বোঝা যাক। তারপর এটা হয় ভাল, না হয় অন্যত্রই দিতে হবে ত?"

১৯

কলিকাতায় একসঙ্গে চৈত্রমাসের উত্তাপ ও পরীক্ষার উৎপাত লাগিয়া গিয়াছে। ছেলেমেয়েদের মন অবসন্ন। বাপমায়ের মেজাজ চড়িয়া উঠিয়াছে। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া কাজ করিতে গেলে ঢিলা-স্বভাব বাঙালীর, বিশেষ করিয়া মেয়েদের, মেজাজ খারাপ না হইয়াই থাকিতে পারে না। কিন্তু এ ত বিয়ে বাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা নয় যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনও ঘণ্টায় গিয়া হাজির হইলেই হইবে, এ যে ইংরেজী-ছাঁচে ঢালা য়ুনিভার্সিটি। এখানে পান হইতে চুণ খসিলেই বিপদ। কাজেই যতই স্বভাববিরুদ্ধ হউক, নয়টায় ভাত খাওয়াইয়া পরীক্ষার্থী সন্তানকে সাড়ে ন'টায় রওয়ানা করিয়া দিতেই হইতেছে।

মৃণাল অবশ্য বোর্ডিংএ থাকে বলিয়া পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপার লইয়া কিছু গৃহবিপ্লব বাধিয়া যায় নাই। রাঁধুনী, ঝি এবং মাসীমা কিছু বেশী ব্যস্ত, এই পর্য্যন্ত খালি বুঝা যায়। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া কাজ করা বোর্ডিঙের চিরদিনের নিয়ম, আরও আধঘণ্টা আগাইয়া কাজ করিতে হইতেছে এই পর্য্যন্ত।

কিন্তু মৃণালের মনটা অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতই মুষড়াইয়া পড়িয়াছে, বরং একটু হয়ত বেশী রকমই। আত্মীয়স্বজন কেহ কাছে নাই যে দুইটা অভয়বাণী শোনায়, সান্ত্বনা দেয়। এই তাহার প্রথম পরীক্ষা, ভয়টা একটু হয়ত বেশীই হইয়াছে। কত মেয়ে হলে ঢুকিবার আগে প্রার্থনা করে, নয় কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়; মৃণাল কাঁদিতে লজ্জা পায়, কাহার কাছে প্রার্থনা করিবে তাহাও ভাবিয়া পায় না। পরীক্ষার বাড়া আরও এক মহা ভয় তাহাকে

পাইয়া বসিয়াছে। পরীক্ষা শেষ হইলেই ত তাহাকে চিরদিনের মত বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার পর হইবে পঞ্চাননের কাছে বলিদান!

ভাবিতেই যেন তাহার দেহমন আড়ষ্ট হইয়া যায়। বিবাহ যে কি ব্যাপার তাহা বুঝিবার বয়স মৃণালের হইয়াছে। পঞ্চানন মানুষটা তাহার দুই চক্ষের বিষ। তাহাকে দেখিলে মৃণালের হাড় জ্বলিয়া যায়, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিলে কানের ভিতর যেন ছেঁকা দেয়। তাহার স্বভাব কেমন মৃণালের তাহা জানিতে বাকী নাই। একই গ্রামের মানুষ ত দুজনেই? পঞ্চানন এই বয়সেই মস্ত বড় বক্তা, যতদিন গ্রামে থাকে সর্ব্ববিষয়ে নিজের মতামত প্রচার করিয়া গ্রামখানা গরম করিয়া রাখে। বলা বাহুল্য, তাহার কোনও একটা মতের সহিত মৃণালের কোনও একটা মত মেলে না।

এই মানুষ হইবে তাহার সর্ব্বময় অধীশ্বর! শিহরিয়া উঠিয়া মৃণাল নিজের ভিতর নিজেই মিলাইয়া যাইতে চায়। আর কি জগতে মানুষ ছিল না? আর যে কেহ হইলেই যে ইহার চেয়ে ভাল হইত। কিন্তু তাহাও কি ঠিক? মৃণাল সে কথাও আজকাল নিজের কাছে স্বীকার করিতে পারে না। পঞ্চাননের সম্বন্ধে তাহার মন কেন এমন করিয়া দিনের পর দিন বিমুখ হইতেছে তাহা কি সে একবারও ভাবিয়া দেখে? অতখানি সাহস তাহার নাই।

সম্প্রতি অঙ্কের পরীক্ষার দিন আজ। সকাল হইতে কতবার যে সে বইয়ের পাতা উল্টাইয়াছে তাহার ঠিক নাই। অঙ্কগুলা চোখের উপর দিয়া নাচিয়া যায়, কিছুই যেন মৃণাল বুঝিতে পারে না। এসব যেন তাহার অপরিচিত। পাঁচ-ছয়টা ঘণ্টা কোনও মতে কাটিয়া গেলে সে যেন বাঁচিয়া যায়।

পাঁচ-ছয় ঘণ্টা অবশেষে কাটিয়াই গেল। পরের দুদিন মৃণালের ছুটি। ইহার পরে যে কয়টি বিষয় আছে, তাহার জন্য মৃণালের ততকিছু ভাবনা নাই। আর কোনও ভাবনা না থাকিলে আজকের বিকালটা ত সে ফুর্ত্তি করিয়াই কাটাইতে পারিত। কিন্তু তাহার অবস্থা বড় বিষম। প্রাণের আধখানা তাহার চায় কোনওমতে এখানকার মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে, আর আধখানা চায় নিজের বাল্যনীড়ে ছুটিয়া যাইতে। মৃণালের মন খালি সংশয়ের দোলায় দুলিতে থাকে। ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করিবে সে?

বিকালে মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে এই ভাবনাই সে ভাবিতেছিল। অন্ততঃ আই-এ পর্য্যন্ত যদি সে পড়িতে পাইত! মামাবাবু আর বাবা কি দুইটা বৎসরও আর অপেক্ষা করিতে পারিতেন না? মৃণালের বয়স কিছু বেশী হইয়াছে তাহা ঠিক, কিন্তু ইহার চেয়েও বেশী বয়সের কুমারী কন্যা ত আজকার কত হিন্দু গৃহস্থের ঘরে ঘরে রহিয়াছে। এমন কিছু অসাধারণ যোগ্য পাত্র তাঁহারা পান নাই, যে, সেটিকে অবিলম্বে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে হইবে। টাকা খরচ করিলে অমন পাত্র যে কোনও সময় পাওয়া যাইবে। উহার চেয়ে ভালও পাওয়া যাইতে পারে। সত্য বটে পঞ্চাননের সহিত বিবাহ হইলে মৃণাল চিরদিন মামামামীর কাছাকাছিই বাস করিতে পারিত; ইহা তাহার কামনার জিনিষ সন্দেহ নাই, কিন্তু এত মূল্য দিয়া? না, না।

আশা আসিয়া কানের কাছে বলিয়া গেল, "তোমার ভিজিটার এসেছে, বিভাদি ডাকছেন।"

মৃণাল অবাক্ হইয়া গেল। তাহার আবার কে 'ভিজিটার'? কলিকাতায় ত এখন কেহ নাই? তবে কি মামাবাবু তাহার পরীক্ষার খবর লইতে আসিলেন? না আর কেউ?

বিভাদির কাছে যাইতেই তিনি বলিলেন, "বিমল রায় তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ইনিই ত সেই বীরেনবাবুদের সঙ্গে আসতেন?"

মৃণাল মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ"। বুকের ভিতরটা তাহার তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বিমল কেন আসিল তাহার সঙ্গে দেখা করিতে?

বিভাদি বলিলেন, "তা হ'লে দেখা কর। ইনি তোমাদের গ্রামেরই লোক ত?"

মৃণাল বলিল, "আমাদের পাশের গাঁয়ে এর বাড়ী।"

বিভাদি বলিলেন, "তোমার মামা আপত্তি করবেন কিনা তাই বল, বাড়ী যে গাঁয়েই হোক। একটা নিয়ম মত 'ভিজিটার্স লিষ্ট্' ক'রে রাখাই ভাল, তাহলে আর অত বাছবিচার করতে হয় না।"

মৃণাল বলিল, "আপত্তি করবার ত কোনো কারণ নেই। উনি ত আরো দু-তিনবার এসেছেন।"

বিভাদি বলিলেন, "তবে যাও, দেখা কর গিয়ে।" মৃণাল চলিয়া গেল।

বিমলের আসিবার কারণ সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার সঙ্গে কি কথা বলিবে সে? মামাবাবু হয়ত অসন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু সে কথা কেন মৃণাল বিভাদির কাছে স্বীকার করিতে পারিল না? অতি সনাতনপন্থী হিন্দুঘরের মেয়ে সে, তাহার এই অনাত্মীয় যুবক সম্বন্ধে মনের এত ঔৎসুক্য কেন? ইহা যে অন্যায় তাহা মৃণালের হৃদয় স্বীকার করে না, কিন্তু অন্য লোকে, বিশেষ করিয়া তাহার আত্মীয়স্বজন ত ইহাকে অন্যায়ই বলিবে?

বিমল বসিয়া বসিয়া একটা ইংরেজী মাসিকের পাতা উল্টাইতেছিল। মৃণালকে ঢুকিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে নমস্কার করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "দুদিন পরীক্ষা হয়ে গেল না? কেমন দিলেন?"

মৃণাল প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল, "খুব ভাল দিই নি। ঠিক বুঝতে পারছি না, এক-একবার মনে হয় মন্দ হয়নি, আবার এক-একবার মনে হয় সবই বুঝি ভুল লিখেছি।"

বিমল মাথা নাড়িয়া বলিল, "প্রথম প্রথম সেই রকমই মনে হয় বটে। আমরা পুরাতন পাপী, আমাদের ভয় অনেকটা কেটে গেছে। যাক্ গে, ব্যাপার ত ভারি, কয়েক বছর পরে সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা বিরাট্ তামাসা মনে হবে।"

মৃণাল বলিল, "যা চেহারা ক'রে এক-একটি মেয়ে হ'লে ঢোকে তা যদি দেখতেন, তা'হলে আর অমন কথা বলতেন না।"

বিমল বলিল, "অমন চেহারা ছেলেদের ভিতরেও ঢের দেখেছি। যাক্ সে কথা, আপনার শরীর ভাল ত? স্ট্রেন্ ত যথেষ্টই হল।"

মৃণাল একটু লজ্জিত ভাবে বলিল, "এখন একটু ভাল আছি। গরমে যা একটু কষ্ট হয়।"

বিমল বলিল, "গরমকে অত গ্রাহ্য করলে চলবে কেন? গ্রামে ত আরো বেশী গরম। তা ছাড়া সেখানে ফ্যানও পাবেন না, খস্‌খসের পরদাও পাবেন না।"

গ্রামের নাম হইতেই মৃণালের মুখের উপর কিসের যেন ছায়া ঘনাইয়া আসিল। এতক্ষণ সে বেশ সহজ প্রফুল্লতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, হঠাৎ একরাশ সঙ্কোচ আসিয়া তাহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল। বিমলের সহিত তাহার পরিচয় বাস্তবিক অতি

অল্পদিনের, আত্মীয়তার বন্ধনও কিছু নাই। তাহা সত্ত্বেও সে এমনভাবে বিমলের সঙ্গে গল্প করিতেছিল, ইহাতে ছেলেটি তাহাকে বেশী প্রগল্‌ভা মনে করে নাই ত?

বিমল কিন্তু তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া কথা বলিয়াই চলিল, "আপনি পরীক্ষার পর ত দেশে চ'লে যাবেন, না?"

মৃণাল বলিল, "সেই রকমই ত কথা আছে।"

"আর পড়বেন না?"

মৃণাল বলিল, "ঠিক জানি না, না পড়ারই সম্ভাবনা বেশী।"

তাহার মুখ ক্রমেই বিষণ্ণ হইয়া আসিতেছিল, বিমলও সেটা এবার না লক্ষ্য করিয়া পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নিশ্চয়ই বি-এ অবধি পড়বার ইচ্ছে ছিল, না?"

মৃণাল বলিল, "তা ত ছিল, কিন্তু বাবা বোধ হয় আর খরচ দিতে পারবেন না।"

বিমল বলিল, "এই যদি আপনি ছেলে হতেন, মেয়ে না হয়ে, তাহলে না খেয়েও আপনার বাবা খরচ দিতেন, আপনার মামাবাবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন পড়াটা যাতে না বন্ধ হয় সে জন্যে। কিন্তু বাঙালীর মেয়ে, তাদের পড়া খালি বিয়ের বাজারে দর বাড়াবার জন্যে, এই ত সকলের ধারণা।"

বিমলই বা আজ এমন ভাবে কথা বলিতেছে কেন? মৃণালের পারিবারিক অবস্থার কথাই বা সে এত জানিল কি করিয়া? জানিলেও ত এ-সব বিষয়ে অনাত্মীয় লোক এত আলোচনা করে না? তবে কি সেও এই অল্প কয়দিনের পরিচয়ে নিজেকে আর বহুদূরের মানুষ মনে করে না? মৃণালের বুকের কম্পনটা আরও যেন বাড়িয়া গেল।

খানিক পরে বিমল বলিল, "আপনি আমাকে এত কথা বলতে দে'খে বিরক্ত হচ্ছেন নিশ্চয়। কিন্তু না ব'লে থাকতে পারলাম না। কেন যে আপনি পড়তে পারেন না, তা সবই আমি জানি। আপনি হয়ত আরো বিরক্ত হবেন, তবু এ কথাটা না ব'লে পারছি না যে এমন ক'রে আপনার জীবনটাকে নিয়ে অন্তদের ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া উচিত নয়।"

মৃণাল বলিল, "এই ত আমাদের দেশের চিরদিনের নিয়ম। ছেলে-মেয়েদের হাতে ত কেউ তাদের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের ভার দেয় না, গুরুজনরাই সব ব্যবস্থা ক'রে দেন।"

বিমল বলিল, "চিরকালের নিয়ম ভাঙতেও হয়, আমাদের দেশেও নানা দিক্ দিয়েই ভাঙছে। আমার মনে হয় আপনার জোর করা উচিত আরো পড়বার জন্তে।"

মৃণাল বলিল, "জোর কার উপর করব? বাবা অতি অসুস্থ, সঙ্গতিও তাঁর কিছু না থাকার মধ্যে। মস্ত বড় পরিবার তাঁর কাঁধে। আর মামাবাবুর উপরে জোর করব কি ক'রে? তাঁরা এমনিই যথেষ্ট করছেন আমার জন্তে, আমার ত কোনো দাবী নেই সেখানে?"

বিমল বলিল, "আপনি যদি স্কলারশিপ পান, তাহলে অনেকটা সুবিধা হয়। সে ক্ষেত্রেও কি আর পড়বেন না?"

মৃণাল বলিল, "স্কলারশিপ যে একেবারে না পেতে পারি তা নয়, কিন্তু তাতেও আমার মনে হয় না যে ওঁরা আর আমাকে পড়তে পাঠাবেন। ওঁরা এক-একদিকে বড় সাবেকী মতের পক্ষপাতী।"

বিমল হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল, "এমনি ক'রে নিজেকে বলি দেবেন একটা অন্ধ দেশাচারের কাছে?"

মৃণাল স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন করিয়া সকল দিকের প্রাচীর ভাঙিয়া এ মানুষটি ভিতরে আসিয়া ঢুকিতে চায় কেন? কি আসে যায় তাহার মৃণালের ভবিষ্যতে? মৃণালের কোনো দায় ত ইহার নয়, জোর করিয়া সে পরের বোঝা ঘাড়ে করিতে চায় কেন?

কিন্তু সত্যই কি সে পর? মৃণালও যে তাহাকে দূরের মানুষ ভাবিতে পারে না। কেমন করিয়া, কিসের জোরে না-জানি এই যুবকটি মৃণালের জীবনের বড় কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। সমাজ, সংস্কার, দেশাচার, মৃণালের চারিদিকে অনেক গণ্ডি টানিয়া দিয়াছিল, কিন্তু বিধিদত্ত কোন অস্ত্রের জোরে সকল বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া সে আজ মৃণালের অন্তর-লোকে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহা মৃণালও আজ অস্বীকার করিতে পারে না। মাথা তাহার নীচু হইয়া পড়িল, দুই চোখে ব্যথায় আনন্দে জল ভরিয়া আসিল, সে যেন আজ বিশ্বের কাছে ধরা পড়িয়া গেল।

অনেকক্ষণ কেহই আর কথা বলিল না। শেষে বিমল বলিল, "আমি যাই তবে এখন। পরীক্ষার সময় এসে আপানাকে এত সব কথা না বললেই পারতাম, কিন্তু কেন জানি না, নিজেকে সামলাতে পারলাম না।"

মৃণাল মুখ তুলিয়া বলিল, "ভালই করেছেন। অন্ততঃ একজনও যে আমার দুঃখটা বুঝেছে, এতেও মনে একটু জোর পাওয়া যায়। জানি না ভবিষ্যতে আমার জন্যে কি অপেক্ষা ক'রে আছে, তবু মনে হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করবার শক্তি যেন আমার হবে।"

বিমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "সেই প্রার্থনাই করুন। আমি এখন আপনার কোনো কাজেই লাগব না, নিজেই আমি পরের অনুগ্রহপ্রার্থী। কিন্তু দুই-এক বছর পরে হয়ত মানুষের মত মাথা তুলে

দাঁড়াতে পারি। তখন অবস্থা অন্য রকম হবে। ততদিন অন্তত: এই উৎপাতটাকে ঠেকিয়ে রাখুন।”

মৃণাল বলিল, “চেষ্টা ত করব, তবে কতদূর পারব তা জানি না।”

বিমল বলিল, “পারতেই হবে। আপনি যাবার আগে আমি আর একদিন আসব দেখা করতে। আমার পরীক্ষাটা এসে পড়ল ব’লে। তারপর আমিও গ্রামে যাব। দেখা করা হয়ত একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে। ঠাকুরমা আমাকে বার বার নেমন্তন্ন ক’রে গেছেন, গিয়ে হাজির হতেও পারি।”

বোর্ডিঙে দেখা করিতে আসিয়া যতক্ষণ খুশি বসিয়া থাকা চলে না। বিমলকে এবার বিদায় গ্রহণ করিতেই হইল।

মৃণালের যেন এই সামান্যক্ষণের ভিতরই জন্মান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি পরীক্ষার ভাবনা ভাবিতেও সে ভুলিয়া গেল। এ তাহার কি হইল? তাহার জীবনের একটানা শান্ত স্রোতে এমন তুফান তুলিল কে? সে যেন আর আগের সেই শান্ত পল্লীবালা নয়। নিজের মনুষ্যত্ব, নিজের নারীত্বের সম্মান রাখিবার জন্য সে আজ সংগ্রাম করিতেও প্রস্তুত। সে নিজেকে এমন করিয়া বিসর্জ্জন দিবে না। তাহার জীবনের মূল্য তাহার নিজের কাছে ত আছেই, অন্য আর একজনের কাছেও আছে।

সন্ধ্যার ছায়া যখন রাত্রির অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল, তখনও মৃণাল মাঠে মাঠে ঘুরিতে ঘুরিতে এই ভাবনাই ভাবিতেছে। যে কথা কখনও মুখে আনিতে পারা সম্ভব মনে করে নাই, সেই কথাই তাহাকে মামা-মামীর সামনে দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে। তাঁহারা না-জানি কি মনে করিবেন! গ্রাম জুড়িয়া সমালোচনার বান ডাকিয়া যাইবে। কিন্তু এ সবই সহিতে আজ সে প্রস্তুত।

পঞ্চাননের পরীক্ষাটাই সকলের আগে হইয়া গিয়াছে। কেমন যে দিল, সে বিষয়ে তাহার মনে অনেকখানি সংশয় ছিল, হয়ত পাস না হইতেও পারে। পাস করিলেও সুবিধামত পত্নীলাভ না করিতে পারিলে আর হয়ত পড়া হইবে না। তাহাদের মস্ত সংসার, জ্যাঠামশায় ঋণজালে জড়িত, হয়ত পড়ার খরচ চালাইতে রাজী হইবেন না।

যাহা হউক, ঘরে তাহার খাওয়া-পরা চলিয়া যাইবে। শহরে থাকিবার ইচ্ছা তাহার নাই, গ্রামেই সে ফিরিয়া যাইতে চায়। বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে পারিলে, তাহার মন সেখানে দিব্য টিঁকিবে। জমিজমা দেখাশোনা করার কাজে সে লাগিতে পারিবে, গ্রাম্যসমাজের উন্নতিসাধন তাহার অতি প্রিয় কাজ, সে কাজেও লাগিতে পারিবে। নিজেদের গণ্ডি ভাঙিয়া যাহারা উন্মার্গগামী হইতে চায়, পঞ্চানন তাহাদের টানিয়া রাখিতে দৃঢ়সংকল্প। কাজেই গ্রামে আর যাহারই কাজের অভাব হউক, তাহার হইবে না।

কিন্তু মন টিঁকিবে কি? এই যে পরীক্ষা হইয়া গেল, ইচ্ছা করিলেই সে দেশে ফিরিয়া যাইতে পারে। কেন গেল না? কলিকাতায় তাহার এমন কিসের আকর্ষণ? বাড়ীর ভাড়া মাসের শেষ পর্য্যন্ত দিতেই হইবে, সুতরাং থাকিয়া গেলেও ক্ষতি নাই, এই ছুতায় সে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতে লাগিল। মাঝে মাঝে সে বিমলের খোঁজ করে। বিমল পড়ায় ভয়ানক ব্যস্ত, বসিতেও প্রায় বলে না। মাঝে মাঝে পঞ্চানন হেদুয়ার ধারে ঘুরিয়া বেড়ায়।

মেয়েদের দলের অধিকাংশেরই ম্যাট্রিক পরীক্ষার সীট্‌ পড়িয়াছে এইখানে। সন্ধ্যার পর দলে দলে মেয়েরা বাড়ী ফিরিতে থাকে, কেহ হাঁটিয়া, কেহ ট্রামে, কেহ গাড়ী চড়িয়া। ইহার মধ্যে অবশ্য

পঞ্চানন যাহাকে দেখিতে চায় তাহাকে দেখিতে পায় না। তবু দাঁড়াইয়া তাকাইয়া থাকিতে ভাল লাগে। মৃণালও পরীক্ষা দিতেছে। কেমন দিতেছে কে জানে? মেয়েদের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রতি পঞ্চাননের কোনো অনুরাগ নাই, ইহাতেও তাহারা প্রাচীন আদর্শ হইতে চ্যুত হয় এবং তাহাদের অহঙ্কার বাড়ে। তবু পরীক্ষা দিতেছে যখন, তখন কেমন দিতেছে জানিতে পারিলে হইত। কিন্তু কেমন করিয়া বা জানা যায়? নিজে সে মৃণালের সঙ্গে দেখা করিতে পারে না, তাহাদের সমাজের ইহা নিয়ম নয়। আর যদি নিজের মতের বিরোধী আচরণও সে করে, তাহা হইলেও মৃণাল তাহার সঙ্গে দেখা করিবে কিনা সন্দেহ। পঞ্চাননের কেমন যেন অস্পষ্ট সন্দেহ হয় যে মৃণাল তাহাকে ততটা পছন্দ করে না। আচ্ছা, তাহারও দিনকাল পড়িয়া আছে, সে সবুর করিতে জানে। হিন্দু নারীর কাছে পতিই যে দেবতা সে শিক্ষা, আশা করা যায়, পঞ্চানন নিজের স্ত্রীকে দিতে পারিবে।

কিন্তু আগে মৃণাল তাহার স্ত্রী হউক ত? বাড়ী হইতে পঞ্চানন কিছু দিন আগেই বৌদিদির শ্রীহস্তলিখিত একখানি চিঠি পাইয়াছে, তাহাতে একটু যেন নিরাশার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। মৃণালের মামীমার কাছে শ্রীমতী যথাসাধ্য ঠাকুরপোর ওকালতি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নাকি দেমাক দেখাইয়া, কোনো উত্তর না দিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন। মল্লিক মহাশয় যাওয়া আসা করিতেছেন বটে, কিন্তু দেনাপাওনা লইয়া গণ্ডগোল বাধিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও জেদ ছাড়েন না, মল্লিক মহাশয়ও আর অগ্রসর হইতে চান না। কয়েকদিন পরে শেষ কথা হইবে, তখন আবার বৌদিদি ঠাকুরপোর কাছে চিঠি লিখিবেন।

পঞ্চাননের লোভ ইহাতে আরও যেন বাড়িয়া গিয়াছে। যাহা পূর্ব্বে কেবল মাত্র আকাঙ্ক্ষার জিনিষ ছিল, এখন তাহা না পাইলে যেন তাহার আর চলিবে না। মৃণালকে তাহার পাইতেই হইবে যেমন করিয়া হউক। প্রয়োজন হইলে জ্যাঠামশায়কে তাঁহার জেদ ছাড়াইতে হইবে, কিন্তু কি উপায়ে? এ সকল কথা কাহাকে দিয়াই বা বলানো যায়?

সেদিনও নানা চিন্তা করিতে করিতে হেদুয়ার ধারে সে ঘুরিতেছিল। দারুণ গরমের দিন, ইহারই মধ্যে বায়ুসেবনকারীরা দলে দলে আসিয়া জুটিয়াছে। তাহার মত লোকও বিরল নয়, যাহারা শুধু বায়ু সেবন করিতেই আসে নাই।

হঠাৎ যেন পঞ্চাননের চোখের সম্মুখে সন্ধ্যার ম্লান আলো দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের মত প্রখর হইয়া উঠিল। কে ঐ গেট হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে? বিমল না? সে কি কারণে এখানে আসিয়াছিল? বীরেনবাবু ত এখন কলিকাতায় নাই, গ্রামের আর কেহও আছে বলিয়া পঞ্চানন জানে না, তবে কি হতভাগা একলাই এই অনাত্মীয়া যুবতীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল? এসবও তাহা হইলে চলিতেছে? রাগে পঞ্চাননের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া এখনই বিমলের গলাটা টিপিয়া ধরিয়া মজা টের পাওয়াইয়া দেয়। কিন্তু মাঝে গোটা দুই ট্রাম আসিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণের জন্য বিমলকে তাহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আড়াল করিয়া দিল। ট্রাম যখন সরিয়া গেল তখন বিমলকে আর দেখা গেল না, পঞ্চাননের রাগের তীব্রতাও জুড়াইয়া আসিতে লাগিল। সে হাঁটিয়া ফিরিয়া চলিল, সারাপথ কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে।

মেয়েটি কম নয়! এইসব তরলমতি যুবক-যুবতীদের শহরে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিলে এই দশাই ত ঘটিবে! এইসব মেমসাহেবী

শিক্ষার পরিণাম কবে ভাল হয়? কিন্তু এখনও ইহাকে রক্ষা করিবার সময় হয়ত যায় নাই। পঞ্চাননকেই এ কাজ করিতে হইবে। একবার যখন এ হতভাগিনীকে সে মনে স্থান দিয়াছে, তখন কুপথ হইতে ইহাকে টানিয়া আনিবার অধিকারও তাহার জন্মিয়াছে।

বাড়ী পৌছিয়াও তাহার মন শান্ত হইল না। এখনই একটা কিছু করিতে না পারিলে তাহার যেন শান্তি নাই। অন্ততঃ বিমলকে কিছু সত্য কথা শোনানো দরকার। এক গেলাস জল গড়াইয়া খাইয়া এবং উড়ানিখানা রাখিয়া দিয়া পঞ্চানন আবার বাহির হইয়া পড়িল।

বিমলও তখন সবে মেসে ফিরিয়াছে। ঘরে অসহ্য গরম, তাই ছাদে উঠিয়া কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। মন তখনও তাহার অত্যন্ত বিচলিত। মৃণালের কাছে নিজেকে এমনভাবে ধরা দিয়া ভাল করিল কি মন্দ করিল কে জানে? তাহার নিজের মন্দ ইহাতে কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু মৃণালের অকল্যাণ হইলেও হইতে পারে। সে হয়ত বিমলের কথা কখনও মনে স্থান দেয় নাই, বিমল জোর করিয়া যেন তাহার মনোমন্দিরের দুয়ার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আর কি সে বিমলকে ভুলিতে পারিবে? আশা বিমলের কানে কানে বলিতে লাগিল, না, মৃণাল আর তাহাকে ভুলিতে পারিবে না। তাহা হইলে কি তাহার চোখের ভাষায়, তাহার মুখের কথায় অত আনন্দের সুর বাজিত? কিন্তু কবে বিমল তাহাকে লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবে? কে জানে?

অতি দরিদ্রের সন্তান সে, বিধবা মা ভিন্ন আপন বলিতে সংসারে তাহার কে বা আছে? বিষয় আশয় সবই মহাজনের হস্তগত, খড়ের ঘর দুইটিমাত্র তাহার নিজের বলিতে আছে। পরীক্ষায় খুব ভাল করিয়া পাস করিতে পারিলে তবে সে আরও পড়িতে পারে, কিন্তু তত

ভাল হওয়ার সম্ভাবনা কম। বি-এ পাস বেকার যুবকে ত দেশ ভরিয়া গেল, সেও তাহাদের দলবৃদ্ধি করিবে হয়ত। এই অবস্থায় কি অন্যের জীবনের সহিত নিজের জীবনকে জড়াইবার চেষ্টা করা উচিত? কাজটা তাহার অন্যায়ই হইল হয়ত। কিন্তু মৃণালকে কিছু না জানাইয়া, একেবারে ভাসিয়া চলিয়া যাইতে দিতে সে পারিল কই? অন্ততঃ একজন যে তাহার ভাবনা ভাবিতেছে এই চিন্তা মৃণালকে শক্তি দিক। হয়ত সে নিজের জোরে নিজের পথ বাছিয়া লইতে পারিবে। ভগবান্ যদি সহায় হন, তাহা হইলে বিমলও হয়ত অদূর-ভবিষ্যতে তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। ধনী হইবার, বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিবার বাসনা তাহাদের দুইজনের একজনেরও নাই, কিন্তু কাহারও কাছে হাত পাতিতে তাহারা পারিবে না, কাহারও কাছে মাথা নীচু করিতেও পারিবে না। বিমলের বাবা যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে ভাবনা ছিল না। গ্রাম্য গৃহস্থের দিন তাহাতে বেশ চলিয়া যাইত। মৃণাল শহরের মেয়ে নয়, বিমলও পাড়াগাঁয়েরই মানুষ, তাহারা রাজধানীতে বাস করিবার জন্য লালায়িত নয়। কিন্তু সবই ত এখন ঋণের দায়ে বাঁধা পড়িয়া আছে। সেগুলি ছাড়াইবার ক্ষমতা বিমলের কতদিনে হইবে কে জানে? ততদিনে নিষ্ঠুর নিয়তি মৃণালকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইবে, তাহাই বা কে জানে? আর জীবনের সহচরীকেই যদি হারায়, তাহা হইলে বিমল কাহার জন্য সংসার পাতিবে?

নীচ হইতে ডাক আসিল, "বিমল বাড়ী আছ?" পঞ্চাননের গলা বিমল চিনিতে পারিল। কিন্তু সে ত বরাবর তাহাকে "তুই" সম্বোধন করে এবং "বিমলে" বলিয়া ডাকে। হঠাৎ এত সম্মানের ঘটা কেন?

সে সিঁড়ির কাছে গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া উত্তর দিল, "আমি ছাদে আছি, সোজা উপরে চ'লে এস।"

চটির শব্দে বাড়ী কাঁপাইয়া পঞ্চানন উপরে উঠিতে লাগিল। ছাদে আসিয়া বলিল, "কেউ নেই এখানে, ভালই হয়েছে।"

বিমল বলিল, "কেন, কেউ থাকলেই বা কি? আর্য্য নারীরাই পর্দ্দানশীন, পুরুষরাও কি এবার হবেন?"

পঞ্চাননের মুখ আরও ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল। ধীরে সুস্থে সে কথাটা পাড়িবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু এই হতভাগাই সর্ব্বাগ্রে ঐ কথাটাই এক রকম পাড়িয়া বসিল। বেশ, তাহাতে পঞ্চাননের আপত্তি নাই। সে বলিল, "তোমাদের মত ধুরন্ধরেরা যতদিন বর্ত্তমান আছে, ততদিন নারী বা পুরুষ, কারুর পর্দ্দা থাকবার জো কি?"

বিমল বলিল, "কেন, আমার দ্বারা আবার কার পর্দ্দার হানি হল?" ব্যাপারটা যে সে না বুঝিতেছিল এমন নয়, কিন্তু দেখাই যাক, পঞ্চুমামার দৌড় কতদূর?

পঞ্চানন বলিল, "এই যে কাণ্ডটি করছ, তার ফল ভাল হবে তুমি মনে কর?" রাগে তাহার গলা কাঁপিতেছিল, রাগটা অবশ্য সে যথাসম্ভব সম্বরণ করিবারই চেষ্টা করিতেছিল।

বিমল বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আমি ত অনেক কাণ্ডই করি, কিন্তু তার ভাবনা তোমার কেন? তুমি ত আমার অভিভাবক নও? যতদিন তোমার কিছু অনিষ্ট না করছি, ততদিন তুমি নিজের চরকায় তেল দাও না বাপু?"

পঞ্চানন বলিল, "প্রত্যেক মানুষের ইষ্ট-অনিষ্ট অন্য মানুষের ইষ্ট-অনিষ্টের সঙ্গে জড়ানো। বিশেষ ক'রে যারা এক সমাজে বাস করে। তোমাকে দিয়ে যদি আমার সমাজের কোনও স্ত্রীলোক বা পুরুষের

ক্ষতি হয়, তাতে আপত্তি জানাবার অধিকার আমার আছে, তার প্রতিকার যথাসাধ্য করবার অধিকারও আমার আছে।”

বিমল বলিল, “এখন ওসব সমাজতত্ত্বের বক্তৃতা রাখ দেখি। ওসব শুনবার আমার সময় নেই। সোজা ভাষায় এবং সংক্ষেপে বল যে আমার দ্বারা তোমার কি অনিষ্ট হয়েছে, তখন আমি তার উত্তর দেব। আর যদি খালি ব্যাজ্‌ব্যাজ্‌ করবার ইচ্ছে থাকে ত অন্যত্র যাও, আমার সময়টার এখন দাম একটু বেশী।”

পঞ্চানন বলিল, “সকলের সময়েরই দাম আছে, তুমি কিছু একটা অসাধারণ কথা বললে না। যাক, সোজা কথা শুনতে চাও, সোজা কথাই বলছি। মল্লিক মহাশয়ের ভাগ্নীটির সঙ্গে দেখা করতে তুমি তাদের বোর্ডিঙে যাও কিনা? আর একরকম অনাত্মীয়া যুবতী মেয়ের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করলে তার অপকার করা হয় কিনা? সে মেমসাহেব নয় তা মনে রেখো, সে পাড়াগাঁয়ের হিন্দু গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে।”

বিমলের মুখটা রাগে লাল হইয়া উঠিল। কোনোমতে নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিতে করিতে সে বলিল, “দেখ পঞ্চুমামা, অনধিকার-চর্চ্চারও একটা সীমা থাকা উচিত, তা বোধ হয় তোমার মাথায় ঢোকে না। আমি যেখানে, যার সঙ্গেই দেখা করি না, তোমার তাতে কি? মেয়ের বাবা বা মামা এসে যদি এ কথা বলেন, তাহলে তার একটা মানে হয়। তুমি কে বলবার? সে প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে, আঠারো বছর বয়স তার হয়ে গেছে, কার সঙ্গে দেখা করবে বা না করবে সেটা অন্ততঃ তোমার চেয়ে বেশী বুঝবার অধিকারী। তুমি যাও দেখি, এ সব ভূতের মুখে রামনাম শুনতে ভাল লাগে না।”

পঞ্চাননের রাগ একেবারে বোমার মত সশব্দে ফাটিয়া পড়িল। গলা উঁচু করিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল, “তুই বললেই যাব? তুই ঐ

নির্ব্বোধ মেয়েটার কি অনিষ্ট করছিস্ নিজে বুঝিস্ না, ভণ্ড কোথাকার ? ওকে এর পরে কে ঘরে নেবে ? আমিই ত নেব না, যদি এইরকম কাণ্ড আর বেশী দিন চলে। তোর চালচুলো কিছু নেই যে তুই সংসার পাতবি। তোর মতলবখানা কি শুনি ?"

বিমলের মুখ একেবারে শাদা হইয়া গেল। পঞ্চাননের খুব কাছে সরিয়া আসিয়া সে বলিল, "দেখ পঞ্চানন, যদি এই মুহূর্ত্তে চুপ না কর, তাহলে গলা টিপে একেবারে চিরদিনের মত থামিয়ে দেব। তোমার আস্পর্দ্ধা দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি। আমি কোনো কৈফিয়ৎ তোমাকে দেব না, তোমার যা খুশি করগে। সম্প্রতি ভাল চাও ত এখান থেকে বেরিয়ে যাও, না হলে তোমার কপালে দুঃখ আছে।"

চেঁচামেচি শুনিয়া জনকয়েক ছেলে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে দেখা গেল। পঞ্চানন বুঝিল, এখানে বেশী তেজ ফলাইতে গেলে মার খাওয়াও অসম্ভব নয়। মানে মানে সরিয়া যাওয়াই ভাল। তাহার যা করিবার তাহা সে অন্য ভাবেও করিতে পারে। সহায়সম্পদ্‌হীন বিমলের সাধ্য নাই যে সে পঞ্চাননের সঙ্গে পাল্লা দেয়। মৃণাল শহরে যতই স্বাধীনতা দেখাক, গ্রামে গেলে সে একেবারেই মামামামীর হাতের মুঠায় থাকিবে। যত শীঘ্র তাহাকে এই শহর হইতে সরানো যায় তাহার চেষ্টাই করিতে হইবে।

সে সিঁড়ি দিয়া নামিতে আরম্ভ করিল, বলিল, "বেশ, আমি যাচ্ছি। ভূতের মুখে রামনাম শুনবার ইচ্ছে তোমার নেই, আমারও ভূতকে রামনাম শোনাবার ইচ্ছে নেই। কিন্তু আবারও ব'লে রাখছি, তুমি এর ফল পাবে। এখনও জগতে ধর্ম্ম আছে, পাপপুণ্য আছে।"

সে খপ্‌খপ্‌ করিয়া নামিয়া গেল। বিমল আবার অস্থির ভাবে ছাদে ঘুরিতে লাগিল। এ কি বিষম সমস্যায় হঠাৎ তাহাকে পড়িতে হইল? পরীক্ষার ভাবনাও যে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম।

তাহার সহপাঠী শীতল উপরে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই ভরপূর গরমে কি আবার নাটক টাটক করছিস্ নাকি?"

বিমল বলিল, "নাটক নয়, যাত্রা, একেবারে 'তিলোত্তমা-সম্ভব'।"

শীতল বলিল, "তাই নাকি? রচয়িতা কে? অভিনেতৃবর্গের নাম ত খানিক আন্দাজ করতে পারছি। শেষে মামাভাগ্নের লেগে গেল?"

বিমল বলিল, "তোকে আমি রাত্রে সব খুলে বলব। একজন কারো সঙ্গে পরামর্শ করাও দরকার। এখন মনটা বড় উত্তেজিত হয়ে আছে।"

শীতল বলিল, "তা বলিস্, কিন্তু পরীক্ষাটা দিয়ে তারপর এসব সুরু করলে হত না? এই রকম মন নিয়ে ঈশান স্কলারশিপ পাওয়া একটু শক্ত।"

বিমল বলিল, "অথচ এখনই সেটা পাবার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী হয়েছে।"

শীতল বলিল, "জগৎটা এই রকমই। যার যখন যেটা দরকার, সে কখনও সেটা সে সময় পায় না। যাই হোক, চেষ্টার ত্রুটি রাখিস না। আমি একটু ঘুরে আসি।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বিমল ধীরে ধীরে ছাদ হইতে নামিয়া পড়িল। কে তাহাকে পথ দেখাইবে? মৃণালের সঙ্গে আর একবার যদি ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিত! কিন্তু সে ত সহজে হইবার নয়। অন্তরের দিক দিয়া যত কাছে হউক, বাহিরের জীবনে তাহারা বড় দূরের, মাঝে তাহাদের দুস্তর পারাবার।

২১

বহু বৎসর পরে মৃণাল এবার চিরদিনের মত বোর্ডিং ছাড়িয়া চলিল। এখান হইতে চলিয়া যাইতেও যে এত ব্যথা তাহার মনে বাজিবে তাহা সে কোনও দিন মনে করে নাই। ভাবিত, জেলখানা ছাড়িয়া যাইতে কয়েদীর যে আনন্দ, সেই আনন্দই সে অনুভব করিবে বুঝি। কিন্তু আজ হৃদয়ের প্রত্যেকটা স্নায়ু তাহার বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছে কেন? এতকালের সঙ্গিনী যাহারা, আজ তাহারা চিরদিনের মত মৃণালের জীবন হইতে বিদায় লইল। কলিকাতা তাহার ভাল লাগিত না, কিন্তু তাহার তরুণ জীবন এইখানকার মৃত্তিকাতেই সহস্র শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল, এইখান হইতেই রস শোষণ করিয়া সে আলোর দিকে মাথা তুলিয়াছিল। ব্যথা তাহার না বাজিবে কেন। আর এইখানেই তাহার সঙ্গে বিমলের পরিচয়। বিমলও কি আজ হইতে বিদায় লইল? পল্লীগ্রামে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া কেমন যেন অসম্ভব মনে হয়। ভাবিতেই মৃণালের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। বিমল তাহার কথা রক্ষা করিয়াছিল, আর একদিন সে আসিয়াছিল। কিন্তু সেদিন সে বড় গম্ভীর, বড় বিষণ্ণ, বেশী কথা সে বলিল না। মৃণাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "পরীক্ষা হ'লেই দেশে ফিরবেন ত?"

বিমল বলিল, "ঠিক করতে পারছি না। যেতে খুব ইচ্ছে করছে বটে, কিন্তু বোধ হয় সে ইচ্ছে দমন ক'রে, কলকাতায় থেকে কাজকর্ম্মের চেষ্টা করাই ভাল।"

মৃণাল বলিল, "তবু একবার যাবেন। না গেলে আমি ত আপনার কোনো খবরই পাব না।"

বিমল বলিল, "দেখি পরীক্ষাটা কেমন দিই, তার উপর খানিকটা নির্ভর করবে। খবর আপনাকে দেবই যেমন ক'রে হোক। চিঠিপত্র লেখা অবশ্য চলবে না। কিন্তু আপনি হাল ছাড়বেন না যেন। মেয়েদের নিজেদের দুর্ব্বলতা তাদের অনেক বিপদ্ ডেকে আনে। মনে সর্ব্বদা জোর রাখবেন।"

মৃণাল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "গ্রামে একবার গিয়ে পড়লে আমার যে কি অবস্থা হবে তা আপনি ঠিক বুঝছেন না। সেখানে আমি খেলার পুতুল মাত্র। আমার মতামত কেউ জানতে চাইবেও না, জানালেও তার কোনো মূল্য কেউ দেবে না। আমার মামা-মামী দুজনেই আমাকে খুব ভালবাসেন, কিন্তু তাঁরা পুরাতনপন্থী মানুষ, এসব ব্যাপারে মেয়ের যে আবার কোনও কথা চলতে পারে এ তাঁরা মনেই করেন না। কাজেই আমাকে থাকতে হবে ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে।"

বিমল অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "তা করলে চলবে না, সব মাটি হবে। নিজেকে বাঁচাতে হ'লে নিজকে লড়তে হবে। ভগবান্ দুর্ব্বলের সহায় হন না কোনও দিন।"

মৃণাল বলিল, "দেখি গিয়ে আগে সেখানকার অবস্থা কেমন। এখন পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে দরদস্তুরে পোষায় নি, এই একমাত্র ভরসা।"

বিমল বলিল, "সে ভরসাও বেশী দিন থাকবে না। পঞ্চুমামার যে রকম রোখ চ'ড়ে গিয়েছে, তাতে সে টাকার দাবী কমিয়েও শীগ্গির শীগ্গির রফা করবার চেষ্টা করবে।"

মৃণাল বলিল, "তার জ্যাঠামশায় বোধ হয় তার কথা শুনবেন না।"

বিমল উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "দেখা যাক। আমি অন্ততঃ দৈবের উপর খুব বেশী নির্ভর করছি না। এখানে কাজকর্ম্মের কিছু সুবিধা হতে

পারে তার একটু আশা পেয়েছি। আমাকে আপনি কোনও গতিকে খবর যদি একটু দিতে পারেন তার চেষ্টা করবেন। বেশী প্রয়োজন হ'লে সোজাসুজি ডাকবেন, আমি গিয়ে হাজির হব। লোকমতের ভাবনা ভাবা তখন চলবে না। আচ্ছা, আজ তবে আসি।"

মৃণাল তাহার পর কত রকম করিয়া ব্যাপারটাকে ভাবিয়াছে, কিন্তু পথ কিছু দেখিতে পায় না। সে কেমন করিয়া এই বিবাহে বাধা দিবে? মামীমার কাছে এ-কথার উল্লেখই বা করিবে কি করিয়া? বিমলকে খবর দিবে কেমন করিয়া, বিমলই বা তাহাকে নিজের খবর জানাইবে কি উপায়ে? কিছুই সে যে ভাবিয়া পায় না! যাহা হউক, বিমল যাহাই বলুক, ভগবানের উপর নির্ভর তাহার যায় নাই। তিনি কি এমন করিয়া তাহাকে অকূলে ভাসিয়া যাইতে দিবেন?

আর সে ফিরিয়া আসিবে না কাজেই সমস্ত জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। জিনিষপত্র জমা হইয়াছে মন্দ নয়। গ্রামের ষ্টেশন-মাষ্টারের সেই ভগিনী আবার বাপের বাড়ী যাইতেছেন, তাঁহারই সঙ্গ মৃণালকে ধরিতে হইবে। সকালে বাহির হইয়া, তাঁহার বাড়ীতে গিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

ভোরে উঠিয়া সে প্রস্তুত হইতেছিল। দুই চোখ বারবার তাহার জলে ভরিয়া উঠিতেছে। আর সে আসিবে না। তাহার সঙ্গিনীরাও দুই-চারিজন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে, সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা পাস করিলে আবার আসিয়া পড়িবে, ফেল করিলেও এখানে না আসুক, অন্য বোর্ডিঙে যাইতে পারে। সবার বড় কথা, তাহাদের সম্মুখে এমন বলিদানের খড়্গ ঝুলিতেছে না।

চোখের জলে ভাসিয়া, সকলের কাছে বিদায় লইয়া মৃণাল অবশেষে চলিয়া গেল। বোর্ডিঙের দারোয়ান তাহাকে গাড়ী করিয়া এই পথটুকু পার করিয়া দিয়া গেল।

এ বাড়ীতেও মহা কোলাহল, ব্যস্ততার সীমা নাই। এতগুলি ছেলেমেয়ে লইয়া যাওয়া, সে এক প্রলয় কাণ্ড! চীৎকার চেঁচামেচিতে কান পাতা যায় না। এত সকালে খাইয়া যাওয়া যায় না, আবার সেই বেলা তিনটা অবধি না খাইয়াও থাকা যায় না, কাজেই ট্রেনে বসিয়া খাইবার জন্য বেশ ভাল আয়োজন করিয়া লইয়া যাইতে হয়। বাড়ীর গৃহিণীই চলিয়াছেন, কাজেই সব আয়োজন তাঁহাকেই করিতে হইতেছে। ছেলেপিলেদের যেন রামরাজত্ব লাগিয়া গিয়াছে। রান্নাঘরে ঘি-ময়দা, আলু-পটোলের ছড়াছড়ি। আলুর দম রান্না হইয়া গিয়াছে, গৃহিণী পটোল ভাজিতেছেন, আবার এক হাতেই লুচির ময়দা ঠাসিতেছেন। এসব দিকে ছেলেমেয়েদের তত লক্ষ্য নাই। কিন্তু আগের দিন মা মস্ত বড় এক হাঁড়ি পান্তুয়া তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছেন সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য, সেই লোভনীয় হাঁড়িটা ঘরের এক কোণে বিরাজ করিতেছে। মায়ের চোখ এড়াইয়া কি করিয়া তাহার ভিতর একবার হাতটা ঢোকানো যায়, এই হইতেছে সমস্যা। মাও তেমনি, একবারও মুখ ফিরান না।

মৃণাল খানিকক্ষণ অবস্থাটা দেখিয়া বলিল, "মাসীমা, আমি ময়দাটা মেখে লুচি ক'খানা বেলে দিই না?"

গৃহিণী খুশী হইয়া বলিলেন, "তাই দাও বাছা, একলা হাতে আর পেরে উঠি না, দেখছ ত বজ্জাতগুলোর কাণ্ড? ওখানে নিয়ে যাব ব'লে মিষ্টি ক'টা করেছি, ভাবলাম, আহা, ভাইপো-ভাইঝিগুলো আছে, তারাও ত প্রত্যাশা করে? এরা ত বারো মাসই খাচ্ছে? তা কি

ক'রে সেগুলো পেটে পুরবে সেই চেষ্টায় আছে কাল থেকে। যা বেরো, আদেখলার দল, মিষ্টি কখনও চোখে দেখিস্ নি, না ?"

মৃণাল ময়দা মাখিতে বসিল। গাল খাইয়াও কচি-কাচার দল নড়ে না, শেষে এক-একটা পান্তুয়া হাতে দিয়া তবে তাহাদের সেখান হইতে সরানো হইল।

আর একজন সাহায্য করিবার লোক আসিয়া জোটাতে, কাজ এক রকম করিয়া হইয়া গেল। পোঁটলা-পুঁটলি হইল অসংখ্য, গৃহিণী যাইতেছেন অনেক দিনের জন্য, ছেলেমেয়েও অনেকগুলি। তাহাদের সামলাইতে, খাওয়াইতে এবং তাহাদের ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করিতে সময় কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল, তাহা মৃণাল জানিতেও পারিল না।

মল্লিক-মহাশয় ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মৃণালের বুকে যেন একসঙ্গে আনন্দ আর অভিমানের জোয়ার ডাকিয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। তাহার সঙ্গিনী ছেলেপিলে লইয়াই ব্যস্ত। তিনি অতটা লক্ষ্য করিলেন না।

মামাবাবু কাছে আসিয়া পড়ার আগেই মৃণাল সামলাইয়া লইল। মল্লিক-মহাশয় তাহার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বড় যে শুকিয়ে গিয়েছিস্ মা, পড়ার চাপ বড় বেশী পড়েছিল, না ?"

মৃণাল বলিল, "না,ঐ জ্বরটা হল কিনা টেষ্টের পর, তাইতেই অনেকটা রোগা হয়ে গিয়েছি।"

গোরুর গাড়ী উপস্থিতই ছিল। সহযাত্রিণীর কাছে বিদায় লইয়া মৃণাল গাড়ীতে উঠিল। এবার সঙ্গে তাহার অনেক জিনিষ, একটা গাড়ীতে সব ধরিল না, দুইটা মুটের মাথায়ও কিছু কিছু আসিতে লাগিল। মল্লিক-মহাশয়ও সঙ্গে হাঁটিয়া চলিলেন।

সেই পরিচিত মাঠ, বন, পুকুর, সেই নয়নরঞ্জন ছোট গ্রাম, সেই মানুষগুলি। কিন্তু সব কিছুর উপর হইতে সেই মায়াতুলিকার প্রলেপ আজ যেন মুছিয়া গিয়াছে। তাহারা আর হাত বাড়াইয়া মৃণালকে ডাকিতেছে না, যেন ভ্রূকুটি করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে যেন বন্দিনী, কারাগৃহের প্রাচীর যেন তাহাকে চারিদিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে। তাহার মুক্তি কোথায়? কেমন করিয়া সে এই স্নেহের নাগপাশ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে? এই যে তাহার আজন্মের আনন্দের ভালবাসার নিকেতন, ইহা এমন বিভীষিকাময় হইয়া উঠিল কেমন করিয়া? তাহার সহায় কি কেহ নাই? ভগবান্‌ও কি তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন?

চিনি, টিনি তেমনই ঘূর্ণিবায়ুর মত ছুটিয়া আসিল, মামীমা তেমনই খোকাকে কোলে করিয়া আসিয়া, বাহিরের দাওয়ায় দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেই আনন্দের রাগিণী আর তেমন করিয়া বাজিল না।

মামীমাও বলিলেন, "বড় রোগা হয়ে গিয়েছিস্ মা।"

মামাবাবু বলিলেন, "নাও, এখন ক'দিন খাওয়াও মাখাও ভাল ক'রে। নইলে কেউ পছন্দ করবে না, যা মেয়ের শ্রী হয়েছে।"

সে যেন বলিদানের পশু! তাহার দেহের শ্রী প্রয়োজনমত না হইলে, বলির খাঁড়া তাহার গলায় পড়িবে না।

কাপড়চোপড় বদ্‌লাইয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, মৃণাল খাইতে বসিল। সবই আগের মত আছে, শুধু মৃণালের মনের দৃষ্টি আজ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। কিছুই আর তাহার ভাল লাগে না। ভগবান্ কেন তাহাকে এমন পরীক্ষায় ফেলিলেন? আর দশটা মেয়ের মত সে কেন ভাগ্যের দান শান্তভাবে লইতে পারিল না? কেন পঞ্চানন তাহার ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মত উদিত হইল? তাহাকে মৃণাল কেন এত ঘৃণা করিল?

বিমলই বা এমন করিয়া তাহার সমস্ত হৃদয় হরণ করিল কেন? এই দারুণ সংশয়ের সাগরে মৃণাল কোন্ ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া ভাসিবে? নিজের নারীত্বকে বলি দিয়া স্রোতেই ভাসিয়া যাইবে কি? না, যথাসাধ্য কূলে পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে? একবার কি হাতখানা ধরিয়া কেহ তাহাকে তীরে টানিয়া তুলিবে না?

মামীমা বলিলেন, "তুই খাচ্ছিস্ কই? এখনও বুঝি অরুচিটা যায় নি?"

মৃণাল বলিল, "আর খেতে পারি না। খেয়েই বেরিয়েছিলাম, আবার গাড়ীতেও একবার খেয়েছি।"

মামীমা বলিলেন, "সুহাস মানুষটা ভাল, বেশ যত্ন ক'রে এনেছে, না?"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "তাঁর যত্ন করবার অবসর কোথায় মামীমা? নিজের ছেলেমেয়ে নিয়েই তিনি অস্থির। আর সেগুলি হয়েছেও তেমনি দুষ্টু।"

মামীমা বলিলেন, "ছেলেপিলে আবার কোথায় শিষ্ট হয়? যা, নিজের জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে রাখ্ গিয়ে। কাঠের বাক্সটা ওঁর ঘরে রাখিস্। আমার ঘরে অত জায়গা হবে না।"

মামীমা নিজের কাজে ভিড়িয়া গেলেন। মৃণাল জিনিষ গুছাইতে বসিল। চিনি, টিনি আর খোকা ত তখনই কাজে ব্যাগ্ড়া দিতে আসিয়া জুটিল। কাজেই যে কাজ এক ঘণ্টায় করিতে পারিত, তাহা সারিতে তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার দীপ জ্বলিয়া উঠিলে পর তাহার ক্ষুদ্র শত্রুগুলি খাদ্যের সন্ধানে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। মৃণাল তখন শ্রান্তভাবে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

মামীমা খানিক বাদে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া তুলিলেন। বলিলেন, "খাবি চল্ রে, দস্যিগুলোর হয়ে গেছে।" চিনি, টিনি ও খোকা ইহারই ভিতর হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শান্ত শরীর ও নিষ্পাপ মন, ঘুমাইয়া পড়িতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না।

মৃণাল বলিল, "আজ আর থাক না মামীমা, মোটেই খিদে নেই।"

মামীমা বলিলেন, "না বাছা, ওসব শহুরে ধরণ এখানে চলবে না। রাত-উপোসী থাকতে নেই। শরীরটাকে একেবারে মাটি ক'রে এনেছিস্। এই জন্যেই না লোকে মেয়েছেলের লেখাপড়া দেখতে পারে না? যাদের চিরকালটা গতর খাটিয়ে খেতে হবে, তাদের আগে ভাগে শরীরের দফা সেরে রাখলে চলে? যেমন হোক দু-গাল খেয়ে এসে শো।"

কথা বাড়াইবার ভয়ে মৃণালকে উঠিতেও হইল, দুই গাল খাইতেও হইল।

ভোরলবেলা ঘুম ভাঙিয়া সে উঠিয়া পড়িল। ক্ষুদ্র দস্যুর দল তখনও নিদ্রামগ্ন, বাড়ী ঠাণ্ডা আছে। মামীমা কাপড় ছাড়িয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়াছেন, মামাবাবু বাহির হইয়া গিয়াছেন। মৃণালের এখন কোনও কাজ নাই। সে মুখ-হাত ধুইয়া বাড়ীর পিছনের তরকারি বাগানে গিয়া হাজির হইল।

ইহা শুধু তরকারির বাগান নয়, প্রায় তিন-চার বিঘা জমি, বাঁশের বেড়া দিয়া ঘেরা। ইহার ভিতর খিড়কির পুকুর আছে, গোয়াল-ঘর আছে, হাঁসের ঘর আছে, ঢেঁকিশাল আছে। তরকারির বাগানের মাঝে মাঝে বড় বড় ফলের গাছ আছে, ফুলেরও অভাব নাই। মোটের উপর জায়গাটি পরিষ্কার, তবে এখানে ওখানে ঝোপঝাড় যে

একটাও নাই তাহা নয়। মৃণাল কেমন যেন আন্‌মনা হইয়া বাগানে ঘুরিতে লাগিল।

তাহাদের বাগানের পিছন দিক্ দিয়া একটা মেঠো রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। পাড়াগাঁয়ের পায়ে-চলা পথ। মাঠের পর মাঠ পার হইয়া এ পথ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে। এই পথে ছয়-সাত মাইল হাঁটিলেই বিমলদের গ্রামে যাওয়া যায়। কিন্তু সে ত এখনও কলিকাতায়, কবে গ্রামে আসিবে কে জানে?

দু-একটি করিয়া মানুষ মাঠে পথে দেখা যাইতে আরম্ভ করিল। পাড়াগাঁয়ের মানুষ সব সকাল সকাল ওঠে। মামাবাবু বাড়ীর দিকে ফিরিয়া আসিতেছেন, দূর হইতে দেখা গেল। হঠাৎ মৃণাল চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চলিল। কিছুদূরে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা দিয়াছে, ইহাকে ভুল করিবার জো নাই। সে পঞ্চানন। এত সকালে এদিকে কি করিতে আসিতেছে?

পঞ্চানন মৃণালকে দেখিতে পাইয়াছিল। সামনা-সামনি আসিয়া পড়িলে হয়ত দু-একটা কথাও বলিতে পারিত, যদিও তাহা তাহার নিজের মতে নিন্দনীয় হইত। কিন্তু মল্লিক-মহাশয়কে কাছে আসিয়া পড়িতে দেখিয়া সে ইচ্ছা সে ত্যাগ করিল। মৃণালকে বড় যেন রোগা দেখাই-তেছে। রোগা ত হইতেই পারে, যা সব কাণ্ড! সে গ্রামে ফিরিয়াছে বিমলের সঙ্গে ঝগড়ার পরদিনই। এখন অবধি সম্বন্ধটা পাকাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। জ্যাঠামশায়ের কাছে কথাটা পাড়ায় কাহাকে দিয়া? বৌদিদি এ-ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কাজে লাগিবে না। দাদার সঙ্গে এ-সব কথার আলোচনা করা কি ঠিক হইবে? কিন্তু উপায় না মিলিলে অগত্যা তাহাই করিতে হইবে। মোট কথা, পঞ্চানন এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াই আসিয়াছে।

২২

মৃণাল রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "মামীমা, আমায় কিছু কাজ দাও না? এমনি হাঁ ক'রে ব'সে থাকা যায় চব্বিশ ঘণ্টা?"

মামীমা বলিলেন, "সাত-সকালে এখন কি কাজ দিই তোকে? আগে দুটো কিছু মুখে দে। যা না ছিরি হয়েছে মেয়ের, দুটো দিন জিরিয়ে নে।"

মৃণাল বলিল, "জিরচ্ছি ত সারাক্ষণই। চিনি টিনি উঠেছে?"

মামীমা বলিলেন, "উঠল বোধ হয় এতক্ষণে। যা ত, খোকাকে একটু ধর্ গে যা, গলা শুনছি যেন।"

মৃণাল গিয়া ছেলেমেয়েদের তুলিয়া মুখ ধোওয়াইতে বসিল। ইহারা জাগিয়া থাকিলে মানুষকে চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া যাইবার কোনও অবসর দেয় না। তাহাদের দাবী এমন প্রচণ্ড যে তাহা মিটাইতেই মানুষের দেহ-মনের শক্তি ফুরাইয়া যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সকালের খাওয়া চুকিল, এবং রাধী আসিয়া খোকার ভার গ্রহণ করিল, ততক্ষণ আর মৃণালের অন্য কোনও ভাবনা ভাবিবার অবকাশ হইল না।

ইহারই মধ্যে চৈত্র মাসের চন্‌চনে রোদ উঠিয়া চারিদিক্ গরম হইয়া উঠিয়াছে। চিনি, টিনি উবু ঝুঁটি ও গাছকোমর বাঁধিয়া রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে পুকুরঘাটে চলিল, যতক্ষণ সম্ভব সেইখানে কাটাইয়া, জল ঘাঁটিয়া আসিবে। গরমের দিনে পুকুরঘাটের মত আরামের জায়গা আর কোথায়? খোকাও একেবারে প্রাকৃতিক বেশে সজ্জিত হইয়া, রাধীর কোলে চড়িয়া তাহাদের সঙ্গে চলিল।

মৃণাল জিজ্ঞাসা করিল, "আমিও স্নান ক'রে আসব নাকি ওদের সঙ্গে মামীমা? বড় গরম লাগছে।"

মামীমা বলিলেন, "কাজ নেই বাপু, কে কোথায় কি ব'লে বসবে। তোর ত আবার কথা সয় না।"

মৃণাল বলিল, "না সইবার মত কথা হ'লে সইবে কি ক'রে? তা হ'লে কি ঘরেই তোলা জলে নাইব?"

মামীমা বলিলেন, "আমার সঙ্গে যাস্ এখন দুপুর বেলা।"

মল্লিক-মহাশয় বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া বলিলেন, "আজ দুধ অনেকটা হ'ল, পায়েস কর না, মিনু এসেছে।"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "আমি ত মস্ত খানেওয়ালা।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "খানেওয়ালা এখন জোর ক'রে হ'তে হবে। যে মা-বাপের মেয়ে তুমি। মা-টি ত জন্ম দিয়েই বিদায় হলেন, বাপও এই বয়সে ধুঁকছেন, কতদিন আর টিকবেন জানি না।"

গৃহিণী রান্নাঘরের ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃগাঙ্কের চিঠিপত্র আর কিছু পেলে নাকি?"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "এই ত পেলাম একটা পোষ্টকার্ড। হাঁপানি আরও বেড়েছে ব'লে লিখেছে। বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল।"

মৃণাল ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিন হ'ল বাবার এ-রকম হয়েছে?"

তাহার মামীমা বলিলেন, "ভাল আর সে আছে কবে? আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে এখন একেবারে শয্যা নিয়েছে। যে অল্পেয়ে গুষ্টি, ভয় করে বাপু। ভালয় ভালয় এদের দুইহাত এক হয়ে গেলে বাঁচি।"

মৃণাল মুখ ফিরাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "গতিক কিছু সুবিধের ঠেকেছে না। মিনুর বিয়েই না শেষে আটকায়। আজ আবার বুড়ো ডেকে পাঠিয়েছে, যদি দেখি দু-এক শ-ও নামতে রাজী, তবে একেবারে পাকাপাকি ক'রে আসব, বৈশাখের প্রথম যেদিন শুভদিন আছে সেদিনই বিয়ে দিয়ে দেব। তুমি এত তাড়াতাড়ি সব গোছগাছ করতে পারবে ত ?"

গৃহিণী বলিলেন, "সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি সম্বন্ধটা ঠিক কর ত, আর দিন ঠিক কর। আমি কি আর চুপ ক'রে ব'সে আছি নাকি এতদিন ? আস্তে আস্তে গুছিয়ে রাখছি না ? কাপড়-চোপড়, গহনাগাঁটি, বাসনকোশন, সবই ত ঠিক। জানিই মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে, ওখানেই হোক কি অন্য কোনোখানেই হোক। তা দু-এক শ কমালেই যে বিয়ে দেবে বলছ, দেবে কেমন ক'রে ? সম্বল ত ঐ পাঁচশ টাকা ? আর গহনা ক-খানা কি মেয়ে পরবে না ? তাও ঘুচিয়ে ঐ হাড়কিপ্পন মিন্‌ষেকে দেবে ? আমরা আর কত দিতে পারব ? বিয়ের সব খরচই ত আমাদের করতে হবে। এরই মধ্যে কাপড়চোপড় বাসনকোশন করাতে শ-দুই খরচ হয়ে গেছে। তা বাদে আইবুড়-ভাতের খরচ, বিয়ের দিনের খরচ, যেমন-তেমন একটা ফুলশয্যার তত্ত্ব, এ-সব ত প'ড়েই আছে। পোষ্ট অপিসের টাকা ক-টা ত শেষই হবে, তা বাদে বাড়ীঘর বাঁধা দিতে চাও না কি ? নিজের মেয়ে আছে দুটো, তাও মনে রেখো।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "তা কি আর মনে নেই ? সবই মনে আছে। কিন্তু মিনির বয়স যে অনেক হয়ে গেল, আর ত রাখা যায় না ? না-হলে এ-সম্বন্ধ ছেড়ে অন্য সম্বন্ধ দেখতাম। তার উপর

মৃগাঙ্ক অসুখে প'ড়ে বিপদ্ বাধিয়েছে। কুডাক ডাকতে নেই, তবু ভালমন্দের কথা বলা যায় না। তা হ'লে ত বছর-খানেকের মত বিয়েই বন্ধ। সে-দিক্‌টা দেখতে হবে ত? তাই ভাবছি, কি আর হবে অত দরাদরি ক'রে, বিয়েটা দিয়েই দিই। গহনা ত ওরা বেশী চাচ্ছে না, না-হয় গিরির দেওয়া হাঁসুলিটা বেচে দিই, তাতে শ-দুই হবে ত? তাতেই কোনও মতে কাজ উদ্ধার করব। অন্য খরচ সব খুব সংক্ষেপে করব।"

গৃহিণী মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "সংক্ষেপে কর বললেই অমনি করা যায় কিনা? কোন্‌টা তুমি বাদ দেবে শুনি? যেখানে যা ত্রুটি হবে, অমনি গাঁয়ের লোক খোঁটা দেবে ত? বলবে, নিজের মেয়ে হ'লে আর এমনটা হ'ত না। নাও, ব'স।"

তিনি পিঁড়ি পাতিয়া স্বামীর জন্য সকালের জলখাবার আনিয়া দিলেন। মল্লিক-মহাশয় খাইতে বসিলেন। গৃহিণী রান্নাঘরের দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া, বলিতে লাগিলেন, "গহনা বেচায় আমার মত নেই বাপু। মা-মরা মেয়ে, ওর মা সোনারূপো যা দু-চার কুচি রেখে গেছে ওরই থাক্। বড় ঠাকুরঝিও তার দেওয়া জিনিষ বেচে দিলে বিরক্ত হবে। তার চেয়ে বুড়োকে বোঝাও, পাঁচ-শ এখন নিক, বাকি দু-শ আমরা পূজোর পর দেব। তখন ধান-টান আদায় হবে, খাজনাও কিছু পাওয়া যাবে, মিনিকে কলকাতায় যেমন হোক ক'রে মাসে আট-দশ টাকা দিচ্ছিলে ত, সেটাও এ ক'মাস লাগবে না। তারপর ভগবানের ইচ্ছায় ওর বাপ ভাল হয়ে উঠে যদি কাজে ফের লাগতে পারে, তা হ'লে সেও কিছু দিতে পারে। সেও বারো-চোদ্দ টাকা মাসে মাসে মেয়েকে দিচ্ছিল ত? জুড়ে তেড়ে দু-শ এক রকম ক'রে হয়ে যাবে বাপু।"

মল্লিক-মহাশয় দুধের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বলিলেন, "তোমার পরামর্শ ত ভাল, এখন বুড়ো বাগ মানলে হয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "মানবে আবার না। এর চেয়ে ভাল সম্বন্ধ ও পাচ্ছে কোথায়? পঞ্চুর শুনি মেয়ে খুব পছন্দ।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "তা হ'তে পারে। আমাকে দেখলেই ছোক্‌রা খুব ঘটা ক'রে প্রণাম করে, আশেপাশে ঘুর ঘুর করে, কিছু একটা বলবার ইচ্ছে বোধ হয়। তা শেষ অবধি আর সাহসে কুলোয় না।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের মেয়ে কি মন্দ? বিয়ের পর মিলে মিশে থাকে তবেই বাঁচি বাপু। মিন্থুর ত এখন দেখি ওকে মনে ধরে না। তা বিয়ে হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। হাজার হোক হিন্দুর মেয়ে ত? মেমসাহেব ত আর সত্যই নয়?"

মল্লিক-মহাশয় আর কথা না বলিয়া উঠিয়া গেলেন। গৃহিণী নিজের কাজে গিয়া ভিড়িয়া গেলেন। মৃণাল মামাবাবুকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া আবার মামীমার কাছে ফিরিয়া আসিয়া তরকারি কুটিতে বসিল। এখানে তাহার বিবাহের কথাই হইতেছে তাহা সে আন্দাজে বুঝিয়াছিল, তাই এতক্ষণ এদিক্ মাড়ায় নাই। তাহার মামীও এখন আর সে কথা না তুলিয়া তাড়াতাড়ি রান্না সারিতে লাগিলেন।

রৌদ্র ক্রমেই প্রখরতর হইয়া উঠিল বাহিরের দিকে আর চাওয়া যায় না। গৃহিণীর রান্না শেষ হইয়া গিয়াছে, তিনি বলিলেন, "দেখছিস্ ছুঁড়ীদের রকম, এখনও ঘাট থেকে ফিরল না, সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছে। জল ঘেঁটে একটা জরজাড়ি না বাধালে তাদের আর

চলছে না। আর রাধীর আক্কেলকে বলিহারি যাই, ছেলেটাকে যে নিয়ে গিয়েছে তার খেয়ালই নেই। রোদে মাথার চাঁদিটা উড়ে যাবে একেবারে।"

মৃণাল উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া বলিল, "আসছে বোধ হয় এইবার। চিনি, টিনির গলা পাচ্ছি যেন।"

তাহাদের মা বলিলেন, "গলা না ত কাঁসর বাজছে, এক ক্রোশ দূর থেকে শোনা যায়। ওগুলো এলে, ভাত খেতে বসিয়ে দিয়ে আমরা নেয়ে আসতে পারি।"

ছেলেমেয়েরা আসিয়া পড়িল। খোকা স্নান করিয়া আসিয়াছে। রাধী তাহাকে আঁচল চাপা দিয়া আনিয়াছে, তবু রৌদ্রের উত্তাপে তাহার সুন্দর মুখ একেবারে টুক্ টুক্ করিতেছে। গৃহিণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোর কি আক্কেল না? কচি ছেলেটাকে এই কাঠফাটা রোদে এমনি ক'রে আনে?"

রাধী খোকাকে দাওয়ায় নামাইয়া দিয়া বলিল, "কি করি মা-ঠাকরুণ? ইঁয়ারা কি আসতে চান? কত ব'লে কয়ে তবে আনছি। কেউ এদের সাথে লারবেক্ মা।"

গৃহিণী বকিতে বকিতে চিনি, টিনি ও খোকার ভাত বাড়িয়া তিন-জনকে বসাইয়া দিলেন। তাহার পর রান্নাঘরের সিঁড়ির কাছে রাধীকে পাহারায় বসাইয়া বলিলেন, "চল্ মিনু, যাই এইবার, কাপড় গামছা নে।"

মৃণাল কাপড় চোপড় গুছাইয়া লইয়া বলিল, "খোকা নিজে খেতে পারবে?"

খোকার মা বলিলেন, "ছড়াক ব'সে খানিকক্ষণ, আবার ত আমার সঙ্গে বসবেই?"

দুইজনে শাড়ী-গামছা পুরু করিয়া পাট করিয়া মাথার উপর রাখিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। এত রোদ মাথায় সয় না, অথচ পাড়াগাঁয়ে মেয়েছেলের মাথায় ছাতা দেখিলে তখনই প্রলয় ঘটিয়া যাইবে।

লাল কাঁকরের পথ, রোদের তেজে তাতিয়া আগুন হইয়া আছে, হাঁটাই দুঃসাধ্য। মৃণাল বলিল, "বাবা, পায়ে যেন ফোস্কা প'ড়ে যাচ্ছে। কাল থেকে একেবারে ভোরবেলায় স্নান ক'রে যাব। তোমাদের গাঁয়ে ত পায়ে জুতোও চলবে না, মাথায় ছাতা ত স্বপ্নেরও অতীত।"

মামীমা হাসিয়া বলিলেন, "তাই করিস্। এই গাঁয়েই যখন জীবন কাটবে, তখন আর পাঁচজনের মত না চ'লে উপায় কি?"

যে- কথাটা তাহার কানে সব চেয়ে অসহ্য তাহাই যেন সকলে জেদ করিয়া মৃণালকে শোনায়। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সে বলিয়া ফেলিল, "তা কে জানে মামীমা, ভগবান্ কার জন্যে কোথায় জায়গা ক'রে রেখেছেন, তা কি আর মানুষ জানে?"

মামীমা বলিলেন, "তা বটে বাছা, তবে সম্ভব-অসম্ভবের একটা কথা আছে ত? তাই বললাম আর কি?"

পুকুরঘাট বেশী দূর নয়, কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা আসিয়া পড়িলেন। ঘাট এখন ভরপুর, পল্লীরমণীদের স্নানের এই প্রকৃষ্ট সময়। অনেকেই হাসিয়া নবাগতাদের সম্ভাষণ করিল। মল্লিক-গৃহিণীও হাসিয়া উত্তর দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিলেন। মৃণালের মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর, তাহার হাসি ফুটিতে-না-ফুটিতে মিলাইয়া গেল। পিছনে একটি কিশোরী বউ অর্দ্ধস্ফুট স্বরে মন্তব্য করিল, "ইস্, লিখিপড়ির দেমাক দেখ না। আমরা যেন কথা বলার যুগ্যিই নয়।"

চক্রবর্তীদের বড় বউ কুসুম ঘন ঘন ডুব দিয়া স্নান করিতেছিল। সে মৃণালের দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাগ্নী কখন এল গো দিদি ?"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "এল কাল। তারপর তোদের সব খবর কি ?"

কুসুম নিয়মমত ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, "খবর ভাল গো, আজ সাঁঝে শুনতেই পাবে।"

মৃণাল কথা না বলিয়া স্নান করিতে লাগিল। তাহার মামীমাও ভাগ্নীর ফিরিবা'র তাড়া জানিতেন, কাজেই তিনিও আর কথাবার্ত্তায় দেরি না করিয়া তাডাতাডিই স্নান সারিয়া উঠিলেন। তাহার পর ভিজা কাপডের উপর লাল-গামছা জডাইয়া দুইজনে ফিরিয়া চলিলেন। পথের উত্তাপে এবার তেমন কষ্ট হইল না।

বাড়ী আসিয়া, কাপড ছাডিয়া, ভিজা কাপড নিঙ্‌ড়াইয়া বাঁশের উপর মেলিয়া দিয়া গৃহিণী রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিলেন। চিনি, টিনি একরকম ভাল করিয়া খাইয়া এঁটো হাতে মুখে দাওয়ার ধারে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ঝগডা করিতেছে। খোকা রাধীর কোলে ঘুমাইতেছে।

মল্লিক-গৃহিণী মৃণালকে ডাকিয়া বলিলেন, "মিনু, খেয়ে নিবি নাকি ?"

মৃণাল নিজের কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে বলিল, "তোমাদের সঙ্গে বসলেই ত হয়।"

তাহার মামীমা বলিলেন, "তোর মামাবাবুর ফিরতে এখনও দেরি আছে। তোর পিত্তি চুঁইয়ে যাবে যে ? আমার না-হয় অভ্যেস হয়ে গেছে।"

মৃণাল বলিল, "তোমার যা সুবিধে হয় কর।"

গৃহিণী ভাত বাড়িয়া তাহাকে খাইতে বসাইয়া দিলেন। তাহার

পর খোকাকে কোলে করিয়া মৃণালের কাছে আসিয়া বসিলেন। রাখী ছাড়া পাইয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

দুপুর বেলা আর কোনও কাজ নাই। মামাবাবু ফিরিবার পর খোকাকে সে খানিকক্ষণ লইয়া বেড়াইল, কারণ ক্ষুদ্র মহারাজ তখন জাগিয়া উঠিয়াছেন। মামীমা সেই অবসরে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লইলেন। খোকা আবার মায়ের পাতের কাছে গিয়া দু-চার গ্রাস ভাত খাইয়া আসিল।

খাওয়া সারিয়া, রান্নাঘরে শিকল তুলিয়া দিয়া মল্লিক-গৃহিণী শয়নকক্ষে আসিয়া ঢুকিলেন। বলিলেন, "খোকাকে দু-বার চাপড়ে দে, এখনি ঘুমিয়ে পড়বে।"

খোকার পদ্মকোরকের মত চোখ দুটি সত্যই বুজিয়া আসিতেছিল। সে মাকে দেখিয়া, হাত বাড়াইয়া তাঁহার কোলে গিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল।

বিছানায় ছেলেকে শোয়াইয়া মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "তুইও একটু গড়িয়ে নে না?"

মৃণাল বলিল, "দিনে ঘুমানো অভ্যাস নেই ত? এখন ঘুমুলে রাত্তিরে আর ঘুম হবে না। পরীক্ষাটা হয়ে গিয়ে যেন অথৈ জলে পড়েছি, সময় আর আমার কাটে না।"

মামীমা বলিলেন, "শেলাই-টেলাই করবি? কাপড় ত অনেক কেনা আছে। নিজে ত সময় পাই না, কলও নেই। মনে করেছিলাম, ব্লাউস ক'টা জমিদার-বাড়ীর দরজীকে দিয়ে করিয়ে নেব, আর সেমিজ-সায়াগুলো তোতে-আমাতে কোনও মতে ক'রে নেব। সময়ও ত বেশী নেই।"

মৃণাল নিরুৎসাহ ভাবে বলিল, "তা দাও দেখি কি করতে পারি।"

মামীমা একটা নূতন ট্রাঙ্ক খুলিয়া কাপড় বাহির করিতে লাগিলেন। এ-ট্রাঙ্কটি মৃণাল আগে দেখে নাই, বোধ হয় তাহার জন্যই এটা কেনা হইয়াছে। মল্লিক-গৃহিণী গোছানী মানুষ, মৃণালের বিবাহের কথা ওঠার সময় হইতেই তিনি অল্পে অল্পে জিনিষপত্র জোগাড় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক দিনে ত সব হইবার নয়?

উপরে কয়েকটা লংক্লথ ও মার্কিনের টুকরা। দুইটি অর্দ্ধসমাপ্ত সেমিজও রহিয়াছে। মামীমা বলিলেন, "এই ত সবে আরম্ভ করেছি। তুই আজ এইগুলি শেষ কর্, কাল আর দুটো সেমিজ কাটব। তারপর বডি রয়েছে, সায়া রয়েছে। ভাল ব্লাউস চারটে দরজী দিয়ে করিয়ে দেব। তোর আছেও ত ক'টা? আর কি সুতী ব্লাউসের কাপড় কিনব? অত পরবি কখন? সারাদিন ত হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে কারবার হবে এর পর, অত জামা পরবার অবসর হবে কখন?"

মৃণাল বলিল, "যা তুমি ভাল বোঝ কর মামীমা। কি লাগে না-লাগে অত শত আমি জানি না।" সে শেলাই করিতে আরম্ভ করিল।

মামীমা যে তাহার উৎসাহের অভাব লক্ষ্য না-করিলেন তাহা নয়, তবে সেটাকে আমল দিলেন না। উপরের কাপড়গুলা টানিয়া নামাইয়া নীচের ব্লাউসের কাপড় শাড়ী প্রভৃতি মৃণালকে দেখাইতে লাগিলেন। মৃণাল ত চোখ বুজিয়া থাকিতে পারে না, তাহাকে দেখিতে হইল। একখানি লাল বেনারসী শাড়ী, জরির বুটিদার, আর একখানি কমলালেবু রঙের বিষ্ণুপুরী গরদ, তাহার পাড় ও আঁচল জরির। একখানি দামী ঢাকাই শাড়ী, তিনচারখানা অল্প দামের অথচ বাহারে শাড়ী, কোনওটা বা মাদ্রাজী কোনওটা বা দেশী।

পাড়াগাঁয়ের মানুষ মামীমা, অত রকমারি কাপড়ের নাম জানেন না। যা জানা ছিল, তাহাই ফরমাশ দিয়া গ্রামের দোকানদারের মারফতে আনাইয়া রাখিয়াছেন।

শাড়ী দেখানো শেষ হইলে, মামীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর পছন্দ হয়েছে?"

মৃণাল সংক্ষেপে বলিল, "ভালই ত হয়েছে।"

২৩

বীরেনবাবুর মায়ের সকাল বেলাটা স্নান আহ্নিক করিতেই কাটিয়া যাইত, বাড়ীর কাজে হাত দিবার অবসর এগারোটা বারোটার আগে বড় হইত না। প্রয়োজনও বিশেষ হইত না। বাড়ীতে বউ-ঝি অনেকগুলি, তাহারাই সংসারের কাজ চালায়। বৃদ্ধার নিজের রান্নাও অধিকাংশ দিন বড় নাতনী বা ছোট বউ করিয়া দেয়, কখনও কখনও তিনি নিজে করেন সখ করিয়া বা ঝগড়া করিয়া। তবে নিজের সংসার, কর্ত্রী তিনিই, একেবারে রাশ ছাড়িয়া দিলে লোকে তাঁহাকে মানিবে কেন? সুতরাং মধ্যে মধ্যে তিনি ঘরকন্নার কাজে যোগ দিতেন, সমালোচনা করিতেন, দোষত্রুটি ধরাইয়া দিতেন।

সকাল আটটা হইবে, ইহারই মধ্যে রোদ চড়চড় করিতেছে। বৃদ্ধা পুকুরঘাট হইতে ফিরিতেছেন। অঙ্গে ভিজা কাপড়, মাথায় পাট করা ভিজা গামছা, তবু গরমে গা জ্বালা করিতেছে। সঙ্গে একটি নাতনী, সে এক কলসী জল বহিয়া আনিতেছে ঠাকুরমার জন্য। যে সে যেমন তেমন ভাবে জল আনিয়া দিলে তাঁহার কাজ চলে না। তাই স্নান করিতে যাইবার সময় সর্ব্বদা তিনি একজন কাহাকেও সঙ্গে

করিয়া লইয়া যান, সে তাঁহার সামনে ভাল মতে স্নান করিয়া, ভিজা কাপড়ে জল বহিয়া আনে।

সদর দরজার কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় কে তাঁহার পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে জিজ্ঞেসা করিল, "কেমন আছেন ঠাকুরমা?"

নাতনীটি তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকিয়া গেল, কারণ আগন্তুক তাহার অপরিচিত। বৃদ্ধা ভাল করিয়া মানুষটির দিকে তাকাইয়া খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কখন্ এলে ভাই? বেঁচে থাক, একশ বছর পরমায়ু হোক। বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছ ত বুড়ীকে? সেই রকমই ত কথা ছিল।"

বিমল বলিল, "নেমন্তন্ন করবার ইচ্ছের ত বিন্দুমাত্র অভাব নেই ঠাকুরমা, তবে ভাগ্যে থাকলে ত? দেখা যাক ভগবান্ সুদিন দেন কিনা।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "হ্যাঁ, ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব। বেটাছেলে বিয়ে করতে চাইলে বিয়ে হবে না এমন জগতে কোথাও দেখেছ? তা ভাই ভিতরে চল বসবে, আজ দুটো ডালভাত এখানেই খেতে হবে কিন্তু।"

বিমল বলিল, "সে ত অবিশ্যি, আপনার এখান ছাড়া খেতে যাবই বা কোথায়?"

বৃদ্ধা তাহাকে বৈঠকখানা ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "বীরু ওখানে আছে, তুমি ব'স ভাই, আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি।"

বিমল বৈঠকখানায় ঢুকিয়া দেখিল, বীরেনবাবু আরাম করিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন। তাহাকে দেখিয়া তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। বিমল তামাক খায় না, কাজেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "চা

টা কিছু আনিয়ে দিই বাবা? এত সকালে কোন্ ট্রেনে এলে? খেয়ে বেরোও নি নিশ্চয়ই?"

বিমল বলিল, "চা হলেও হয়, না হলেও দুঃখ নেই। ভোরে এক পেয়ালা খেয়ে বেরিয়েছি। ট্রেন আর কোথায় পাব বলুন? দশটার আগে ত গাড়ী নেই। ক' মাইল বা দূর, হেঁটেই চলে এলাম।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "বেশ, বেশ, এই ত চাই। তোমাদের বয়সে আমরা এবেলা ওবেলা দশ বিশ মাইল রোজ হেঁটেছি। তবে তোমরা এখন সব শহরবাসী হয়েছ, রাস্তার এপার থেকে ওপার যেতে হলে ঘোড়ার গাড়ী চেপে যাও। ও খেঁদী, শুনে যা রে!"

লাল শাড়ীর আঁচল কোমরে তিন-চার পাক জড়াইয়া খেঁদী আসিয়া দাঁড়াইল। বীরেনবাবু বলিলেন, "বল্‌গে যা দিদিমাকে, একজন মামাবাবু এসেছে, কিছু জলখাবার দিতে। চা যদি থাকে, চাও যেন ক'রে দেয় একবাটি।"

বিমল বলিল, "ব্যস্ত হতে হবে না, দরজার সামনেই ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে, খাবার জোগাড় তিনি করছেনই। চা আপনাদের এখানে চলে নাকি?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "রোজই কি আর দুবেলা চলছে? তবে সর্দ্দি টর্দ্দি হলে খাই বই কি? একটু আদা দিয়ে চা না খেলে শরীরটায় যুৎ হয়না। তা মামার বাড়ী এলে বুঝি? পরীক্ষার খবর বেরুচ্ছে কবে? এর পর কি আইন পড়বে?"

বিমল বলিল, "না, মামার বাড়ী ঠিক আসিনি। তবে তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে যাব। পরীক্ষার খবর বেরতে এখনও ঢের দেরি। আইন পড়বার ইচ্ছে নেই, বেকার উকিলে ত কলকাতার রাস্তাঘাট ছেয়ে গেছে, আর তাদের দলবৃদ্ধির প্রয়োজন নেই।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "তাহ'লে কি এম-এ পড়বে?"

বিমল বলিল, "বোধ হয় না। খরচ দেবে কে? যে রকম পরীক্ষা দিলাম, তাতে স্কলারশিপ পাবার আশা নেই। চাকরী-বাকরীর চেষ্টা দেখছি।"

এমন সময় খেঁদী ও তাহার একটি বড় ভাই মিলিয়া দুই থালা জল-খাবার বহন করিয়া আনিল। বিমল বলিল, "এই সকালে এত খেতে পারব না আমি।"

বৃদ্ধা পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কিই বা দিয়েছি, এর চেয়ে কম মানুষকে দেওয়া যায়? যা নিখাকি তুমি, জানি ত? যেটুকু পার মুখে দাও, পাড়াগাঁ জায়গা ভাই, এখানে ত হট্‌ করতে সন্দেশ রসগোল্লা পাওয়া যায় না? ঘরেই যে যা পারে, তৈরী করে।"

বিমল কথা না বাড়াইয়া খাইতে আরম্ভ করিল। মাঝে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "মল্লিক মশায়ের বাড়ীর তাঁরা সব ভাল আছেন?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "ভালই সব। মিনি পরীক্ষা দিয়ে এখানে এসেছে। পঙ্কুর সঙ্গে বিয়ের কথা প্রায় ঠিক, তবে দর-কষাকষি এখনও শেষ হয় নি।"

বিমল জলের গেলাস তুলিয়া এক চুমুক খাইয়া বলিল, "আর পারলাম না ঠাকুরমা, এ থালাটা আপনার নাতি-নাতনীদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিন।"

নাতিনাতনীরাই আসিয়া থালা ঘটি লইয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধা বলিলেন, "যাই, দেখি গে কি রান্না করছে এ বেলা। নাতি শেষে খেয়ে গিয়ে নিন্দে করবে। একেই ত চা দিতে পারলাম না। বুড়ো হয়েছি, সব কথা কি মনে থাকে? আর ঘরে যত লোক থাক না, বুড়ী যা না দেখবে, তা আর হবার জো নেই।"

তিনি ভিতর বাড়ীর পথে প্রস্থান করিলেন। বীরেনবাবু হুঁকাটা ঘরের কোণে ঠেসাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "চল দু'পাক ঘুরে আসা যাক, রান্নাবান্না হতে এখনও ঢের দেরি। এখানে মানুষের আর কাজ কি বল? একবার খাওয়া হলে, কতক্ষণে আর একবার রান্না হবে তাই খালি ব'সে ব'সে মিনিট গোনে। আগে তোমার মামার বাড়ীর দিকে যাবে নাকি?"

বিমল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই চলুন।"

পঞ্চাননের সঙ্গে সেই ঝগড়ার পর আর তাহার দেখা হয় নাই। দেখা করিবার বিশেষ ইচ্ছাও ছিল না, তবে চিরকাল একজন আর একজনকে এড়াইয়া চলিবে, তাহার পরিচিত জগৎ এত বড় নয়।

সৌভাগ্যক্রমে পঞ্চানন তখন বাড়ী ছিল না। সকালে খাইয়াই দেশোদ্ধার ও সমাজ-উদ্ধারের কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল। বিমল ভিতরে ঢুকিয়া যত দিদিমা, মাসীমা, ও মামীমাদের সম্ভাষণ করিতে লাগিয়া গেল। ঘরের গৃহিণী বড় দিদিমা গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "নাতির ত আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না, বুড়ীরা বেঁচে আছে কি মরেছে তারও খোঁজ নেও না। সব শহরবাসী সাহেব হয়েছ।"

বিমল হাসিয়া বলিল, "তোমরাই বা আমার কোন্ খোঁজ রাখ দিদিমা? এত যে আম কাঁঠাল ঘরে, তা বৎসরান্তে একবারও ত খেতে ডাক না? না ডাকলে মামার বাড়ী কি আসতে আছে? মান থাকবে কেন?"

দিদিমা একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তা বলতে পার ভাই। কি করি বল? এই বুড়োর অসুখে হাড় ভাজা ভাজা হয়ে উঠেছে, আর কোনো দিক দেখবার অবসর আছে? নিত্যি তাঁর হাঁপানি। তা এই

তোমার মেজ মামার বিয়ের সময় ঘনিয়ে এল, মনে করেছিলাম সবাইকে ডেকে একবার এক ঠাঁই করব। আমাদের কি অসাধ ?"

বিমল ন্যাকা সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় বিয়ের ঠিক হ'ল দিদিমা ? এই মাসেই বিয়ে নাকি ?"

দিদিমা বলিলেন, "দূর্, একেবারে মেলেচ্ছ হয়ে গেছিস্ তোরা, চৈত্র মাসে কখনও বিয়ে হয় হিঁদুর ঘরে ? বৈশাখে বিয়ে হয়। ঐ মল্লিকের ভাগ্নী মিনির সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছে, তা একেবারে ঠিক হয়নি। মেয়ে আমরা পছন্দ করেছি বটে, তা মিনষে হাড়-কিপ্পন, পয়সা বার করতে চায় না। এমন কিছু লাখ টাকা আমরা চাইনি। হাজার টাকা পণ, আর গহনা যা না হলে নয়, তাই। তাও দিতে চায় না, বলে পাঁচশ বিয়ের সময় দেবে, আর বড় জোর তিনশ পরে পূজোর সময় দেবে। এতে কি পোষায় ভাই, তুমিই বল ? আমদের অমন ছেলে।"

বিমল বলিল, "তা দিদিমা, মামার ওজনে টাকা নিতে চাও নাকি ? তাহলে রাজা-রাজড়া ছাড়া পেরে উঠবে না।"

দিদিমা ঠাট্টাটা বুঝিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন, "কেন ওজন দরের কথা কি হল ? তোর মামা কি পাত্র হিসাবে মন্দ, না আমাদের ঘর মন্দ ? তোর মত বি-এ পাস না-হয় নাই করেছে, তা ইংরিজি বেশী জানলেই কি মানুষ বড় হয় ?"

বিমল বলিল, "বি-এ পাস ত আমিও এখনও করিনি, আর আমাকে কেউ বিনা পণেও নেবে না। যাকগে, আমার অত কথায় কাজ নেই। মামারা সব গেল কোথায় ?"

দিদিমা বলিলেন, "তোর বড় মামা ত এখানে নেই, ভিন্ গাঁয়ে গেছে কাজে, দিন পাঁচ পরে ফিরবে। পঞ্চু সকালে কোথায় বেরিয়েছে, আসবে এখনি। ততক্ষণ বোস না, কিছু খা।"

বিমল বলিল, "ঐটি হবে না দিদিমা। বীরেনবাবুদের বাড়ী এইমাত্র একপেট খেয়ে এলাম। আবার সেখানকার ঠাকুরমা কোমর বেঁধে রাঁধতে ব'সে গেছেন, দুপুরবেলা খাওয়াবেন ব'লে, তবেই দেখ রাত্তিরের আগে আর তোমার এখানে পাত পাততে পারছি না।"

দিদিমা বলিলেন, "এই ত নাতির কত টান মামার বাড়ীর উপর তা বোঝাই যাচ্ছে। আগে ভাগে পেট ভরিয়ে তবে দিদিমার ঘরে এসেছিস্। আচ্ছা, আর কিছু না খাস্, একটু কাঁঠাল খেয়ে যা। বাড়ীর কাঁঠাল, আজ সবে ভেঙেছি।"

কাঁঠাল খাইতে বিমলের যথেষ্ট আপত্তি ছিল। কিন্তু দিদিমাকে বেশীরকম চটাইয়া দিলে তাহা সুযুক্তির কাজ হইবে না। অগত্যা প্রাণের মায়া ছাড়িয়া তাহাকে একটু খাইতেই হইল।

দিদিমা বলিলেন, "এই হয়ে গেল? যত সব শহুরে খোসখোরাকী বাবু। দুদিন আগে আর একটা কাঁঠাল ভেঙেছিলাম, এত বড়ই। তোর দুই মামা মিলে ত তার অর্দ্ধেকটা শেষ করল।"

বিমল উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া বলিল, "তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনা হয় কখনও? তাঁদের পেটে ব্রহ্মণ্যিতেজ কত? আর আমি, যা বলেছেন, একেবারে মেলেচ্ছ।"

দিদিমার কাজ পড়িয়াছিল, তিনি বলিলেন, "ঐ ঘরে চল্, তোর মামী আছে কথা বলবি। আমার আবার যত কাজ এই সকালে। বুড়োর পাঁচন সেদ্ধ করতে দিয়ে এসেছি, না দেখলে পুড়ে যাবে।"

বিমল বলিল, "আর একটু ঘুরে আসি, দিদিমা। মামী যা গল্প করবে তা ত জানি, কলাবউয়ের মত দেড় হাত ঘোমটা টেনে ব'সে থাকবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "নূতন বউ, লজ্জা ত করবেই। আমাদের বাড়ীতে ত মেমসাহেবীর চলন নেই।"

বিমল বলিল, "তাই ত বলছি। মামী কত লজ্জাশীলা তা দেখতে ত বেশী সময় লাগবে না, এক মিনিটেই বুঝে নেব। বাকি সময়টা করব কি? তার চেয়ে ঘুরেই আসি, না হয় বাইরে দাদামশায়ের কাছে বসি।"

দিদিমা বলিলেন, "তা যা. বুড়ো কি আর ঘরে আছে? দেখগে যা।" তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

বিমল বাহিরে চলিল। মামীটি যদি অতখানি কলাবউ না হইত, ত তাহার কাছে কছু খবর পাওয়া যাইত। কিন্তু সে আশা নাই। বুড়ো দাদামশায়ের কাছে যদি কিছু খোঁজ পাওয়া যায়, এই আশায় সে বাহিরের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সেখানে দাদামশায় নাই, স্বয়ং পঞ্চানন মুখ গোঁজ করিয়া বসিয়া আছে। বাড়ীতে ফিরিয়াই সে ছেলেমেয়েদের কাছে বিমলের আগমন-সংবাদ পাইয়াছে। তাহাতে সকালেই তাহার মেজাজটা সপ্তমে চড়িয়া গিয়াছে।

বিমলও তাহাকে দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল। এতখানি ঝগড়ার পরে কি বলিয়া কথা আরম্ভ করা যায়? পঞ্চাননই তাহাকে সুবিধা দিল। মুখ হাঁড়ি পানা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ এখানে কি মনে ক'রে?"

পঞ্চানন তাহাকে বসিতে বলিল না, তথাপি চৌকির উপর বসিয়া বিমল বলিল, "কি আর মনে ক'রে? ছুটির সময়টা একটু টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি।"

পঞ্চানন ভদ্রতা দেখাইবার চেষ্টা করিল, বলিল, "সকালে কিছু খেয়েছ ?"

বিমল বলিল, "অনেকবার। আর সারাদিনের ভিতর কিছু খাবার ইচ্ছে নেই। আচ্ছা ব'স. একটু ঘুরে আসি।"

পঞ্চানন তাহার দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল. "কি উদ্দেশ্যে এসেছ, খুলে বল দেখি ?"

বিমল বলিল, "খুলে বলবার প্রয়োজন দেখছি না, আমার উদ্দেশ্য তুমি না জান এমন নয়।"

পঞ্চানন বলিল, "আমি সদুপদেশ দিচ্ছি, এ বৃথা চেষ্টার থেকে ক্ষান্ত হও, দেশে ফিরে যাও। কেন শুধু শুধু একটা আত্মীয়-বিচ্ছেদ ঘটাবে ?"

বিমল বলিল, "তোমার সদুপদেশের জন্যে ধন্যবাদ। তবে পালন করতে পারলাম না, আমার দুর্ভাগ্য। আত্মীয়-বিচ্ছেদ ঘটাই বোধ হয় কলিকালের নিয়ম।" বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

রাগে তখন পঞ্চাননের সমস্ত গা কাঁপিতেছে। কিন্তু এখানে রাগ দেখানোর সুবিধা বড় কম। চারিদিকে বুড়াবুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, বালক-বালিকার দল। ইহাদের সামনে মারামারি ত করা যায়ই না, গালাগালিও করা যায় না। কলিকাতায় তাহারা দুজনেই নিরঙ্কুশ, কিন্তু এখানে মৃণালকে উপলক্ষ্য করিয়া ঝগড়া করা অসম্ভব। তাহা হইলে নিন্দার একশেষ হইবে। যে উদ্দেশ্যে ঝগড়া, প্রথমতঃ তাহাই বিফল হইয়া যাইবে। যে কন্যাকে লইয়া দুইজন যুবক বিবাদ করিতে পারে, তাহাকে বধূ রূপে গৃহে আনিতে পঞ্চাননের অভিভাবকেরা একেবারে অস্বীকার করিবেন। অন্য কোনো বরও পল্লীসমাজে সহজে তাহার জন্য জুটিবে না, তাহা হইলে বিমলেরই হইবে পোয়া বারো। এমন কাজ পঞ্চানন করিতে পারিবে না।

খানিক একলা বসিয়া থাকিয়া পঞ্চানন বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। এধার ওধার চাহিয়া মা বা জ্যাঠাইমা কাহাকেও দেখিতে পাইল না। দাওয়ার এক কোণে বসিয়া বৌদিদি তরকারি কুটিতেছে। দেবর হইলেও পঞ্চানন বৌদিদির সঙ্গে হাসি-তামাসা বেশী করিত না, ছ্যাব্‌লামি জিনিষটাই তাহার ধাতে ছিল না। কিন্তু এবার কলিকাতা হইতে আসার পর সে বৌদিদির সঙ্গে ভাব জমাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। বিপদ্‌কালে সাহায্য হয়ত ইহাকে দিয়া কিছু হইলেও হইতে পারে।

বৌদিদি ঘোমটাটা একটু ফাঁক করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে খুঁজছ ঠাকুরপো?"

পঞ্চানন বলিল, "তোমাকে ছাড়া আর কাকে খুঁজব?"

কুসুম ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "ইস্, এত সৌভাগ্য আমার সইবে না। সে-সব অন্য ভাগ্যবতীর জন্যে তোলা রইল।"

পঞ্চানন বলিল, "ভাগ্যবতীর ত আসবার কোনো লক্ষণ দেখছি না। তোমরা জোগাড় করছ কই?"

কুসুম বলিল, "অত অধৈর্য্য হ'লে চলে কখনও? কথাবার্ত্তা ত প্রায় পাকা। শ্বশুর মশায় আট শ অবধি নেমেছেন, তারা সাত শ অবধি উঠেছে, দেখতে দেখতে পাকা হয়ে যাবে। তারপর বোশেখ মাস পড়তেই বিয়ে, ভাবনাটা কি?"

পঞ্চানন কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় গরীয়সী জ্যাঠাইমাকে রান্নাঘর হইতে বাহির হইতে দেখিয়া সে সরিয়া পড়িল।

২৪

খোকাবাবুর ঘুম সকাল সকালই আসিয়া পড়ে, বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মের দিনে। দিদিদের সঙ্গে পুকুর ঘাটে গিয়া সমস্ত গায়ে জ্বালা ধরিয়া যায়, বাড়ীতে ছায়ায় আসিয়াই তিনি মায়ের কোলে ঢুলিয়া পড়েন। কোনও দিন রাধী তাহাকে ঘুম পাড়ায়, কোনও দিন তাহার মা। এখন মৃণাল আসিয়াছে, সেই খোকার ভার বেশীর ভাগ বহন করে।

আজও চিনি টিনি স্নানান্তে আসিয়া খাইতে বসিয়াছে, খোকাকে কোলে করিয়া মৃণাল ঘুম পাড়াইতেছে। এমন সময় বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা যেন তাহার হঠাৎ আছাড় খাইয়া পড়িল। এ কাহার গলার স্বর বাহিরে শুনিতে পাওয়া যায়?

বীরেনবাবু সদর দরজার কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "মল্লিকদাদা ঘরে আছ?"

মৃণালের মামীমা রান্নাঘর হইতে বলিলেন, "দেখ্ ত মিনি, কে ডাকে বাইরে, বীরু ঠাকুরপো যেন। বল্, উনি এখনও ফেরেন নি, সকালে বেরিয়েছেন।"

মৃণাল খোকাকে কোলে করিয়া সদর দরজার কাছে অগ্রসর হইয়া গেল। বিমলের দৃষ্টির সঙ্গে তাহার দৃষ্টি মিলিত হইতেই সে চোখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "মামা ত এখনও ফেরেন নি, আপনারা বসুন। এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরবেন।"

বৈঠকখানার দরজাটা ঠেলিয়া খুলিয়া সে আগন্তুক দুই জনকে ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইল। বিমল বুঝিল, বীরেনবাবুর সামনে তাহার সঙ্গে কথা বলিতে মৃণাল সঙ্কোচ বোধ করিতেছে, যদিও

বোর্ডিঙে মৃণাল দুই-তিনবার তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াছে। সে নিজেই কথা আরম্ভ করিয়া দিল মিথ্যা সঙ্কোচে এমন স্বর্ণ-সুযোগ ত নষ্ট করা যায় না?

জিজ্ঞাসা করিল, "পরীক্ষার রেজাল্টের খবর রাখেন কিছু?"

মৃণাল মৃদুস্বরে জবাব দিল, "কই শুনি নি ত কিছু। কাকে দিয়েই বা জানব? ক্লাসের দু'চারজন মেয়েকে ব'লে এসেছি, তারা যখন নিজেদের খবর নেবে, তখন সেই সঙ্গে আমারও খবর নেবে।"

বিমল বলিল, "রোল্ নম্বরটা আমায় দিয়ে দেবেন, আমি শীগ্গিরই কল্‌কাতা ফিরে যাচ্ছি। গোটা দুই-তিন চাকরির সন্ধান আছে, এখন থেকে গিয়ে তদ্‌বির না করলে জুটবে না। আপনি ত এখন আর ফিরছেন না?"

মৃণাল বলিল, "না।" আর বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া কথা বলা উচিত কিনা সে ভাবিতেছিল। মামীমা জানিতে পারিলে হয়ত রাগ করবেন। বিশেষ করিয়া বিমল আবার পঞ্চাননের আত্মীয় বীরেনবাবুকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "আমি আসছি, আপনারা একটু বসুন।"

বীরেনবাবু বলিলেন, "মল্লিকদাদার যদি বেশী দেরি থাকে ত ব'সে আর আমরা কি করব? অন্য দু'চার জায়গায় ঘুরে আসি বরং।"

মৃণাল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, তিনি বেশী দেরি করবেন না, এই এসে পড়লেন ব'লে। আমি মামীমাকে খবর দিচ্ছি।"

খোকা ততক্ষণ তাহার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিমল তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "খোকাকে শুইয়ে দিন না, ও ত দিব্যি ঘুমচ্ছে। ঘুমন্ত ছেলে বয়ে বেড়ানো, শক্ত ব্যাপার।"

মৃণাল খোকাকে কোলে করিয়া ভিতরে চলিল। মামীমা রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া চিনি, টিনির খাওয়া তদারক

করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "ওকে শুইয়ে দে রে, ঘুমে যে নেতিয়ে পড়েছে।"

মৃণাল বলিল, "বাইরে বীরুমামার সঙ্গে একজন ভদ্রলোক এসেছেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "তাই ত, মুস্কিল হল দেখছি। উনি কতক্ষণে আসবেন, কে জানে। ততক্ষণ কে ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে? নূতন মানুষ, কিছু যদি মনে করে?"

মৃণাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তুমি চল না মামীমা?"

মামীমা হাসিয়া বলিলেন, "যা বললে বাছা, আমি তোমার শহুরে মেমসাহেব কিনা, তাই হট্ হট্ ক'রে বৈঠকখানায় গিয়ে উঠব, অতিথিদের সামনে। ঐ যে ওঁর খড়মের শব্দ পাচ্ছি, বাঁচা গেল বাপু! তুই আর বাইরে যাস্‌নে। যা কাণ্ড-কারখানা এখানে, কোথা দিয়ে কে একটা গুজব তুলে দেবে।"

মৃণাল অগত্যা খোকাকে লইয়া শয়নকক্ষে চলিয়া গেল। বাহিরের ঘরে যাইবার জন্য তাহার মন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, কিন্তু সোজাসুজি মামীমার আদেশ অবজ্ঞাই বা করে কি করিয়া?

মল্লিক মহাশয় অতিথিদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। বিশেষ, বিমল পঞ্চাননের আত্মীয় শুনিয়া তাঁহার উৎসাহ আরো বাড়িয়া গেল। বলিলেন, "বসুন, বসুন, অনুগ্রহ ক'রে যে দেখা করতে এলেন সে আমার সৌভাগ্য। আপনারা কুটুম্ব হতে যাচ্ছেন, এখন থেকে একটা সম্প্রীতি হওয়া খুবই দরকার।"

বীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথাবার্ত্তা সব পাকা হয়ে গেল নাকি?"

মল্লিক মহাশয় বলিলেন, “একেবারে পাকা এখনও হয়নি। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও জেদ ছাড়তে চান না, বলছেন আট শ’র কমে কিছুতেই হবে না, তাও যদি সব টাকা এক সঙ্গে দিই তা হলেই। তা যদি না হয়, দেরি ক’রে অল্পে অল্পে দিই, তাহলে পূরো হাজারই দিতে হবে। এখন এত টাকা দিতে আমি ত অপারগ। দেখি, আমি হাল ছাড়িনি, হয়ে যাবে বোধ হয়। বিয়ের আগে দর-কষাকষি হয়েই থাকে সব জায়গায়।”

বিমল বলিল, “আমাদের দেশেই হয়, আর কোনো দেশে বোধ হয় ভাবী আত্মীয়দের সঙ্গে এমন নির্লজ্জ আচরণ কেউ করে না।”

বিমল বরের পক্ষের লোক, তাহার মুখে এমন কথা শুনিয়া মল্লিক মহাশয় একটু বিস্মিত হইয়া গেলেন। বলিলেন, “তা বাবা, আপনারাই হবেন ভবিষ্যৎ সমাজের মাথা, তখন যদি এই মতামত বজায় রাখেন, তা হলে সমাজের অনেক উপকার হয়।”

বীরেনবাবু হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “তখন সব মত বদ্‌লে যাবে দাদা। গানে আছে না, ‘অমন অবস্থাতে পড়লে সবাইর মত বদ্‌লায়’? ছেলের বাপ যখন হবেন সব, তখন আর বিনা পণে বিয়ে দেওয়ার পক্ষে টুঁ শব্দটি করিবেন না। এই আমি যে জিব বার ক’রে পড়েছিলাম মেয়ের বিয়ে দিতে, তা আমিই কি আর ক্যাবলার বিয়েতে দু-পাঁচ শ চাইব না? চাইব বই কি? অতগুলো বের ক’রে দিলাম, ফিরে কিছু চাইব না, এ কি ন্যায্য কথা?”

মল্লিক-মহাশয় হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, “বাবাজী বলছেন বটে এখন, তা ওঁর বিয়েতেও ওঁর বাপ-মা পণ নেবেনই। বিশেষ ক’রে বি-এ পাস করেছেন যখন।”

বীরেনবাবু বলিলেন, "ওঁর পিতা ত জীবিত নেই, মাও সংসারের মায়া এক রকম কাটিয়েছেন, নইলে বিয়ের কথা এতদিনে উঠতই। তা তোমার বড় মেয়েটির জন্ত দে'খে রাখ, গৌরীদান ক'রে দিও। পণও লাগবে না, কি বল বাবাজী?"

বিমলকে খুব বেশী লজ্জিত বোধ হইল না। সে রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "বড় গরম, এক গেলাস খাবার জল হলে হত।"

মল্লিক-মহাশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভিতর বাড়ীর দরজার কাছে গিয়া চীৎকার করিয়া মৃণালকে ডাকিতে লাগিলেন। মৃণাল আসিতেই নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘরে মিষ্টি-টিষ্টি আছে কিনা কিছু দেখ্ দেখি মা। ভদ্রলোকের ছেলে জল চাইছে, তাও ভাবী কুটুম, শুধু জল ত আর দেওয়া যায় না? দুজনের মতন আনিস্, বীরেনও রয়েছে।"

মৃণাল মৃদু হাসিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিল। বিমলের জল চাওয়ার অর্থ, একমাত্র বুঝিল সেই। মামীমাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মামীমা, ঘরে কিছু মিষ্টি আছে কিনা মামাবাবু জিজ্ঞেস করছেন, বাইরের ওরা দুজন জল খেতে চাইছেন।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "তা আবার থাকবে না কেন? গেরস্ত বাড়ী একটু মিষ্টি থাকবে না? তা দিচ্ছি, কিন্তু নিয়ে যাবে কে? এই টিনি, খাওয়া হল ত ওঠ্ না?"

টিনি নাকীস্বরে বলিল, "আঁমার মাছের মুঁড়োটা খাঁওয়া হয় নি।"

মামীমা বলিলেন, "ও ছুঁড়ির খাওয়া হতে বেলা গড়িয়ে যাবে। তবে তুইই যা, এরপর কিছু কথা হয় ত তোর মামা বুঝবে। আমি ত আর তাই ব'লে যেতে পারি না।"

ছুটি কাঁসার রেকাবীতে জলখাবার ও ছুই গেলাশ জল লইয়া মৃণালই আবার বৈঠকখানায় চলিল। বীরেনবাবু বলিলেন, "আমাকে আবার এ সব কেন মা? এখুনি গিয়ে ভাত খেতে হবে, বিমলকেও মা নেমন্তন্ন ক'রে রেখেছেন, সে যদি এখান থেকে পেট বোঝাই ক'রে যায় তা'হলে মা আর রক্ষে রাখবেন না।"

মৃণাল বলিল, "শুধু জল কি দেওয়া যায়? বেশী ত কিছু দিই নি।"

বিমল মামার বাড়ীতে খাইতে যতই আপত্তি করুক, এখানে কিছুই আপত্তি করিল না, নীরবে মিষ্টির রেকাবীটা শেষ করিয়া ফেলিল। বীরেনবাবু বলিলেন, "বেলা হল, এরপর ওঠা যাক্, চানটান করতে হবে।"

মল্লিক-মহাশয়ও তাঁহাদের আগাইয়া দিতে রাস্তা পর্য্যন্ত বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, "তোমরা পাঁচজন আমার হয়ে চক্রবর্ত্তীর কাছে একটু বলটল হে। মিনিকে ছোটবেলা থেকে তোমরাও ত দেখছ, এমন মেয়ে গাঁয়ে ক'টা আছে?"

বীরেনবাবু বলিলেন, "তুমিও যেমন, চক্কোত্তি ত আমাদের কথা শুনবার জন্তে ব'সে আছে। নইলে মিনুর কথা কি আর আমরা না বলি, ও ত আমাদের ঘরেরই মেয়ে।"

বিমল মনে মনে ভাবিল, "ভাল লোককেই ভদ্রলোক সুপারিশ করার ভারটা দিচ্ছেন।" কথাটা যে তাহাকেই বলা, বীরেনবাবু উপলক্ষ্য মাত্র, তাহা কি আর সে বুঝিতে পারে নাই?

বীরেনবাবুর মা ছেলে এবং অতিথির দেরি দেখিয়া ক্রমাগত ঘর আর বাহির করিতেছিলেন। তাহাদের ফিরিতে দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে বীরু, এই আগুনের মত রোদ, এতে এমন ক'রে বেরোয়?

আর তুমিই বা ভাই, কোথায় অন্তর্ধান হলে? রান্না আমার কখন চুকে গেছে।”

বিমল বলিল, “এই দু’চার বাড়ী ঢুঁ মারতে মারতে দেরি হয়ে গেল আর কি? তা এখানে যা আতিথ্যের ঘটা, আপনার রান্না খাবার মত জায়গা যে আর পেটে আছে তা ত বোধ হচ্ছে না।”

বৃদ্ধা বলিলেন, “সেটি হচ্ছে না ভাই, আমার রান্নার যদি অপমান কর, তাহলে তোমার বিয়েতে একেবারেই যাব না, এই দিব্যি ক’রে বললাম।”

বীরেনবাবু ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন গামছা ও কাপড়ের সন্ধানে। বিমল বলিল, “তা ঠাকুরমা যদি বিয়ের জোগাড়টা তাড়াতাড়ি ক’রে দিতে পারেন, তা হলে আপনার রান্নার নিশ্চয় সদ্ব্যবহার করব, পেট ফেটে গেলেও দমব না।”

বৃদ্ধা বলিলেন, “তা আর আশ্চর্য্য কি? মেয়ের বিয়ে ঠিক করাই শক্ত, ছেলের বিয়ে ত মুখ থেকে কথা খসালেই হয়। এই গাঁয়েই আমি ঠিক ক’রে দিচ্ছি, বোশেখ মাসেই নাতবৌ এসে যাবে।”

বিমল বলিল, “এই গাঁয়ে ত নিশ্চয়, নইলে আপনার হাতে ভার দেব কেন? কিন্তু আমার পছন্দ মত হওয়া চাই, ঠাকুরমা।”

বৃদ্ধা বলিলেন, “তা ত বলবেই ভাই, আজকালকার শহুরে ছেলে তোমরা, তোমরা কি বুড়োবুড়ীর পছন্দ মত বিয়ে করবে? কি রকম হলে পছন্দ হয় বল ত? বেশ ডাগর-ডোগরটি ডানাকাটা পরীর মত চেহারা, এই এক কথায় ঠিক আমার মত আর কি?”

বিমল হাসিয়া বলিল, “অতখানি সৌভাগ্য কপালে সইবে না ঠাকুরমা। একটি মেয়ে আমি পছন্দ ক’রেই রেখেছি, এখন দয়া ক’রে আপনি কথাটা যদি পাড়েন, তা হলেই হয়। আমার সাংসারিক

অবস্থা ত সব আপনার জানাই আছে, তাঁদের কাছে কিছু বাড়িয়ে বলবার দরকার নেই। একটা চাকরি আমার প্রায় ঠিক, তাও বলতে পারেন।"

বৃদ্ধা এতক্ষণ ঠাট্টা তামাসাই করিতেছিলেন, এখন বুঝিলেন ব্যাপারটা ঠাট্টা নয়। এবার একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন। বিমলের মনোমত পাত্রীটি যে কে তাহা তিনি না বুঝিলেন এমন নয়। বলিলেন, "তা ভাই ওরা ত অন্য জায়গায় মেয়ের সম্বন্ধ করেছে, সেও আবার তোমার নিজের আত্মীয়গুষ্টির মধ্যে, এমন জায়গায় কি কথা পাড়া যায়? ওরা দেবেই বা কেন? তুমি হীরের টুক্‌রো ছেলে, কিন্তু লোকে ত শুধু ছেলেই দেখে না, অবস্থাও দেখবে ত? ধানচাল বাড়ীঘর কিছু থাকত তবে ত মুখ বড় ক'রে বলতে পারতাম।"

বিমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "ছিল ত সবই ঠাকুরমা, কিন্তু কপালগুণে সবই এখন মহাজনের হাতে। খড়ের ঘর মাত্র দুখানা অবশিষ্ট। কবে যে জমিজমা ছাড়াতে পারব, তা জানি না। সম্প্রতির মত চাকরির উপরেই নির্ভর করতে হবে।"

বীরেনবাবু কাপড় হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "চল হে, স্নানটা সেরে আসা যাক।"

বিমল বলিল, "আপনি এগোন, আমি যাচ্ছি মিনিট পাঁচ পরে। পুকুর ঘাট সব আমার চেনা আছে।"

বীরেনবাবু অগ্রসর হইয়া চলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছেলেমেয়েও চলিল। গ্রীষ্মের দিন, পাঁচবার স্নান করিতেও তাহাদের আপত্তি নাই।

বীরেনবাবুর মা বলিলেন, "দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ থাকবে ভাই, ব'স বৈঠকখানা ঘরে। আমি দেখি ওরা কি করছে।"

বিমল বলিল, "আপনার সঙ্গে কথা বলতেই ত থাকলাম ঠাকুরমা, একলা একলা ব'সে থেকে কি লাভ হবে আমার? আমি ত রাত্রের ট্রেনে ফিরে যাব, এখন আমার ঘটকালিটা করবেন কি না বলুন।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তা কথাটা না-হয় পাড়লাম, কিছু দিতে থুতে হবে না, এই মনে ক'রে যদি রাজী হয়। চক্কোত্তিবুড়ো বড় চাপ দিচ্ছে কি না?"

বিমল বলিল, "আচ্ছা, এবার তাহলে আমি স্নান ক'রে আসি।" বৃদ্ধা তাহাকে কাপড় গামছা গুছাইয়া দিয়া আবার গিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।

বিমলকে বাধ্য হইয়া বৃদ্ধার সম্মান রক্ষা করিতে হইল। এই বিপদ্ সাগরে একমাত্র সহায় যিনি, তাঁহাকে ত চটানো যায় না?

খাওয়ার পর দীর্ঘ দিবানিদ্রা দেওয়া বীরেনবাবুর নিয়ম। বিমলই বা যায় কোথায়? এই দারুণ রৌদ্রে ত মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না? ছেলেমেয়েদের গৃহকর্ত্তা আদেশ দিলেন, বিমলের জন্য বৈঠকখানা ঘরে ভাল করিয়া বিছানা পাতিয়া দিতে। বিমল শুইয়া শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল, দিনে ঘুমানো কোনো দিন তাহার অভ্যাস নাই, আজ ত ঘুম আসিলই না।

বীরেনবাবুর মায়ের খাওয়া দাওয়া সারিতে বেলা প্রায় গড়াইয়া যায়। বৃদ্ধার স্বাস্থ্য ভাল, আহারে রুচিও আছে মন্দ নয়। কিন্তু কপাল-দোষে একবারের বেশী আহার করিবার উপায় নাই। রাত্রে ফল, দুধ, বা মিষ্টি যা হোক একটু কিছু খান, সেটাকে আর তিনি আহারের মধ্যে ধরেন না। দুপুরবেলা ভাত, ডাল, তরকারি, রুটি, লুচি, ঘন দুধ, আম প্রভৃতি সহযোগে ঘণ্টা দুই বসিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করেন। মুখ ধুইতে, কাপড় ছাড়িতে, রাত্রিকালীন আহারের ব্যবস্থা করিতেও

ঘণ্টাখানেক লাগিয়া যায়। কাজেই বেলা তিনটা চারটার আগে, তাঁহার আর অবসর মেলে না।

বিমলের জন্য আজ পাঁচ-দশ রকম রান্না করিয়াছিলেন, কাজেই আহার শেষ হইতে আরও দেরি হইল। গুরু ভোজনের ফলে একটু-খানি না গড়াইয়া লইয়া থাকিতে পারিলেন না। কাজেই যখন ভিজা গামছা মাথায় চাপা দিয়া অবশেষে তিনি মল্লিক বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইলেন, তখন সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। বিমল উঠিয়া বৈঠকখানা ঘরের সামনে পায়চারি করিতেছে। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "চললাম ভাই তোমার দূতী হয়ে, এখন ঘটকী বিদায়টা যেন ভাল মতে পাই।"

বিমল হাসিয়া বলিল, "আগে কাজ উদ্ধার ক'রে আসুন ত, তারপর বিদায়ের কথা।"

২৫

মল্লিক-গৃহিণী সবে একটুখানি গড়াইয়া লইয়া, উঠিয়া দ্বিতীয়বার রান্নাঘরের পর্ব্ব আরম্ভ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় বীরেনবাবুর মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মল্লিক-গৃহিণী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দাওয়ায় একখানা কম্বলের আসন বিছাইয়া দিয়া বলিলেন, "আসুন মাসীমা, বসুন। কি ভাগ্যি যে দেখা পেলাম।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "তা বাছা, তুমিই বা কোন্ মাসীকে মনে ক'রে একবার যাও? বুড়ো হাড়, কবে আছি কবে নেই।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "মরবারই সময় পাই না মা, যাব কোথায়?

তার উপর এই ভাগ্নীর বিয়ে এগিয়ে আসছে, একলা হাতে তারও জোগাড় করতে হচ্ছে ত ?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "সময় আর কারই বা আছে বাছা। তুমি বললে বটে নিজের কথা, ভাবছ বুড়ীর কি-ই বা কাজ, ইচ্ছাসুখে বেড়িয়ে। বেড়াতে পারে। তা কিন্তু নয়, একদিন গিয়েই দেখ। এই বুড়ী যেদিক্ না তাকাচ্ছে, সেই দিক্ই পণ্ড। থাক্ না দশটা বৌ-ঝি, তবু দে'খে শুনে রাখতে হয় আমাকেই সব। তাই বলি, ওরে, বুড়ী যে ক'দিন আছে সুখ ক'রে নে, তার পর বুঝবি কত ধানে কত চাল।"

মল্লিক-গৃহিণী দেখিলেন, বৃদ্ধার মেজাজ বেশ কিছু গরম হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার চেয়ে কোনও মানুষে বেশী কাজ করে এমন ইঙ্গিত মাত্র হইলেই তিনি চটিয়া যান। বুড়ী মানুষকে চটাইয়া লাভ নাই, কাজেই মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "তা ত বটেই মাসীমা, আপনারা সব আগের কালের মানুষ, আপনাদের হাড় শক্ত কত! আমরা এই বয়সেই আপনাদের অর্দ্ধেক খাটতে পারি না, আপনাদের বয়সে হয়ত জড়পিণ্ডি হয়ে যাব। তা বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? এতটা রোদে হেঁটে এসেছেন।"

বৃদ্ধা বসিয়া বলিলেন, "তা ত তুমি বলবেই মা, ভালমানষের বেটী যে হবে সে হক্ কথা বলবে। দেখতে পার না কিছু আমার ঘরের চোক্‌খাগীরা, তারা আমাকে শুধু ব'সে থাকতেই দেখে। যেদিন চোখ বুজব একেবারে, সেদিন ভালমতে বুঝবে। তা ভাগ্নীর বিয়ে একেবারে ঠিক হয়ে গেল নাকি ?"

গৃহিণী বলিলেন, "দর-কষাকষি এখনও চল্‌ছে, উনি ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, যেমন ক'রে হোক কাজ চুকিয়ে দেবার জন্যে। আমিই বাধা দিচ্ছি। ঘটি-বাটি বেচে যদি একটা মেয়ের বিয়ে দিই, তাহলে

আর ছুটোর হবে কি? পুরুষ মানুষ অত বোঝে না মা, গলায় কাঁটা বিঁধলে যেমন ক'রে হোক নামাতে চায়। আমরা ছেলেপিলের মা, আমাদের সব দিক্ দেখতে হয় ত?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "ঠিকই ত, ভাগ্নীর বিয়ে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'লে চলবে কেন বাছা? নিজেরও ছুটো মেয়ে রয়েছে ত? তারাও ত ষেটের কোলে ডাগর হয়ে উঠেছে, তাদের কথাও ভাবতে হয় ত? তা ওরা বেশী দর হাঁকে ত তোমরাও অন্য পাত্র দেখ না? তোমাদের মেয়ে কিছু মন্দ নয়, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "মেয়ে কি আর আমাদের পোড়া সমাজে কেউ দেখে মাসীমা? যেমন তেমন হোক হাত-পা থাকলেই হল। সবাই টাকার জন্যে হাঙরের মত হাঁ ক'রে আছে। আর কোথায় খুঁজতে যাব বল? গাঁয়ে ত আর বিয়ের যুগ্যি ভাল ছেলে দেখি না। সাত গাঁ খুঁজে বেড়াবার সময় বা কার আছে? বাপ মিন্‌ষে ত ক'টা টাকা দিয়ে খালাস, যত দায় পড়েছে আমাদের ঘাড়ে। তার উপর তারও আবার এখন-তখন অবস্থা, সেও হয়েছে এক অশান্তি। কোনো মতে ছুই হাত এক ক'রে দিতে পারলে বাঁচি, কখন বা বাগড়া পড়ে।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "একটি ছেলে আছে মা, সে বিনা পয়সাতেই বিয়ে করতে রাজী, তা তোদের পছন্দ হবে কিনা জানি না, বিষয়-আশয় তেমন কিছুই নেই।"

মল্লিক-গৃহিণী একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, "ওমা কাদের ছেলে গা? আমরা ত আর কারও কাছে বিয়ের কথা পাড়ি নি? আমাদের মেয়ে দেখল কোথায়? গাঁয়েরই মানুষ নাকি?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "এ গাঁয়ের না মা, কদমপুরের। ঐ যে ছেলেটি আজ বীরুর সঙ্গে তোমাদের বাড়ী দুপুর বেলা এসেছিল। এবার বি-এ

পাস দিয়েছে। ঘর ভাল, বাপের এক সন্তান। জমিজমা বাড়ীঘর সবই আছে, নেই যে তা নয়, তবে বাপ মারা যাবার পর বাঁধাছাঁদা পড়েছে আর কি? তা একবার ভাল চাকরিতে ঢুকলেই ছাড়িয়ে নেবে সব। দেখতে দিব্যি, তোমার পঞ্চার চেয়ে অনেক ভাল। কথাবার্ত্তা ভারি মিষ্টি।"

মল্লিক-গৃহিণী বিমলের রূপগুণের বর্ণনায় খুব যে মোহিত হইয়া গেলেন, তাহা বোধ হইল না। বলিলেন, "সম্বন্ধ আনলে কে?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "মাথার উপর তার তেমন কেউ নেই বাছা, নিজেই আমার কাছে বলেছে। তোমরা যদি গা কর, তাহলে তার মাকে পত্তর দিয়ে সব খবর জানতে পার, কথাবার্ত্তাও পাকা হতে পারে; আজ রাত্রের গাড়ীতেই সে ফিরে যাচ্ছে। মেয়েকে কলকাতায় দে'খে পছন্দ হয়েছে তাই, না হলে বেটাছেলে বি-এ পাস, ওর বিয়ের ভাবনা কি?"

বৃদ্ধা ঘটকীগিরিতে খুব পাকা না হইলেও নিতান্ত মন্দ নহেন। তবে মল্লিক-গৃহিণীও বুদ্ধিমতী, শুধু কথায় ভুলিবার মেয়ে নহেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, দেখি ওঁর সঙ্গে কথা বলে। এখানকার সম্বন্ধটা সকল দিকে ভাল, এক খাঁই বড় বেশী। মেয়ে আমাদের চোখের উপর থাকবে, বেশী দূরে বিয়ে দিতে মন চায় না। এখানকারটা যদি দরে ব'নে যায় ত হয়েই গেল, নইলে ঐ ছেলেটির খোঁজ করতে বলব। জমি-জমা, ঘর-বাড়ী সবই বাঁধা বলছ কি না, ঐটাই ভাল ঠেকছে না। চাকরী কবে হবে তা কে জানে মা? তার উপর ভরসা কি?"

বৃদ্ধার আর বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না। আরও দুই চার বাড়ী ঘুরিয়া যাইতে হইবে, অন্ধকার হইয়া যাইবার আগে।

আর দুটোর হবে কি? পুরুষ মানুষ অত বোঝে না মা, গলায় কাঁটা বিঁধলে যেমন ক'রে হোক নামাতে চায়। আমরা ছেলেপিলের মা, আমাদের সব দিক্ দেখতে হয় ত?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "ঠিকই ত, ভাগ্নীর বিয়ে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'লে চলবে কেন বাছা? নিজেরও দুটো মেয়ে রয়েছে ত? তারাও ত ষেটের কোলে ডাগর হয়ে উঠেছে, তাদের কথাও ভাবতে হয় ত? তা ওরা বেশী দর হাঁকে ত তোমরাও অন্য পাত্র দেখ না? তোমাদের মেয়ে কিছু মন্দ নয়, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "মেয়ে কি আর আমাদের পোড়া সমাজে কেউ দেখে মাসীমা? যেমন তেমন হোক হাত-পা থাকলেই হল। সবাই টাকার জন্যে হাঙরের মত হাঁ ক'রে আছে। আর কোথায় খুঁজতে যাব বল? গাঁয়ে ত আর বিয়ের যুগ্যি ভাল ছেলে দেখি না। সাত গাঁ খুঁজে বেড়াবার সময় বা কার আছে? বাপ মিন্‌ষে ত ক'টা টাকা দিয়ে খালাস, যত দায় পড়েছে আমাদের ঘাড়ে। তার উপর তারও আবার এখন-তখন অবস্থা, সেও হয়েছে এক অশান্তি। কোনো মতে দুই হাত এক ক'রে দিতে পারলে বাঁচি, কখন বা বাগড়া পড়ে।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "একটি ছেলে আছে মা, সে বিনা পয়সাতেই বিয়ে করতে রাজী, তা তোদের পছন্দ হবে কিনা জানি না, বিষয়-আশয় তেমন কিছুই নেই।"

মল্লিক-গৃহিণী একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, "ওমা কাদের ছেলে গা? আমরা ত আর কারও কাছে বিয়ের কথা পাড়ি নি? আমাদের মেয়ে দেখল কোথায়? গাঁয়েরই মানুষ নাকি?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "এ গাঁয়ের না মা, কদমপুরের। ঐ যে ছেলেটি আজ বীরুর সঙ্গে তোমাদের বাড়ী দুপুর বেলা এসেছিল। এবার বি-এ

পাস দিয়েছে। ঘর ভাল, বাপের এক সন্তান। জমিজমা বাড়ীঘর সবই আছে, নেই যে তা নয়, তবে বাপ মারা যাবার পর বাঁধাছাঁদা পড়েছে আর কি? তা একবার ভাল চাকরিতে ঢুকলেই ছাড়িয়ে নেবে সব। দেখতে দিব্যি, তোমার পঙ্কার চেয়ে অনেক ভাল। কথাবার্ত্তা ভারি মিষ্টি।"

মল্লিক-গৃহিণী বিমলের রূপগুণের বর্ণনায় খুব যে মোহিত হইয়া গেলেন, তাহা বোধ হইল না। বলিলেন, "সম্বন্ধ আনলে কে?"

বৃদ্ধা বলিলেন, "মাথার উপর তার তেমন কেউ নেই বাছা, নিজেই আমার কাছে বলেছে। তোমরা যদি গা কর, তাহলে তার মাকে পত্তর দিয়ে সব খবর জানতে পার, কথাবার্ত্তাও পাকা হতে পারে; আজ রাত্রের গাড়ীতেই সে ফিরে যাচ্ছে। মেয়েকে কলকাতায় দে'খে পছন্দ হয়েছে তাই, না হলে বেটাছেলে বি-এ পাস, ওর বিয়ের ভাবনা কি?"

বৃদ্ধা ঘটকীগিরিতে খুব পাকা না হইলেও নিতান্ত মন্দ নহেন। তবে মল্লিক-গৃহিণীও বুদ্ধিমতী, শুধু কথায় ভুলিবার মেয়ে নহেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, দেখি ওঁর সঙ্গে কথা বলে। এখানকার সম্বন্ধটা সকল দিকে ভাল, এক খাঁই বড় বেশী। মেয়ে আমাদের চোখের উপর থাকবে, বেশী দূরে বিয়ে দিতে মন চায় না। এখানকারটা যদি দরে ব'নে যায় ত হয়েই গেল, নইলে ঐ ছেলেটির খোঁজ করতে বলব। জমি-জমা, ঘর-বাড়ী সবই বাঁধা বলছ কি না, ঐটাই ভাল ঠেকছে না। চাকরী কবে হবে তা কে জানে মা? তার উপর ভরসা কি?"

বৃদ্ধার আর বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না। আরও দুই চার বাড়ী ঘুরিয়া যাইতে হইবে, অন্ধকার হইয়া যাইবার আগে।

বলিলেন, "তা হলে ব'স মা, আমি উঠি; সব কাজ প'ড়ে রয়েছে। যদি মত হয়, আমায় বললেই আমি পত্তর দিয়ে ছেলেকে আনব। একেবারে কিচ্ছুটি দিতে হবে না, সেটাও মনে রেখ। ফুলের মালা গলায়, হাতে শাঁখা দিয়ে বিদায় ক'রে দিলেও সে কিছু বলবে না।"

মল্লিক-গৃহিণী একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "অমন ক'রে কেন আমরা দিতে যাব মাসীমা? আমাদেরও ত একটা মানসম্ভ্রম আছে। আমাদের সাধ্যিমত আমরা মেয়েকে দেব। তবে অবস্থার অতিরিক্ত চাইছে, তাই না পাঁচটা কথা হচ্ছে? তা আমি ওঁকে বলব এখন, আজই সন্ধ্যেবেলা।"

বৃদ্ধা আবার গামছাটা পাট করিয়া মাথায় চাপা দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। এখনই বাড়ী যাইবেন না, আরও পাঁচটা বন্ধু-বান্ধব আছে, সব জায়গায় একটু ঘুরিয়া যাইবেন। তেমন কোনো সুখবর ত লইয়া যাইতে পারিলেন না, কাজেই বিমলের সঙ্গে শীঘ্র দেখা করিতে কোনও উৎসাহ বোধ করিতেছিলেন না। নিতান্ত ছেলেটা ছাড়ে না, তাই তিনি আসিয়াছিলেন, নহিলে পঞ্চানন যে পাত্র হিসাবে অনেক ভাল, তাহা কি আর তিনি বোঝেন না? কচি খুকীটি ত আর নন?

তিনি চলিয়া যাইবার পরও মল্লিক-গৃহিণী খানিকক্ষণ দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কাজের কথা তখন যেন তাঁহার আর মনে রহিল না। কে এ ছেলেটি? মৃণালকে কলিকাতায় দেখিয়াছে বলিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, মৃণালও তাহা হইলে ইহাকে দেখিয়াছে। কিন্তু দুপুরে যখন ছেলেটি বীরেনবাবুর সঙ্গে আসিয়াছিল, তখন মিনি ত সে কথা কিছুই বলিল না? ইহাদের আলাপ-পরিচয় হইয়াছে নাকি কে জানে? বড় মেয়ে, বছরের দশটা মাস চোখের আড়ালেই থাকিত। এ-বয়সে

মন এদিক্ ওদিক্ যাইতে ত সময় লাগে না। ইহারই জন্য পঞ্চাননকে বিবাহ করিতে চায় না নাকি, কে জানে? তাহা হইলে ত বিপদ্! মল্লিক-গৃহিণী পল্লীবাসিনী হিন্দুগৃহিণী হইলে কি হইবে? অনেকখানি স্বাভাবিক বুদ্ধি লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন স্থলে বিবাহ দিয়া কিছু যে সুবিধা হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতেই পারিতেছিলেন।

ভাতের হাঁড়িটা তাক হইতে নামাইয়া তিনি উনানের উপর বসাইয়া দিলেন। ঘটি করিয়া তাহাতে জল ঢালিতে ঢালিতে ডাকিয়া বলিলেন, "মিনু, শুনে যা ত একবার।"

মৃণাল ঘরে বসিয়া শেলাই করিতেছিল, মামীর ডাক শুনিয়া শেলাইটা পাট করিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ডাকছ মামীমা, তরকারী কুটে দেব?"

মামীমা পিতলের গামলায়, ছোট বেতের পাই ভর্ত্তি করিয়া চাল ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন, "না, সে হবে এখন পরে। শোন্, আজ দুপুরে যে ছেলেটি এসেছিল বীরু ঠাকুরপোর সঙ্গে, তার নামটা কি রে?"

মৃণালের মুখ যেন রক্তগোলাপের মত রাঙা হইয়া উঠিল। মামীমা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। মৃণাল বলিল, "তাঁর নাম বিমলকুমার রায়।"

"ওকে চিনিস্ না কি তুই? ও বাড়ীর মাসীমা বলছিলেন, কলকাতায় তোদের চেনাশোনা হয়েছে?"

মৃণাল চেষ্টা করিয়া গলাটা স্বাভাবিক করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, ঠাকুরমার বোনঝির বাড়ীতে আলাপ হয়েছিল।"

মামীমার আর বেশী জেরা করিবার ইচ্ছা ছিল না। বলিলেন, "চিঁড়ে ক'টা কুলোয় ক'রে নিয়ে যা, ওঘরেই ব'সে বেছে দে।

খোকাটার দিকে একটু চোখ রাখিস্, যেন ঘুমের ঘোরে খাটের উপর থেকে উল্টে না পড়ে।"

মৃণাল কুলায় চিঁড়া ঢালিয়া লইয়া চলিয়া গেল। বিমল তাহা হইলে বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্যই ঠাকুরমাকে পাঠাইয়াছিল? তাঁহার সাড়া পাইয়া মৃণালের একবার ইচ্ছা করিয়াছিল এদিকে আসিবার, কিন্তু আসে নাই এই সম্ভাবনার কথা মনে করিয়াই। মামীমা তাঁহাকে কি উত্তর দিলেন কে জানে? খুব সম্ভব সোজাসুজি বিদায় করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুর সংসারে সর্ব্বপ্রথম ত টাকাকড়ি দেখা হয়, তাহার পর অন্য কথা। বিমল দরিদ্র, সুতরাং সেই অপরাধেই প্রথম তাহার কথা কেহ কানে তুলিবে না।

মল্লিক-গৃহিণী রান্নার ফাঁকে ফাঁকে কত কথাই যে ভাবিতে লাগিলেন তাহার ঠিকানা নাই। ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হইয়াছে তাহা মৃণাল স্বীকার করিল বটে, কিন্তু হইতে পারে যে শুধু আলাপই হইয়াছে, তাহার বেশী কিছু নয়। তবে মুখখানা মেয়ের অমন লাল হইয়া উঠিল কেন? সেটা মামীমার প্রশ্নে লজ্জাবশতঃ হইতে পারে। মল্লিক-গৃহিণীর বিবাহ হইয়াছিল এগারো বৎসরে, শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিলেন তিনি বারো বৎসর বয়সে। ভালবাসিবার বৃত্তির উন্মেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীকে তিনি পাইয়াছিলেন, তাঁহাকেই একান্ত ভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। তাই কুমারী-জীবনের এই দারুণ সংগ্রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার কোনও পরিচয় ছিল না। বুদ্ধি দ্বারা খানিকটা বুঝিতেন বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে শুধু বুদ্ধি শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে না। এই কণ্টক-কুসুমাবৃত পথে রক্তাক্ত চরণে নিজে যে না চলিয়াছে, সে ত এ-পথের কি আকর্ষণ তাহা বুঝিতে পারিবে না?

বাহিরে কর্ত্তার সাড়া পাইয়া তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। মল্লিক-মহাশয় দিবানিদ্রা সারিয়া এক পাক ঘুরিয়া আসেন, কোনোদিন একেবারে সন্ধ্যার আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে ফেরেন, কোনোদিন বা একটু আগে। আজ গৃহিণী মনে মনে তাঁহার জন্য অতিশয় আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই আকুলতাই ইঁহাকে অকালে ঘরে টানিয়া আনিল নাকি কে জানে?

গৃহিণী বলিলেন, "ওগো শোন, এখুনি যেন আবার কোথাও ঘুরতে চ'লে যেও না। ঘরে ব'স একটু, আমি আসছি চাল ক'টা ঢেলে দিয়ে।"

মল্লিক-মহাশয় ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া নিজের তক্তপোষের উপর বসিলেন। গ্রীষ্মকালের রাত্রে এইখানেই মশারি খাটাইয়া তিনি শুইয়া থাকেন, পারতপক্ষে ঘরে ঢোকেন না। দিনের বেলা অবশ্য দারুণ রৌদ্রের তাড়নায় তাঁহাকে ঘরের ভিতর আশ্রয় লইতে হয়।

গৃহিণী তাড়াতাড়ি চাল হাঁড়িতে দিয়া হাত আঁচলে মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিলেন। স্বামীর কাছে গিয়া এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "ওগো, ওবাড়ীর বুড়ো মাসীমা ত আজ মিনির জন্যে এক সম্বন্ধ এনে হাজির।"

কর্ত্তা একটু বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "তাই নাকি? কোথাকার পাত্র?"

গৃহিণী বলিলেন, "ঐ যে গো, দুপুরে যে ছেলেটি এসেছিল। তুমি ঘটা ক'রে জল খাওয়ালে পঞ্চুদের কে হয় ব'লে। এদিকে এসেছিল সে অন্য মতলবে। কলকাতায় কোথায় মিনিকে দে'খে পছন্দ করেছে, ব্যস্ তার পর সোজা প্রস্তাব মাসীমাকে দিয়ে। ছেলে নিজেই নিজের কর্ত্তা, বাপমায়ের ধার ধারে না।"

মল্লিক-মহাশয় বলিলেন, "তা ছেলেটি ভাল। বেশ সুশ্রী দেখতে, কথাবার্ত্তায় বেশ বুদ্ধিমান্ ব'লে বোধ হ'ল। তারই মামার সঙ্গে এদিকে ঠিক হয়ে গেল যে, না হ'লে পাত্র মন্দ নয়। ছোক্‌রা পঞ্চাননের সঙ্গে বিয়ের কথা জানে না বোধ হয়, তা হলে কি আর এ-বিয়ের প্রস্তাব করত ?"

গৃহিণী কর্ত্তার শেষের কথা কয়টা উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "ওমা, ঠিক হয়ে গেছে নাকি। কই আমাকে ত কিছুই বল নি ? দেনা-পাওনার কি স্থির হল ? ওদেরই জেদ বজায় রইল নাকি ?"

কর্ত্তা বলিলেন, "বলবার সময় পেলাম কই ? আজই একটু আগে ত পাকা কথা হ'ল কিনা ? বুড়ো সাড়ে সাত শ'তে রাজী, তবে টাকা একসঙ্গেই দিতে হবে। এই ক'মাসের জন্যে টাকা ধার করতে হবে আর কি ? আস্তে আস্তে বুড়োকে দিতাম, না-হয় মহাজনকে দেব। তবে গোটা বারো-চোদ্দ টাকা সুদে যাবে আর কি ?"

গৃহিণী ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "আর পঞ্চাশটা টাকা পণেও বেশী যাবে, সেটা বুঝি আর টাকা না ? একেবারে পাকা কথা দিয়ে এসেছ ?"

কর্ত্তা বলিলেন, "ঐ দেওয়াই হ'ল আর কি ? মুখে অবশ্য বলেছি, বাড়ীতে পরামর্শ ক'রে কাল জানাব। আর এ ঝামেলা পোয়াতে পারি না বাপু। এদিকে মৃগাঙ্কর খবরও কিছু ভাল নয়। একদিন ভাল থাকে ত তার পরদিন যাই যাই অবস্থা হয়। সামনের মঙ্গলবারটা দিন ভাল আছে; সেই দিন আশীর্ব্বাদের ব্যবস্থা করতে হবে। জোগাড় হয়ে উঠবে ত ? মাঝে ত তিনদিন সময়।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা হ'তেই হবে। বিয়ে ত দিচ্ছ বাপু ঘটা ক'রে, এখন মেয়ে সুখী হলেই হয়। কলকাতায় ছিল অত বড় মেয়ে,

মন কোথায় আছে কে জানে? এই সম্বন্ধর নামে ত মুখ শুকিয়ে যায় তার। ঐ ছেলেটিকে পছন্দ ছিল নাকি কে জানে?"

মল্লিক-মহাশয় কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, "আরে না, না, ও-সব আবার কি কথা? একদিন চোখে দেখলেই অমনি তার উপর মন প'ড়ে যায় নাকি? থাকত ত বোর্ডিঙে, সেখানে ও-সব মেলামেশার সুবিধে নেই। বিয়ে দিয়ে দিলে ঠিক মন ব'সে যাবে। পঙ্কুর স্বভাবচরিত্র ভাল, মেয়েকেও খুব পছন্দ, ওখানে ও আদরে থাকবে, তুমি দেখো। কেন তোমার এমন কথা মনে হচ্ছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "কে জানে বাপু, কেমন যেন ঠেকছে। এখন শেষ রক্ষে হয় তবেই। মা-মরা মেয়ে, মন ভেঙে যায়, এটা একেবারেই চাই না; অবিশ্যি এ সব শহুরে স্বয়ম্বরের আমি একেবারেই পক্ষপাতী নই। মা-বাপের চেয়ে কি আর মেয়ে-ছেলে বেশী বোঝে নাকি? তবে এত বড় ক'রে রাখা হয়েছে, এখন তাই হাতের চেয়ে আম বড় হয়ে গেছে।"

কর্ত্তা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "অনর্থক কেন ভাবছ? আমাদের গুষ্টিতে সাতজন্মে ওসব নেই। তুমি দেখো, মেয়ে আমাদের দিব্যি সুখে ঘরকরণা করবে।"

মৃণাল কোথায় ছিল কে জানে? মামীমা অত খোঁজ করেন নাই। কিন্তু সে মামাবাবুর ঘরেই খই বাছিতে বসিয়াছিল, ইচ্ছা করিয়াই হয়ত।

মামা-মামী ত নিজের নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। চোখের জলে মৃণালের দুই চোখ ঝাপসা হইয়া উঠিল। খই, কুলা সব যেন চোখের সম্মুখ হইতে মুছিয়া গেল। জগৎ-সংসারও যেন অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। এই অসীম বিপদ্-সাগরে সে কোথাও কূল দেখিতে পাইল না।

২৬

সারারাত মৃণালের ঘুম হয় নাই, ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, তাও দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভাঙিয়া গেল। আর ঘুমাইতে সে পারিবে না। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, অন্ধকারও তরল হইয়া উঠিতেছে। মৃণাল খাট ছাড়িয়া নামিয়া ঘড়ি দেখিল। চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। ঘুম আর আসিবে না, কিন্তু এখনও বাহিরে যাইবার উপায় নাই। একটু আলো না-ফুটিলে সে কোথায় যাইবে?

তাহার নড়াচড়ার শব্দে মল্লিক-গৃহিণীরও ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময় উঠেছিস্ কেন রে?"

মৃণাল বলিল, "ঘুম হচ্ছে না, তাই।"

মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "তুই আমাকেও ছাড়ালি বাছা। দেখিস্, আলো না-নিয়ে বাইরে যাস্ না যেন, শেষে সাপখোপের ঘাড়ে পা দিবি।"

মৃণাল লণ্ঠনটা জ্বালিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘরের চারিটা দেওয়াল যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিতেছিল। খিড়কির পুকুরের ধারে আসিয়া দেখিল, পূর্ব্বদিকে যেন আলোর পতাকা দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার জীবনে কি আর রাত্রির অবসান ঘটিবে না?

সেই মেঠো রাস্তাটার দিকে তাকাইয়া খানিক সে দাঁড়াইয়া রহিল। এই পথই ত বিমলের গ্রামের দিকে গিয়াছে। চোখে দেখিতে ত কোনও বাধা নাই, মৃণাল ত অনায়াসে এই পথ ধরিয়া হাঁটিয়া সেখানে চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু অদৃশ্য বাধা ত পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিয়াছে, মৃণাল কি পারিবে সে-সব লঙ্ঘন করিয়া যাইতে? কিন্তু না-পারিলে তাহার বাঁচিয়া থাকিয়াই বা কি হইবে?

হঠাৎ পিছন দিক্ হইতে কে ডাকিল, "মৃণাল-দি ?"

মৃণাল চমকিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, বীরেনবাবুর মেয়ে খেঁদী দাঁড়াইয়া। তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই এখানে কেন রে ? এত সকালে আসতে ভয় করে না ?"

খেঁদী একখানা চিঠি তাহার হাতে দিয়াই পলায়ন করিল, বলিয়া গেল, "সেই কলকাতার বাবু দিয়ে গেছে।"

বিমলের চিঠি ! বাতির আলোটায় কোনও মতে পড়া যায়। তাড়াতাড়ি পড়া দরকার, এখনই হয়ত তাহার সন্ধানে মামা-মামী কেহ বাহির হইয়া আসিবেন। বিমল লিখিয়াছে—

'মৃণাল,

আমি কলকাতায় চললাম। ঠাকুরমার কাছে যা শুনলাম, তাতে বুঝেছি যে সোজাসুজি তোমাকে পাবার উপায় নেই। কিন্তু যত কঠিন বাধাই মাঝখানে থাক, মনে রেখ, আমাদের তা পার হতেই হবে। হাল ছাড়লে চলবে না, মনের বল হারালে চলবে না। আমাদের জীবনে সব চেয়ে কাম্য যা, সবচেয়ে বেশী দাম না দিয়ে আমরা তা পাব না, এই বিধাতার বিধান। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি ফিরব, সে ক'দিন তুমি নিজেকে যেমন ক'রে হোক রক্ষা করবে। লোকলজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ যেন তোমাকে পরাস্ত না করে।

বিমল।'

ভিতর-বাড়ী হইতে সাড়া পাওয়া গেল যেন। মামীমা হয়ত উঠিয়াছেন। চিঠিখানা বুকের কাপড়ে লুকাইয়া মৃণাল ফিরিয়া চলিল। মনে হইল বুক তাহার ভরিয়া উঠিয়াছে। সে যেন পারিবে নিজেকে এই দুস্তর বিপদ্-সাগরে রক্ষা করিতে।

মামীমা ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে কি করছিস্ এই ভোর রাতে বনে বাদাড়ে? দেখ দিথি মেয়ের কাণ্ড!"

মৃণাল ভিতরে ফিরিয়া গেল। দিনের আলো দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল, সুরু হইল গৃহস্থের দৈনন্দিন কাজের পালা। পাড়াগাঁয়ে খাটিতে হইবে সকলকেই, বসিয়া থাকিবার উপায় কাহারও নাই।

ছেলেমেয়েদের জলখাবার খাইতে বসাইয়া গৃহিণী বলিলেন, "ওরে মিনু, সেমিজ ক'টা আজ শেষ করিস্ মা, সময় ত আর বেশী নেই।"

মৃণাল বলিল, "ঢের সময় পাবে মামীমা, এত কিছু তাড়া নেই।" মামীমা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে তাকাইলেন, তবে কিছু বলিলেন না।

কলিকাতায় বন্ধুবান্ধব বা শিক্ষয়িত্রীদের কাছে মৃণাল প্রায়ই চিঠি লেখে। আজও সে রাধীর হাতে দুপুরে যখন একখানা খাম দিল ডাকঘরে দিবার জন্য, তখন মল্লিক-গৃহিণীও কিছু মনে করিলেন না।

মাঝের দুই-তিনটা দিন আস্তে আস্তে কাটিয়া গেল। চক্রবর্ত্তীদের আজ পাকা দেখা দেখিতে আসিবার কথা। বেশী কিছু ঘটা হইবে না, তিন-চার জন লোক আসিবে মাত্র। তবু একলা হাতে কাজ করিতে হয় ত? মৃণালের মামীমা তাই আজ বড় বেশী ব্যস্ত। মৃণালের মুখ ম্লান, শুষ্ক, তবে সে নীরবে মামীমাকে সাহায্য করিতেছে। চিনি, টিনি, খোকা অনেক রকম খাবার তৈয়ারী হইতে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। মল্লিক-মহাশয়ও আজ আর খাইয়া দাইয়া বাহির হইয়া যান নাই, বৈঠকখানা ঘরেই বসিয়া আছেন। হাতে কাগজ-পেন্সিল, গ্রামের বাহিরে কোথায় কোথায় বিবাহের চিঠি পাঠাইতে হইবে তাহারই ফর্দ্দ করিতেছেন।

রোদ পড়িয়া আসিল। মৃণালকে ডাকিয়া মল্লিক-গৃহিণী বলিলেন, "থাক মা, আর কাজ করতে হবে না। চুল বেঁধে গা ধুয়ে নে, একখানা ভাল কাপড় বের ক'রে পর্। আর চাবি নিয়ে যা, সিন্দুক খুলে তোর বড় হার-ছড়া বার ক'রে নে।"

মৃণাল কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। দিদি কি রকম সাজ করে দেখিবার জন্য চিনি মহোৎসাহে তাহার সঙ্গে চলিল। খানিক বাদে গাল ফুলাইয়া বাহির হইয়া আসিল, বলিল, "দেখ মা, দিদি কথা শুনছে না, বিচ্ছিরি কাপড় পরছে।"

মা তখন কাজে ব্যস্ত, তাড়া দিয়া বলিলেন, "পালা এখান থেকে, বিরক্ত করিস্ না।"

কিন্তু মৃণাল যখন তাঁহার সামনে পড়িল, তখন তিনিও বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহার পরনে কালোপাড়ের শাড়ী, চুল হাত-খোঁপা করিয়া বাঁধা, হাতে যে কয়গাছি চুড়ি থাকিত তাহা ভিন্ন গহনাগাঁটির চিহ্নমাত্র নাই। মামীমা বলিলেন, "এ কি ছিরি ক'রে এলে বাছা, লোকে আমাদের ভাববে কি? তোমার মতিগতি কিছু বুঝি না।"

মৃণাল শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "এতেই হবে মামীমা, আমার আর বেশী কিছুর দরকার নেই।"

মামীমা বলিলেন, "যত সব অনাছিষ্টি। ইস্কুলে পড়েছ ব'লে সবই তুমি বেশী বোঝ নাকি? শুভ কাজে কেউ কালাপেড়ে কাপড় পরে না, ওটা বদলে এস।"

মৃণালকে হয়ত আবার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে হইত, কিন্তু আর সময় পাওয়া গেল না। বৈঠকখানায় লোকজন সব আসিয়া পড়িয়াছে। কর্ত্তা জলখাবারের জন্য ডাকাডাকি করিতেছেন। অগত্যা মৃণালকে

হয়ত ইহজন্মে তাহার মুখ আর দেখিবেন না। কিন্তু তাহাও সহ্য করিতে হইবে। নিজকে যদি সে পঞ্চাননের হাত হইতে রক্ষা না করিতে পারে, তাহা হইলে সে মানুষ নামের অযোগ্য। নিজের জীবনের ভার তাহাকে এবার নিজেই বহন করিতে হইবে ইহা নিশ্চয়, কিন্তু উপায় কেন সে খুঁজিয়া পায় না? কোথায় পলাইয়া সে বাঁচিবে? বিমলের আর কোনও সংবাদ এখনও কেন সে পাইল না? কিন্তু বিমল আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াক বা না-ই দাঁড়াক, পঞ্চানন মৃণালকে পাইবে না।

পাকা দেখার পর দিন বিবাহের চিঠিপত্র ছাপিতে চলিয়া গেল। মৃণাল মামা-মামীকে এড়াইয়া চলে, তাঁহারাও ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকান না, একটু দূরে দূরে থাকেন। চিনি-টিনিও একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছে, এত সুন্দর সুন্দর জামা কাপড়, এত গহনা পাইয়াও দিদি যে কেন এমন গম্ভীর হইয়া আছে তাহা উহারা বুঝিতে পারে না। বাড়ীতে আনন্দের সুর একেবারেই লাগে নাই, উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে বটে, কিন্তু সব যেন স্তিমিত ভাবে।

দিন-দুই পরে বিকাল বেলা মৃণাল পুকুরঘাট হইতে গা ধুইয়া আসিতেছে, সঙ্গে চিনি, টিনি, তাহারা অবশ্য আগে দৌড়িয়া চলিতেছে। হঠাৎ কোথা হইতে বিমল আসিয়া মৃণালের সামনে দাঁড়াইল। বলিল, "দেখ, তোমায় চিঠিপত্র আমি লিখতে পারি নি, কলকাতায় কাজের সন্ধানে বড় ব্যস্ত ছিলাম। যা হোক সামান্য একটা কাজ পেয়েছি। এখন জানতে চাই, তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না? প্রথমে অবশ্য আমার মায়ের কাছে যাব, সেইখানেই বিয়েটা হবে। তারপর সোজা কলকাতা।"

মৃণাল বলিল, "যাব তা ত আপনি জানেনই। কিন্তু এখানকার

বাধা কাটাবেন কি ক'বে? এঁরা ত সহজে আমায় যেতে দেবেন না?

বিমল বলিল, "তাঁদের কাছে সব কথা আমি খুলে বলছি চল। তোমার আঠারো বছর বয়স হয়ে গেছে, তোমাকে তাঁরা জোর ক'রে আটকাবেন কি ক'রে? মামাবাবু বা মামীমা একটা হট্টগোল কেলেঙ্কারী করবেন ব'লে আমার মনে হয় না।"

দূর হইতে মৃণালদের বাড়ী দেখা যায়। চিনি, টিনি গিয়া মাকে কি খবর দিয়াছিল জানা নাই, কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সদর দরজা খুলিয়া মৃণালের মামীমা দ্রুতপদে তাহাদের দিকে আসিতেছেন। মৃণালের বুকের কাছটা একবার কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পর বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া আবার শান্ত হইয়া গেল।

মামীমা কাছে আসিয়া মৃণালের হাত ধরিয়া বলিলেন, "মিনি, বাড়ী আয়!"

বিমলকে তিনি কোনও প্রকার সম্ভাষণ করিলেন না। সে নিজেই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমার অনেক কথা বলবার আছে আপনাদের কাছে, চলুন আমিও যাচ্ছি।"

মল্লিক-গৃহিণী তখন রাস্তা ছাড়িয়া কোনওমতে ঘরে ঢুকিতে পারিলে বাঁচেন, তিনি যথাসাধ্য দ্রুতপদে মৃণালকে লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন। বিমলকে ডাকিলেন না, আসিতে বারণও করিলেন না। বিমল কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িল না।

সদর দরজার ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া মল্লিক-গৃহিণী মৃণালকে ছাড়িয়া দিয়া ক্রুদ্ধ ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বিমল ঘরে ঢুকিতেই বলিলেন, "তুমি কি রকম ভদ্রলোকের ছেলে বাপু? আমাদের মেয়ে, আমরা যেখানে ইচ্ছে বিয়ে দেব, তোমার কি? এ-সবচলবে না।"